ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

চতুর্দশ বর্ষ • শারদ সংখ্যা • আশ্বিন ১৪৩১ • অক্টোবর ২০২৪

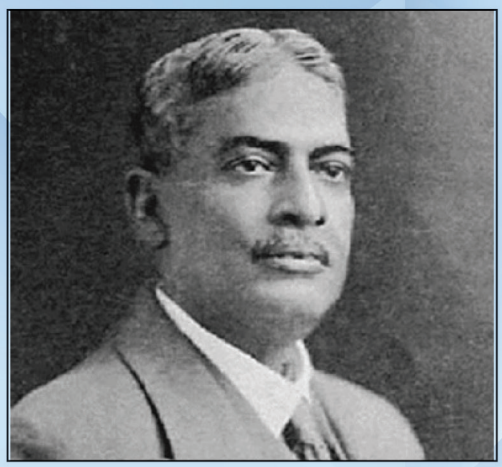

ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

- শিশুদের ক্যানসার, পরিযায়ী শ্রমিক
- তিস্তার হড়পা বান, রাম মন্দির কথা
- রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি
- ফণীশ্বর রেণুর গল্প ‘পঞ্চলাইট’
- জাতি উপজাতির কোলাজ মণিপুর
- মেক্সিকোর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট

- শতবর্ষে ডা. পূর্ণেন্দু ঘোষ
- স্মরণে বিকাশ সিংহ
- স্মরণে বিন্দেশ্বর পাঠক
- সমর বাগচী, রবীন মজুমদার
- রিচারিয়া, স্বামীনাথন
- কলকাতা বন্দরের ইতিহাস
- স্মরণে পি.টি. নায়ার

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

ISSN: 13660

চতুর্দশ বর্ষ ● শারদ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪৩১ ● অক্টোবর ২০২৪

পৃষ্ঠপোষক : জ্ঞানব্রত শীল, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, রূপক ঘোষ, অনিতা মজুমদার, ষড়ানন পাণ্ডা, অরুণ সেন, বিজন ভট্টাচার্য, ফণিগোপাল ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু নাথ, কুমার রাণা, প্রবীর সিংহ রায়, দীপক দাঁ, হীরালাল কোনার, পুণ্যব্রত গুন, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর পাল, রাহুল মুখোপাধ্যায়, বরুণ সাহা, সন্দীপ ঘোষ, সৈয়দ শাজাহান সিরাজ ও অলকানন্দা রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী : শুভেন্দু দাশগুপ্ত, জয়া মিত্র, তৃপ্তি সান্ত্রা, কমল চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ সাহু, জাতিশ্বর ভারতী, কৌশিক সেন, সোমনাথ গুহ, সোমা সেনগুপ্ত, অর্ণব সেনগুপ্ত, অমিতাভ চক্রবর্তী, সোমেন চক্রবর্তী, শুভম ভট্টাচার্য, সুদেব সাহা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শমিত কর, অমিত পান ও দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ চৌধুরি, শুভময় দত্ত ও অরণি সেন

সম্পাদকীয় সহযোগিতা : অভিজিৎ দাস, অনন্ত কর্মকার, রাজা রাউথ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম শর্মা, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায় ও অরুণাভ বিশ্বাস

ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সোম, দিলীপ সেন, অর্ঘ্য মিত্র, সুমন্ত বিশ্বাস ও তপন দাস

যোগাযোগ : রামজীবন ভৌমিক (কোচবিহার), সুমন গোস্বামী (আলিপুরদুয়ার), গার্গী সিংহ (জলপাইগুড়ি), ধীরাজ লাখোটিয়া (শিলিগুড়ি), রূপক পাল (রায়গঞ্জ), সূরজ দাস (বালুরঘাট), মৃদুল কান্তি সরকার (মালদা), সুমনা সেনগুপ্ত (বহরমপুর), রঞ্জন আচার্য (পুরুলিয়া), সুনীল সোরেন (সিউড়ি), তুষার গলুই (দুর্গাপুর), মৃণাল বাগচী (চাকদা), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), নীলকণ্ঠ আচার্য (বারাসাত), আনোয়ার হোসেন (দঃ বারাসাত), লক্ষ্মী ভট্টাচার্য (বজবজ), সুশান্ত রায় (হাওড়া)

পরিবেশনা : অয়ন ঘোষ, প্রদীপন গাঙ্গুলী, বনানী ঘোষ, সুজয় পাল, স্বপন সামন্ত ও স্বরূপ প্রামানিক

প্রচ্ছদ : অর্ক মিত্র; বর্ণসংস্থাপন : রাজু রায়

ই-মেল : ssunnayan@gmail.com ।। ওয়েবসাইট www.ssu2011.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমল রায়চৌধুরি; অর্থনীতিবিদ নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়; কবি দেবারতি মিত্র, জয়ন্ত মহাপাত্র, মলয় রায়চৌধুরী; সাহিত্যিক অ্যালিস মানরো, ইসমাইল কাদারে, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার; প্রযুক্তিবিদ জন ওয়ারনাক; আইনজ্ঞ নরি ফলিম্যান; নাট্য ও চিত্র পরিচালক গৌতম হালদার; চিত্র পরিচালক কুমার সাহানি; সঙ্গীতশিল্পী অনুপ ঘোষাল, পঙ্কজ উদাস, প্রভা আত্রে, সাদি মহম্মদ; অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিক; চিত্রগ্রাহক সৌমেন্দু রায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়; কার্টুনিষ্ট অমল চক্রবর্তি; বাচিক শিল্পী আমিন সায়ানি; ফুটবলার প্রবীর মজুমদার; ক্রিকেটার ডেরেক আণ্ডারউড, হিথ স্ট্রিক, দীপঙ্কর সরকার, ডেভিড জনসন; শ্রমিক নেতা বাসুদেব আচারিয়া; সমাজ কর্মী তৃপ্তি চৌধুরি; মানবাধিকার কর্মী আলেক্সেই নাভালননি; চিকিৎসক ডাঃ অনুপম দাসগুপ্ত, ডাঃ নৃপেন ভৌমিক; সমাজকর্মী মালবিকা চট্টোপাধ্যায়; চিন্তাবিদ মুচকুন্দ দুবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩
- অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ও জোট সরকার

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৫
●সমরেশ বসু●নারায়ণ সান্যাল●ফাদার পল দ্যতিয়েন●চন্দ্রগুপ্ত ●অরুন্ধতী দেবী●তপন সিংহ●সূচিত্রা মিত্র●কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়●ডাঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ

স্মরণিকা ১০
●রবার্ট সোলো●রণেন আয়ন দত্ত ●গদর ●এম.এস. স্বামীনাথন ●মারিও জাগালো ●ফ্রানৎজ বেকেনবাউয়ার ●ববি চালর্টন ●বিষেণ সিং বেদী ●মহম্মদ হাবিব●উস্তাদ রশিদ খাঁন●ডাঃ রণবীর মুখোপাধ্যায়●শ্রীলা মজুমদার●পিটার হিগস্●সিজার মেনেত্তি●ড্যানিয়েল কাহ্নামান

বিশেষ স্মরণিকা ১৬
- মাস্টারমশাই—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
- অভিজিৎ সেন—'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' পরিবার
- বিজ্ঞান প্রচারে প্রতি মূহূর্তে যাঁকে স্মরণ করি—চন্দন সুরভি দাস
- Remembering Sthabir Dasgupta–Jayanta Bhattacharya

ক্রোড়পত্র : ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২১
- Visceral Leishmaniasis or Kala-azar –Ramaprasad Goswami
- বিস্মৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কাজের চর্চা আগামীতেও চলবে—সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
- কালাজ্বর দূরীকরণ কর্মসূচি : সাফল্য ও কিছু সীমাবদ্ধতা —দীপঙ্কর মাজী
- উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মাচারী-বিস্মরণে বৈজ্ঞানিক, বিস্মৃত বৈজ্ঞানিক সাধনা—জয়ন্ত ভট্টাচার্য
- কালাজ্বরের গল্প ও বরেণ্য বাঙালি চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রনাথ—বাপ্পাদিত্য রায়

ব্যক্তিত্ব ৪৩
- বিকাশ সিংহ, ব্যতিক্রমী এক বিজ্ঞানী—প্রকাশ দাস বিশ্বাস
- ডঃ বিন্দেশ্বর পাঠক—যেমন দেখেছিলাম—সৌরভ রায়

জনস্বাস্থ্য ৪৭
- পশ্চিম বাংলার নিজস্ব এ.ভি.এস. চাই—দয়ালবন্ধু মজুমদার
- শিশুদের ক্যান্সার—দুচার কথা—অরুণালোক ভট্টাচার্য
- Few Words on Universal Health Coverage –Barun Kanjilal

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৫৫
- সাম্প্রতিক তিস্তার ভয়াবহ রূপ...উপত্যকাবাসী যা দেখেছেন —রাজা রাউত
- ড. রাধেলাল হরেলাল রিচারিয়া : এক ভুলে যাওয়া বিজ্ঞানীর কথা—অনুপম পাল

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৬২
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কিছু কথা—অমিতাভ চক্রবর্তী
- চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার নোবেল প্রাপকগণ —অঙ্কিতা সেনগুপ্ত
- ডিপ ফেক-আশীর্বাদ না আতঙ্ক—তপন দাস
- রবীন মজুমদার-জন বিজ্ঞান আন্দোলনের অসামান্য এক সেনানী—নিত্যানন্দ ঘোষ

অর্ধেক আকাশ ৭০
- নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম : অধরা ছায়া ও মোহিনীমায়া —সুমনা সেনগুপ্ত
- মেক্সিকোর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট—বাপ্পাদিত্য রায়

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৭৪
- রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ—বরুণ দাস
- পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র আকাশচুম্বি দুর্নীতি থেকে কি মুক্ত হবে?—সনাতন মুর্মু

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৭৯
- জরুরি জাতীয়তাবাদের আখ্যান নির্মাণ—অনুপম কাঞ্জিলাল
- বিহারের জাতিসমীক্ষা ২০২৩: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা —কুমার রাণা
- জাতি উপজাতির কোলাজ মণিপুর—সোমনাথ গুহ
- রামমন্দির কথা—ভবানীপ্রসাদ সাহু
- ক'জন ভাবি—পরিযায়ীদের 'ঘরে তার প্রিয়া এক শয্যায়, বিনিদ্র রাত জাগে'—তপন কুমার সামন্ত
- The History of Kolkata Port and the Hooghly River and Its Future–Barun De

অন্য ভুবন ১০৫
- একজন আরবকেই সে গুলি করতে গেল কেন?—নাসির আমেদ
- পদাতিক ইতিহাসবেত্তার পথচলার অবসান—অরণি সেন

অর্থনীতি ১০৮
- অর্থনীতির হালহকিকৎ—সংকলন : বুনো রামনাথ

শিল্প ও সংস্কৃতি ১১১
- শতবর্ষে আবোল তাবোল—সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়
- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি—জ্যোতির্ময় রায়

গল্প ১২০
- পঞ্চলাইট—মূলরচনা (হিন্দি) : ফণীশ্বর নাথ 'রেণু' বাংলা রূপান্তর : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

কবি স্মরণ ১২৩
- যা নিয়ে কৌতুক—দেবারতি মিত্র ● রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা—মলয় রায়চৌধুরী ● The Storm–Jayanta Mahapatra

কবিতা ১২৪
- দস্তানা—মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া ● ভাষা-ভাসান—আর্যতীর্থ ● সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক—সুপ্তশ্রী সোম

ভ্রমণ ১২৫
- হাউস অফ 'জগৎশেঠ': ষড়যন্ত্রের আতুঁড়ঘর—অন্তরা ঘোষ

চিঠিপত্র, রিপোর্ট ১২৮
- নির্বাচনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে
- প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আরেক নাম সন্দেশখালি
- শ্রমজীবী হাসপাতাল সহযোগী মঞ্চ
- নির্বাচন ও নাগরিকত্ব
- Sandeshkhali Fact-Finding Report (Excerpt)
- PUCL on 3 Criminal Laws

খবরাখবর ১৩৪

সম্পাদকীয়

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন ও জোট সরকার

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিশ্বের সবচাইতে জনবহুল দেশ ভারতে (>১৪৪ কোটি জনসংখ্যা) নির্বাচন নিয়ে এমনিতেই মাতামাতি চলে। কিন্তু এবারের নির্বাচন দীর্ঘ প্রস্তুতি, জাঁকজমক, আগ্রাসী প্রচার, উত্তেজনা, চমকে আগের নির্বাচনগুলিকে টেক্কা দিয়েছে। খরচের বহরেও (১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা) ছিল বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস প্রভৃতি দলগুলি নির্বাচনী বণ্ডের মাধ্যমে কর্পোরেট ও ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির কাছ থেকে ১৩ হাজার কোটি টাকা আদায় করে। ২০০১-'১৪ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং ২০১৪ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখ, নেতৃত্ব, বক্তব্য ও গ্যারান্টি ছিল এবারের নির্বাচনে শাসক দল বিজেপির প্রধান অস্ত্র। এছাড়াও রামমন্দির, শক্তিশালী দেশ, শক্তিশালী নেতৃত্ব, বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতি হয়ে ওঠা ও তৃতীয় অর্থনীতি হতে চলা, বিভিন্ন জনবাদী প্রকল্প প্রভৃতি ছিল বিজেপির অন্যান্য অস্ত্র। বিপরীতে বিরোধীরা তুলে ধরেন আর্থিক বৈষম্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, মোদির একনায়কতান্ত্রিক আচরণ ও বিদ্বেষমূলক হিন্দুত্ববাদ, আম্বানি-আদানি পারিবারিক বৃহৎ পুঁজিগুলির একচেটিয়াপনা, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে জনগণের সাড়ে চোদ্দ লক্ষ কোটি টাকা কিছু সরকারবন্ধু ব্যক্তির আত্মসাৎ, কৃষি সমস্যা অবহেলা ও কৃষক আন্দোলন দমন, সেনাবাহিনীতে স্বল্পকালীন 'অগ্নিপথ' প্রকল্প চালু, অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনস্থ এজেন্সিগুলিকে দিয়ে বিরোধীদের নাস্তানাবুদ ও গ্রেফতার, জনপ্রতিনিধি ক্রয় ও অবৈধভাবে সরকার ফেলা ও গঠন, মণিপুরের গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি ইস্যু। ৫৪৩ আসন বিশিষ্ট লোকসভায় সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় ন্যূনতম ২৭২টি আসনে বিজয়ী হওয়া।

প্রবল দাবদাহে বেশ কিছু ভোটকর্মী, আধাসামরিক বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মৃত্যু এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ ও ব্যাঘাতের বিনিময়ে ১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন অবধি দীর্ঘ সাত পর্বের আরোপিত নির্বাচন শেষে ৫ জুন ফলাফল বেরোল। নির্বাচনে শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী, শাসকদল ও মেইনস্ট্রিম মেডিয়া প্রচার করছিলেন যে বিজেপি এককভাবে ৩৭০ ও এনডিএ ৪০০ পার হবে। বিশ্বগুরু, শক্তিশালী নেতা নরেন্দ্র মোদির বিপুল বিজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। নির্বাচন পরবর্তী এক্সিট পোলেও মোদিজীর জয়জয়কার দেখানো হল। ইতিমধ্যে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার অমৃতলোকে পৌঁছে দেওয়া, বিকশিত ভারতের মন্ত্র বলা মোদিজী নিজেকে পরমাত্মা প্রেরিত ঘোষণা করে ২০৪৭ অবধি দেশসেবার সংকল্প ঘোষণা করলেন যদিও সেই সময় তাঁর বয়স হওয়ার কথা ৯৭ বছর। আমজনতা সব দেখছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬৫.৭৯% ভোট দিলেন। যারা ভোট দিলেন তাঁদের রায়ে স্পষ্ট কয়েকটি নির্দেশ ছিল:

১) বিজেপিকে ২৪০ আসন (৩৬.৫৬% ভোট) ও এন.ডি.এ.কে ২৯৪ আসন দিয়ে নরেন্দ্র মোদিকেই আবার দেশ পরিচালনার সুযোগ দিলেন কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠাতা দিলেন না, জোট বা মোর্চার সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিলেন। একইসাথে দেশবাসীকে ঝুলন্ত সংসদ থেকে অব্যহতি দিলেন, পাশাপাশি সরকারের সিদ্ধান্ত আরও গণতান্ত্রিক করার রাস্তা বাতলে দিলেন। বিজেপি মোদিজীর নেতৃত্বে ২০১৪ ও ২০১৯এ পেয়েছিল ২৮২ (৩১.৩%) ও ৩০৩ (৩৭.৭%) আসন।

২) ২৩২টি আসন পেয়ে এক শক্তিশালী বৈচিত্র্যময় বিরোধী পক্ষ গড়ে উঠল। আবার বিরোধী জোটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ও গতবারের দ্বিগুণ ৯৯টি আসন (২১.১৯% ভোট) পেয়ে জাতীয় কংগ্রেস প্রধান বিরোধী 'ইণ্ডিয়া' জোটের চালিকাশক্তি হয়ে উঠল।

ভোটের ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারে ধ্বস নেমে ৩০ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হল। দেখা গেল শহরের বিত্তবানরা বিজেপিকে এবং গরীব মধ্যবিত্তরা বিরোধীদের বেশি ভোট দিলেন। উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে এবং দক্ষিণবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে বেশি ভোট দিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সবচাইতে বেশি আধা সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা সত্ত্বেও সারা দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে হিংসা, কারচুপি, ছাপ্পা ভোট, বুথে বিরোধী পক্ষের এজেন্টদের বসতে না দেওয়া, গণনাকেন্দ্র থেকে বিরোধীদের কাউন্টিং এজেন্টদের মেরে বের করে দেওয়ার অভিযোগগুলি বজায় থাকল। প্রচারের একটি পর্যায় থেকে নরেন্দ্র মোদি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে ভোটারদের ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা করলেন।

বিজেপি মধ্যপ্রদেশ (২৯/২৯), গুজরাট (২৫/২৬), ওড়িশা (১৯/২১ এবং বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ ৭৮/১৪৭), দিল্লি (৭/৭), উত্তরাখণ্ড (৫/৫), হিমাচল (৪/৪), ছত্তিশগড় (১০/১১), অসম (৯/১৪), কর্ণাটক (১৭/২৮), রাজস্থান (১৪/২৫), ঝাড়খণ্ড (৮/১৪), তেলেঙ্গনা (৮/১৭), ত্রিপুরা (২/২) ও অরুণাচল প্রদেশে (২/২) ভাল ফল করল। হরিয়ানা (বিজেপি ৫, কংগ্রেস ৫), গোয়াতে (১,১) সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। বিহারে এনডিএ জোট এগিয়ে রইল (এনডিএ ৩০, ইণ্ডিয়া ১০)। অন্ধ্রে (৩) ও কেরলে (১) প্রথমবার বিজেপি আসন পেল। জম্মু ও কাশ্মীরে ৫টি আসনের মধ্যে ২টিতে জয়লাভ করল। বিজেপিকে আর উত্তর ভারতের পার্টি বলা যাবে না। এনডিএ-র অন্য শরিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টিডিপি (১৬ এবং অন্ধ্র বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ, ১৩৫/১৭৫), জেডি(ইউ) (১২), শিবসেনা শিণ্ডে (৭) ও এলজেপি (৫)।

দু'দুটি দীর্ঘ ভারত জোড়ো যাত্রা কংগ্রেসকে সুফল দিল। কংগ্রেস ভাল ফল করেছে বা আসন বাড়িয়েছে কেরল (১৪/২০), তেলেঙ্গানা (৮/১৭), কর্ণাটক (৯/২৮), রাজস্থান (৮/২৫), মহারাষ্ট্র (১৩/৪৮),

তামিলনাড়ু (৯/৩৯), উত্তরপ্রদেশ (৬/৮০), বিহার (৩/৪০) ও মণিপুরে (২/২)। রাহুল গান্ধী উত্তরে রায়বেরিলি ও দক্ষিণে ওয়াইনাদে ভাল ভোটে জিতেছেন। ইণ্ডিয়া জোটের মধ্যে বাকি ২১ দলের মধ্যে ভাল ফল করেছে সমাজবাদী দল (উত্তরপ্রদেশে (৩৭/৮০), তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে (২৯/৪২), ডিএমকে তামিলনাড়ুতে (২২/৩৯), শিবসেনা (উদ্ধব) (৯/৪৮) ও এনসিপি (শারদ পাওয়ার) (৭/৪৮) মহারাষ্ট্রে। বামপন্থীরা মাত্র ৯টি আসন জয় করেছেন। সিপিআইএম (৪), সিপিআই (২), সিপিআইএমএল লিবারেশন (২), আরএসপি (১)। সমাজবাদী দল অযোধ্যার রামমন্দির খ্যাত ফয়জাবাদ কেন্দ্রে বিজেপিকে পরাস্ত করেছে, প্রধানমন্ত্রীর বারাণসী কেন্দ্রে ব্যবধান অনেক কমিয়েছে। হেরে গেছেন অনেক দাপুটে নেতা ও মন্ত্রী।

প্রবল দমন পীড়নের মধ্যে দলিত ও জনজাতিদের দুটি দল— উত্তরপ্রদেশের আজাদ সমাজ পার্টি ও রাজস্থানের ভারত আদিবাসী পার্টি ১টি করে আসনে জয়লাভ করে। এবার বিজেডি মাত্র ১টি আসন পায় এবং বিএসপি ও বিআরএস কোন আসন পায় না। ওয়াইএসআরসিপি ৪টি এবং অন্যান্য ছটি দল ১টি করে আসন পেয়েছে। নির্দলরা পেয়েছে ৭টি আসন। নোটায় সারা দেশে ৬২.৯৯ লক্ষ (০.৯৯%) ও রাজ্যে ৫.১৪ লক্ষ (০.৮৭%) ভোট পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি আসনের আশায় মোদি-শাহরা মহকুমা স্তর অবধি প্রচারে কার্পেট বম্বিং করলেও সেগুলি যেমন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে পাশাপাশি পরিকল্পনার অভাব, প্রার্থী নির্বাচনে ত্রুটি, সংগঠনের বিস্তার না ঘটা, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এবং নেতাদের ঔদ্ধত্য ও রাজ্যের প্রকল্প আটকে দেওয়ার কৃতিত্ব ঘোষণা বিজেপির বিপক্ষে গেছে। বিপরীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপির আগ্রাসী প্রচারকে সঙ্গে সঙ্গে রুখে পাল্টা আগ্রাসী প্রচার, বিজেপির সিএএ অস্ত্র তার দিকেই ঘুরিয়ে দিয়ে মুসলমান ভোট সংহত করা ও মতুয়া ভোটের একাংশ পুনরুদ্ধার করা, মমতা দেবী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিটি আসন ও বুথভিত্তিক পরিকল্পনা, আই-প্যাক এবং পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন জনবাদী অনুদান প্রকল্প তৃণমূলকে নির্বাচনী যুদ্ধে এগিয়ে দেয়। আর এই মেরুকৃত ভোটদানে বাম ও কংগ্রেস চেষ্টা করেও হেরে যায়।

বামদের বেশ কিছু তরুণ প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারে সাড়া জাগিয়েও নির্বাচকদের মনে দাগ কাটতে পারেননি। বরং আই.এস.এফ. অনেকগুলি আসনে তৃতীয় স্থান পায়। পরাজিত বিরোধী নেতা অধীর চৌধুরি, দিলীপ ঘোষ ও মহম্মদ সেলিম।

পশ্চিমবঙ্গ

দল	তৃণমূল	বিজেপি	কংগ্রেস + বাম	আইএসএফ
আসন	২৯ (>৭)	১২ (<৬)	০১(<১) ০ (০)	০
ভোটের হার	৪৫.৭%	৩৮.৭১%	১১.১৯%	৩.৪৭%

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ অবধি ৩০ বছর গান্ধী পরিবারের নেতৃত্বে কংগ্রেসী শাসনের পর বিশেষত তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আরোপিত ১৯৭৫-'৭৭এর জরুরি অবস্থার অবসানে লোকনায়ক জয়প্রকাশের নেতৃত্বে আদি কংগ্রেস, ভারতীয় লোকদল, সোসালিস্ট পার্টি, ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রভৃতিরা মিলে জনতা পার্টি তৈরি করে। ১৯৭৭-র লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে জনতা পার্টি প্রথম জোট সরকার গঠন করে যার প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজী দেশাই (২৪.০৩.১৯৭৭-২৮.০৭.১৯৭৯) ও চরণ সিংহ (২৮.০৭.১৯৭৯-১৪.০১.১৯৮০)। এরপর নির্বাচনে জিতে আবার দীর্ঘ কংগ্রেস শাসন এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শিখ সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মৃত্যু (৩১.১০.১৯৮৪)। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী।

দ্বিতীয়বার মোর্চা সরকার হয় প্রাক্তন কংগ্রেসী ও জনতা দল নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের নেতৃত্বে বিজেপি ও সিপিআইএমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে। কংগ্রেসকে পরাজিত করে ভি. পি. সিংহ প্রধানমন্ত্রী হন (০২.১২.১৯৮৯-১০.১১.১৯৯০)। ভি. পি. সিংহ মন্ত্রীসভার পতনের পর চন্দ্রশেখর কংগ্রেসের সমর্থনে আরেকটি জোট সরকার চালান (১০.১১.১৯৯০-২১.৬.১৯৯১)। উপরোক্ত জোট সরকারগুলি কোনটাই টেকে নি জোটসঙ্গীদের নিরন্তর দ্বন্দ্বে। এরপর শ্রীলঙ্কার তামিল সন্ত্রাসবাদীদের ঘটানো বিস্ফোরণে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যু (২১.০৫.১৯৯১)। তারপর আবার কংগ্রেস শাসন। নরসীমা রাও। এই পর্বে অর্থনীতির উদারিকরণ।

তারপর নির্বাচনে ঝুলন্ত সংসদে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে বিজেপির অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীতে স্বল্পকালীন শাসন। তারপর জনতা দলের নেতৃত্বে আবার মোর্চা সরকার। প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড়া (০১.০৬.১৯৯৬-১২.০৪.১৯৯৭) ও ইন্দ্রকুমার গুজরাল (২১.০৪.১৯৯৭-১৯.০৩.১৯৯৮)। তারপর বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট সরকার। প্রধানমন্ত্রী এ.বি. বাজপেয়ী (১৯.০৩.১৯৯৮-২২.০৫.২০০৪)। তারপর কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরপর দুবার ইউ. পি.এ. জোটের মন্ত্রীসভা। মনমোহন সিংহ প্রধানমন্ত্রী। তারপর আবার বিজেপির নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ জোটের পরপর দুবার সরকার গঠন। এক্ষেত্রেও দেখা গেল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে জোট সরকারগুলি টেকেনি, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় অন্য জোট সরকারগুলি টিকেছে।

৯ জুন ২০২৪ নরেন্দ্র মোদি জোট মন্ত্রীসভা গঠন করে শপথ নিলেন। জওহরলাল নেহরুর পর দ্বিতীয় কোন প্রধানমন্ত্রী পরপর তিনবার নির্বাচিত হলেন ও শপথ নিলেন। মোদিজীর এই জোট সরকারের গরিষ্ঠতা থাকলেও তাঁর দলের গরিষ্ঠতা নেই। সেইজন্য আয়ারাম-গয়ারামের এই ভারতীয় গণতন্ত্রে নরেন্দ্র মোদি চন্দ্রবাবু নাইডু, নীতিশ কুমার প্রমুখ জোটসঙ্গীদের তুষ্ট রেখে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের শ্যেন চক্ষুকে উপেক্ষা করে কতদিন সরকারকে টিকিয়ে রাখতে পারেন সেটাই এখন দেখার।

১০.০৬.২০২৪

শতবর্ষে সমরেশ বসু (কালকূট)

(১৯২৪—১৯৮৮)

'দেশ' পত্রিকায় ০২ এপ্রিল, ১৯৮৮ ৬৫তম অধ্যায়ে 'দেখি নাই ফিরে' ধারাবাহিক উপন্যাসের শিরোনামের দক্ষিণে বক্রভাবে ছাপা হয়েছিল একটি লাইন ''এই লেখা আর শেষ হল না''। 'বাংলা' সাহিত্যের অনন্য বলিষ্ঠ লেখনির অধিকারীর অকাল প্রয়াণে অকাল সমাপ্তি ঘটল আর এক মহাজীবনকে জানার। কিন্তু সে কথা অনেক পরে। তার আগে লিখতে হয় সেই সাহিত্য স্রষ্টার নগণ্য থেকে অনন্য হয়ে ওঠার লড়াইয়ের কথা। সময়টা ছিল ১৯৪৩ সাল। দৈনিক এক টাকা চার আনা মজুরিতে ইছাপুরের অস্ত্র কারখানায় যেতেন কাজ করতে। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে অভাবের সংসার। তাই আসলের থেকে সুদের বহর বেশি। অর্থাৎ বেতনের থেকে ওভারটাইমের দিকে ঝোঁক আরো বেশি। থাকতেন আঁতপুরের এক এঁদো বস্তির হতশ্রী এক ঘরে। একটু বেশি আয়ের জন্য রাতের অন্ধকার থাকতেই মিউনিসিপ্যালিটির টাইমকলের জলে স্নান সেরে নাকে মুখে কিছু দিয়েই ছুটতেন কাজে। সন্তানরা সে সময় ঘুমিয়ে। আর ফিরতেন রাতের আঁধার নামলে। সন্তানরা তখন ঘুমিয়ে শুধু জেগে আছেন কেবল একজন, তাঁর স্ত্রী, তাঁকে খাইয়ে নিজে খাবেন বলে। এর পরে ক্লান্ত শরীরে লিখতে বসাটা একরকম অসম্ভব বললেই চলে। কিন্তু তাঁর মনের ভিতরের উন্মাদনা তাঁকে কলম ধরতে বাধ্য করতো। যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন খুব আক্রা। তবু তার নিভু নিভু আলোতেই চলতো তাঁর কলম। সঙ্গ দিতো পাশের বদ্ধ নালার পুতি গন্ধ আর তিনি ফিরে এসেছেন বুঝে বস্তিওয়ালির মেয়ের বকেয়া ঘর ভাড়ার জন্য গালি গালাজ।

কম্যুনিস্ট পার্টি (অখণ্ড) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করার জন্য তাঁর জেল হয়। এই সুনামের জন্য তাঁর চাকরিটুকুও চলে যায়। এবং এমন একটি সার্টিফিকেট তিনি কর্মস্থল থেকে পান যে আর কোথাও চাকরি করতে পারেন নি। সন্তানদের মুখে সামান্য অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন অফিস ক্যান্টিনে ডিম বিক্রি করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর জেল জীবনের অবসরে আরো বেশি করে উন্মোচিত হতে থাকে তাঁর লেখক সত্তার। মেহনতী মানুষকে (চটকল শ্রমিকদের) অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা আর তাঁর মননশীলতায় রূপ নিতে থাকে এক মহতী উপন্যাসের। 'উত্তাঙ্গ' প্রকাশিত হবার পর স্বরূপে-বিরূপে উঠল সমালোচনার ঝড়। কিন্তু সত্যের আগুনকে ছাইচাপা দিয়ে রাখা যায় না। প্রকাশের ন'মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি পরের সংস্করণের রয়্যালটির পুরো টাকা অগ্রিম দিল। তাঁর অভাবী সংসারে সে অনেক টাকা। স্ত্রী গৌরী দেবী গেলেন ঘর ভাড়ার বকেয়া টাকা শোধ করতে। তখন সবার চোখে অবিশ্বাস। পুরুষ মানুষ ঘরে বসে বসে কি সব কলম ঘষছে তাতে এত টাকা। নিশ্চয়ই রাতে ডাকাতি করতে বার হয়।

'উত্তাঙ্গ' লেখক সমরেশের উত্তরণ ঘটায়। এরপর একের পর এক গল্প, উপন্যাস সাহিত্যমোদীদের হাতে আসতে লাগল। যার মধ্যে অন্যতম 'বি.টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'অয়নান্ত', 'জগদ্দল', 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'খণ্ডিতা'। 'গঙ্গা' উপন্যাস তাঁকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দেয়। অজস্র ছোটগল্প, 'আদাব', 'গুণিন', 'পাড়ি', 'পাপপূণ্য' ও আরও অনেক গল্প তাঁর বলিষ্ঠ ভাবনা ও সমাজ সচেতনতায় বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমরেশ বসু যখন স্বনামের লেখনিতে জীবনের সংগ্রাম ও নির্মম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করছেন তখন তাঁর অন্য মনটি খুঁজতে চাইছে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখিটি'কে। সে যেন সত্যের চেয়েও পরম সত্য। ''মানুষ মেলে কতশত, মনের মানুষ মেলে কই। আর যদিবা মেলে তাকেও ধরে রাখতে পারা যায় কই?'' তাঁর সেই উদাসীন নিস্পৃহ মন পাখা মেলল 'কালকূট' ছদ্মনামে। মনের মানুষের সন্ধানে পথ চলতে শুরু করল তাঁর সেই অন্য মনটি। যার শুরু 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। তারপর একে একে 'আরব সাগরের জল লোনা', 'কোথায় পাবো তারে', 'অমৃত বিষের পাত্রে', 'পুণ্যভূমে পুণ্যস্নান' স্নিগ্ধ করলো বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের। পথ চলতে চলতে একসময় ধরে নিলেন পুরাণের পথ। সে এক অপরূপ পথ চলা। সময়ের পথ বেয়ে 'শাম্ব' তাঁকে এনে দিল সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার।

ফিরে আসি 'দেখি নাই ফিরে'তে। ইতিমধ্যে তাঁর জীবন যাপন বদলে গেছে অনেক। বদলে গেছে লেখার ধরনধারণও। বহু লেখাতেই তাঁর মেধার থেকে মেদের বাহুল্য। এই পরিবর্তন তিনি নিজেও বুঝতেন। তাই আবার একবার ফিরতে চাইলেন সেই শাণিত সমরেশের লেখনিতে। সম্পূর্ণ অন্যরীতিতে অন্যধারায় এক বেহিসাবি, উদাসীন, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী শিল্পী-ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ'কে করলেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক। তথ্যানুসন্ধানে প্রচুর পরিশ্রম করলেন তিনি। মন চাইলেও হৃদয় কিন্তু তার পরিশ্রমের ধাক্কা নিতে পারছে না। চিকিৎসকেরা পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন তাঁকে। কিন্তু তিনি নাছোড়। এটাই হবে তার শেষ কাজ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তারপরে তিনি নেবেন পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সে সুযোগ দিল না। তবে যতটুকু লিখে গেলেন সেটুকুও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর জন্ম শতবর্ষে তাঁকে জানাই হৃদয়ের শ্রদ্ধা।

শতবর্ষে নারায়ণ সান্যাল

(১৯২৪—২০০৫)

সাহিত্য-পাঠে পছন্দের বিষয় এক একজনের এক একরকম হয়। তাই পছন্দের সাহিত্যিকও হয় ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু অনায়াস দক্ষতায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কলম চালাতে পারেন এমন সাহিত্যিক সাহিত্যজগতে বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রায় নেই বললেই চলে কেবল একজন ছাড়া। বাংলা সাহিত্যে সেই বিরল থেকে বিরলতম সাহিত্যিকটির নাম নারায়ণ সান্যাল। এমন একজন সাহিত্যস্রষ্টা যে আপামর বাঙালির অন্যতম পছন্দের মানুষ হবেন সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাংলায় একটা কথা আছে ''রথ দেখা ও কলা বেচা।'' সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটু ঘুরিয়ে বলা যায় 'জ্ঞানার্জন' এবং বিনোদন' (Enlighten and Entertain)। শুধু নানান বিষয়ই নয় বিশুদ্ধজ্ঞানকে কি করে মজাদার ভঙ্গিতে অতি সাধারণের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যার পরতে পরতে থাকবে রোমাঞ্চ, নাটকিয়তা, সাসপেন্স তার অন্যতম উদাহরণ সান্যাল মশাইয়ের লেখনি। অথচ পেশায় তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে পূর্তবিভাগের অতি বিচক্ষণ দায়িত্বশীল একজন নকসাবিদ্। সারাজীবনে প্রায় দেড় শতাধিক বই তিনি লিখেছেন নানা বিষয়ে। সেই বিষয় সমাহারে কি যে নেই তা খুঁজে পাওয়া বেশ দুঃসাধ্য। উদ্বাস্তু সমস্যা থেকে গ্রামোন্নয়ন, শিশু সাহিত্য থেকে সামাজিক উপন্যাস, ইতিহাস থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান; স্থাপত্য ভাস্কর্য থেকে দেবদাসী আখ্যান, আইনস্টাইনের $E=mc^2$ থেকে লেওনার্দোর নোটবই, না-মানুষের জীবন পাঁচালি থেকে অরিগামি, ভ্রমণ থেকে স্মৃতিচারণ আর অবশ্যই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রহস্য থেকে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে একাকী অভিযান। এর পরেও বাকি থেকে গেল অনেক অনেক বিষয়। তার প্রতিটি রচনাই শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। সাহিত্যিক মহলে যদিও তিনি তেমন একটা কলকে পেতেন না, কিন্তু তাতে না স্রষ্টার কিছু যেতো আসতো না তার গুণগ্রাহী পাঠকদের। কি কলেজস্ট্রীট বই পাড়ায় কি কলকাতা বইমেলায় নারায়ণ সান্যালের বই-এর কাটতি ছিল সবচেয়ে বেশি। এত কিছুর পরেও তিনি কিন্তু ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ। তাঁর বইয়ের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কখনো কোনো বইয়ের ভূমিকা লিখতেন না, দিতেন কৈফিয়ৎ আর তার ধরনটাও ছিল ভারি চমৎকার।

আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত মজাদার মানুষ হলেও নিজের ভাবনায় প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং একনিষ্ঠ। তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু তিনি বিশ্বাস করতেন না। দু-দুটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্টও তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি নিজেই আপন বিচার-বুদ্ধিতে বিষয়টার গভীরে পৌঁছাতে চাইলেন। নিজ-অর্থব্যয়ে কার্যালয় থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছুটি নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান নেতাজীর চরণ চিহ্ন অনুসরণ করে। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি এই বিষয়ে দুটি বই লেখেন 'আমি নেতাজীকে দেখেছি', ও 'নেতাজী রহস্য সন্ধানে'। শেষোক্ত বইটির অকাট্য যুক্তিজাল অগ্রাহ্য করা কোনো পাঠকের পক্ষে বুঝিবা সম্ভব নয়। তবে সবচেয়ে দুঃখ লাগে তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত এই উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কাছে তাঁকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয় এবং তিনি ভৎর্সিত হন। হবে নাই বা কেন দেশ স্বাধীন হবার পর অনেক দিন পর্যন্ত সরকারি কার্যালয়ে নেতাজীর ছবি পর্যন্ত লাগানো নিষিদ্ধ ছিল।

কোনো কোনো সমালোচক বলে থাকেন তাঁর বেশিরভাগ রচনাই নাকি মৌলিক নয় অন্য লেখকদের বিশেষত বিদেশি রচনাকারদের রচনায় প্রভাবিত। কিন্তু তাতে কিবা এমন এসে যায়। সত্যের আলোকরশ্মি যেভাবেই এসে পৌঁছাক না কেন তা মিথ্যা হয়ে যায় না। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর সৃষ্টি আগামীদিনের পাঠকদের কাছেও সমান আদৃত হবে।

১৯৬৯ সালে 'অপরূপা অজন্তা' গ্রন্থটির জন্য নারায়ণ সান্যাল 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও ২০০০ সালে 'রূপমঞ্জরী' গ্রন্থটির জন্য পান 'বঙ্কিম পুরস্কার'। এ ছাড়াও তাঁর 'সত্যকাম' গ্রন্থটির জন্য তিনি পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র গল্পকার পুরস্কার।

এমন একজন বহুদর্শী সাহিত্যস্রষ্টার জন্মশতবর্ষে পত্রিকার তরফ থেকে রইল অনেক অনেক শ্রদ্ধা।

শতবর্ষে ফাদার পল দ্যতিয়েন

(১৯২৪—২০১৬)

যে কজন বিদেশি কেলমাত্র বাংলা ভাষাকে ভালবেসে বাঙালির খুব কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন ফাদার দ্যতিয়েন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বলা যেতে পারে রেভারেন্ড লং সাহেব, উইলিয়াম কেরী, ও এন্টনি ফিরিঙ্গীর সাথে প্রায় সমস্বরে উচ্চারিত হয় ফাদার দ্যতিয়েনের নাম। জন্মসূত্রে ফরাসি, বেলজিয়ামের নাগরিক সন্ন্যাস নেবেন সংকল্প করায় তাঁর মা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি জেস্যুইট সংঘে যোগ দেন। প্রশিক্ষণের পর তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয় কঙ্গো কিংবা ইণ্ডিয়া। ইতিমধ্যে তিনি ইন্ডোলজিতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতকেই কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নেন। সংস্কৃতর পাশাপাশি বাংলা ভাষা তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' এবং অবন ঠাকুরের 'ক্ষিরের পুতুল' তাঁকে বাংলা ভাষার অসীম সম্ভারের খোঁজ দেয়। তিনি ১৯৪৯ সালে বাংলায় এসে জেস্যুইট সংঘে যোগ দেন। প্রথমে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স

কলেজ ও পরে শান্তিনিকেতনে তিনি বাংলা ভাষা চর্চা করেন। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে তিনি এতটাই মিশে যান যে তার যাপন 'দেশ' পত্রিকায় 'ডায়েরির ছেঁড়াপাতা' হয়ে ধারাবাহিক ভাবে বার হতে থাকে। তা পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে যান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বিদগ্ধ পণ্ডিতরাও। তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর 'হুতোম প্যাঁচা।'

১৯৪৯ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলায় ছিলেন তারপরে ফের তার জন্মস্থান ব্রাসেলসে ফিরে যান। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর সাহিত্যকর্ম 'আটপৌরে দিনপঞ্জি', 'রোজনামচা', 'বাংলা গদ্য পরম্পরা' প্রভৃতি রচনায় বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। উইলিয়াম কেরীর 'বাংলা ইতিহাস মালা' গ্রন্থটিকে তিনি উদ্ধার করে আর একবার 'বাংলা' সাহিত্যমোদিদের ধন্য করেন।

১৯৭২ সালে নরসিংহ দাস পুরস্কার ও ২০১০ সালে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে রইল শ্রদ্ধা।

শতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত

(১৯২৪—১৯৮১)

বংশী চন্দ্রগুপ্ত নামটি শুনলেই বাঙালি বিশেষত চলচ্চিত্রপ্রেমী বাঙালি বড় স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ে। তাঁর নামের সাথে একাত্ম হয়ে বাঙালির বড় প্রিয় ও গর্বের আরো অনেক নাম। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বাসু চ্যাটার্জি, হৃষিকেশ মুখার্জী, তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ, অপর্ণা সেন এমন আরো কত নাম। কখনো তিনি এঁদের প্রোডাকসান ডিজাইনার কখনো বা আর্ট ডিরেকটার। সেটটা কেমন চাই—তা পরিচালক একবার বংশী চন্দ্রগুপ্তকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেই আর পরিচালকের চিন্তা নেই। যা চাইছেন একেবারে তা করে দেখিয়ে দেবেন বংশী বাবু। শুধু বাংলা নয়, লন্ডন, মুম্বাইতেও প্রচুর চিত্র-পরিচালক যেমন জাঁ-রেনোয়ার, শ্যাম বেনেগল, ইসমাইল মার্চেন্ট, জেমস আইভরি প্রমুখদের সঙ্গেও অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে কাজ তিনি করেছেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ছিল তাঁর দেশ। চিত্রশিল্পী হবার অভিপ্রায়ে তিনি কাশ্মীরে চলে আসেন। সেখানে শুভ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁরই পরামর্শে তিনি কলকাতায় আসেন এবং কর্মজীবনের বেশিরভাগটাই তিনি কলকাতায় কাটান। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'তে যে যুগলবন্দী তাঁদের শুরু হয়, 'শতরঞ্চ কি খিলাড়ি' পর্যন্ত তা বজায় থাকে। অপর্ণা সেন তাঁর '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' ছবিটিই তাকে উৎসর্গ করেন।

চলচ্চিত্র জগতের বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। তিনি তিন তিনবার 'ফিল্মফেয়ার সেরা শিল্প নির্দেশকের' পুরস্কার পান। সীমা (১৯৭২), দো ঝুট (১৯৭৬) এবং চক্র (১৯৮২) ছাড়াও ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড ব্রিটিশ ফিল্ম এ্যওয়ার্ড পুরস্কারটি মরণোত্তর পুরস্কার রূপে পান।

এহেন এক গুণী মানুষের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা।

শতবর্ষে অরুন্ধতী দেবী

(১৯২৪—১৯৯০)

ষোল কলা না হোক বেশ কয়েকটি কলায় বিশেষতঃ নৃত্য, গীত, অভিনয়ে অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন অরুন্ধতী গুহ ঠাকুরতা। তাঁর শৈশব কাটে ঢাকায় সেখানেই তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার শুরু। এরপর কলকাতায় এসে নাড়া বাঁধেন সুরসাগর হিমাংশু দত্তের কাছে। তারপরে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করেন। সেখানে সঙ্গীত বিভাগে বিশেষ কৃতিত্বের পাশাপাশি বিকশিত হয় তাঁর আরো একটি বাল্য বিদ্যাচর্চা। অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেন। কিন্তু শিক্ষার থেকে সংস্কৃতির দিকটি তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করে। গুরু ব্রজবাসী ও বালকৃষ্ণ মেননের শিষ্যা হয়ে নৃত্যপারঙ্গনা হয়ে উঠলেন তিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেন। আকাশবাণীর নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। একের পর এক গানের রেকর্ড প্রকাশ হতে থাকে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে নিউ থিয়েটার্সের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র জগতে পা রাখা। তারপর ৫০টিরও বেশি ছবিতে দুরন্ত অভিনয়ের সাক্ষর রাখেন যার মধ্যে অন্যতম 'ছেলে কার', 'ভগিনী নিবেদিতা', 'চলাচল', 'বিচারক' 'পঞ্চতপা', 'ঝিন্দের বন্দী', 'জতুগৃহ', 'ক্ষুধিত পাষাণ'' প্রভৃতি। এরপর অভিনয় ছেড়ে ক্রমে চলচ্চিত্র পরিচালনায় চলে আসেন এবং সেখানেও পান দারুণ সাফল্য। 'ছুটি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'পদিপিসির বর্মীবাক্স', 'দীপার প্রেম' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা কন্যা তাঁর বেশ কিছু গান, কবিতা ও প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ করে ভারত ও বিদেশের বিদগ্ধজনের কাছে সমাদৃত হন।

১৯৫৭ সালে চিত্রপরিচালক তপন সিংহের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

বহু পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হন। যার মধ্যে অন্যতম অভিনয়ে জাতীয় পুরস্কার (ছেলে কার - ১৯৫৪), রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক (ভগিনী নিবেদিতা-১৯৬৩), পরিচালনায় রাষ্ট্রপতি রৌপ্যপদক (ছুটি-১৯৬৭)।

এমন একজন বিদুষী নারীর জন্ম শতবর্ষে রইল অনেক শ্রদ্ধা।

শতবর্ষে তপন সিংহ

(১৯২৪—২০০৯)

বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অতুজ্জ্বলদেশ। সেই শিল্পের অন্যতম একটি মাধ্যম চলচ্চিত্র। বাংলা

বিশেষত কলকাতা এতজন বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের নিজের শহর বলে পরিচিত তার নজির সারা বিশ্বে প্রায় নেই বললেই চলে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখদের সঙ্গে যে নামটি প্রায় একই সাথে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন তপন সিংহ। তিনি একই সঙ্গে হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে কাজ করেন। দেশের বাইরে বিদেশেও চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। প্রায় ষাট বৎসরের অধিক তাঁর কর্মজীবন। কলকাতায় জন্ম হলেও তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল ভাগলপুরে। পরে পাটনা কলেজ থেকে বি.এস.সি ও রাজাবাজার সায়ন্স কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় এম. এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

রোনাল্ড কোলম্যানের 'এ টেল অফ টু সিটিজ' (চার্লস ডিকেন্স) লেখা গল্প অবলম্বনে ছবিটি তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করে ১৯৫১ সালে লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি জমান। চলচ্চিত্র নির্মাণের জ্ঞান অর্জনের জন্য। সেখানে পাইনউড স্টুডিওর ম্যানেজার ক্রাই হিরসথের সঙ্গ পান এবং তাঁর মাধ্যমে তিনি সেখানে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগ দেন। তিনি সম সাময়িক মার্কিন ও ব্রিটিশ পরিচালক জন ফোর্ড, ক্যারল রীড, বিলি ওয়াইল্ডার প্রমুখদের ছিলেন দারুণ অনুরাগী। তাঁর মস্তিষ্ক যখন এঁদের কাজ গভীর ভাবে অনুধাবন করছে তার হৃদয় তখন রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করছে। যার অসামান্য উদাহরণ 'কাবুলিওয়ালা', তবে তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি 'অঙ্কুশ'। তাঁর পরিচালক কর্মজীবনে তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি ছবি তৈরি করেছিলেন যার বেশিরভাগই অত্যন্ত সমাদৃত হয়। 'লৌহকপাট', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'ঝিন্দের বন্দী', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নির্জন সৈকতে', 'জতুগৃহ', 'গল্প হলেও সত্যি', 'হাটে-বাজারে', 'আপনজন', 'সাগিনা মাহাতো', 'রাজা', 'হারমোনিয়াম', 'এক যে ছিল দেশ', 'সবুজ দ্বীপের রাজা', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'সফেদ হাতি', 'এক ডক্টর কী মৌত', 'আদালত ও একটি মেয়ে', 'আতঙ্ক'। এমন আরো কত ছবি।

তবে স্ত্রী অরুন্ধতী দেবী প্রয়াত হলে শেষের প্রায় কুড়িটা বছর তিনি ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে থাকেন। একেবারে শেষদিকে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিল রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'।

তিনি প্রায় ১৪ বার নানাবিধ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৯২ সালে 'পদ্মশ্রী' ও এবং ২০০৬ সালে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে সম্মানিত হন। পেয়েছেন ১৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এমন একজন বিদগ্ধ মানুষের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধা।

শতবর্ষে সুচিত্রা মিত্র

(১৯২৪—২০১১)

বিহারের উপর দিয়ে ছুটে চলা এক এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় জন্ম নিল অত্যন্ত সুন্দর ফুটফুটে এক মেয়ে। ট্রেনটা তখন ঝমঝম করে একটি স্টেশন পার হচ্ছে। স্টেশনের নাম 'গুজহান্ডি'। বাবা বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত আহ্লাদে সেখানেই মেয়ের নামকরণ করলেন 'গজু'। কে জানতো এই গজুই একদিন বাংলা সঙ্গীত জগতের বিশেষতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হয়ে উঠবে 'সুচিত্রা মিত্র' নামে।

শৈশবেই তাঁর মিষ্টি কণ্ঠস্বরে আপ্লুত হয়ে যান পঙ্কজ কুমার মল্লিক। তিনিই হন তাঁর গানের প্রথম শিক্ষাগুরু। পিতা সৌরিন্দ্রমোহন ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিশেষত রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৯৪১ সালে বৃত্তি গ্রহণ করে সুচিত্রার শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনে প্রবেশ। সেখানে গুরুরূপে পান ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে। ১৯৪৫ সালে পুনরায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে স্নাতক হন। শান্তিনিকেতনে কেবল সঙ্গীত নন একইসঙ্গে চিত্রাঙ্কন অভিনয় ও নৃত্যেও তিনি অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। শান্তিনিকেতনের সে সময়কার পরিবেশে যা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতই তাকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দেয়। দ্বিজেন চৌধুরির সঙ্গে একসঙ্গে তিনি গড়ে তোলেন 'রবিতীর্থ প্রতিষ্ঠান। সে সময় তাঁর পরিচালনায় এবং প্রশিক্ষণে সেই প্রতিষ্ঠান এতটাই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে সারাবছর ধরে দেশে এবং দেশের বাইরে তাদের অনুষ্ঠান করার ডাক পড়ে। তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়া ও হাঙ্গেরিতে 'রবিতীর্থ' ও সুচিত্রা মিত্র ছিল অত্যন্ত পরিচিত নাম। উস্তাদ আমজাদ আলি খান তাঁকে সারা বিশ্বে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গাইড বলে অভিহিত করেন। আকাশবাণী কলকাতার নিয়মিত শিল্পক সুচিত্রা মিত্র সারা জীবনে প্রচুর পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। যার মধ্যে ১৯৫৫ সালে টেগর রাইস প্রাইজ (লন্ডন), ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৮৬ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার, এছাড়াও HMV GOLDEN DISC AWARD। এশিয়ান পেন্টস থেকে শিরোমণি পুরস্কার, বিশ্বভারতী থেকে সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম উপাধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে আলাউদ্দিন পুরস্কার এবং রবীন্দ্রভারতী, বর্ধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক D.LIT পান। ২০০২ সালে তিনি কলকাতার শেরিফ রূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম মহিলা শেরিফ। এমন এক সুরকন্যার জন্ম শতবর্ষে অনেক শ্রদ্ধা।

শতবর্ষে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯২৪—২০০০)

বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে বোলপুরের শান্তিনিকেতন তেমন দূর নয়, তবে সে সময় বেশ অনেকটাই পথ। তবু পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় যেহেতু বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কর্মী তাই শৈশবে শিক্ষা শুরু হলো একেবারে শান্তিনিকেতন থেকেই। আরো বিশেষ ভাবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের

কোলে বসেই। তাঁর ভাল নাম অনিমা আর বাবা আদর করে ডাকেন 'মোহর' বলে। রবীন্দ্রনাথের অনিমা নামটি পছন্দ হয়নি। তিনি তাঁর নাম বদলে করেন কণিকা, আর অবন ঠাকুর তাঁকে আদর করে ডাকতে লাগলেন 'আকবরী মোহর' বলে। শৈশব থেকেই মোহর গানের পরিবেশে বড় হয়েছে। তাঁর দিদিমার গলায় টপ্পা শুনে লোকে মুগ্ধ হতো। রবিঠাকুরের আদরের কণিকা গুরুপল্লীর যে কোনো উৎসবেই খুব আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতো। ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনের শারদোৎসবে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো মঞ্চে অভিনয় করতে উঠলেন আর সেইবারই মোহরের প্রথম মঞ্চে অবতরণ। খুব তাড়াতাড়ি তিনি সঙ্গীতে পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। গুরু হিসাবে পেলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও শৈলজারঞ্জন মজুমদার, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শান্তিদেব ঘোষ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ আরও অনেককে। শিখলেন নজরুল গীতি, ভজন, অতুল প্রসাদী এবং অতি অবশ্যই মার্গ সঙ্গীতও। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রথম তাঁর যে রেকর্ড প্রকাশিত হয় তা নীহারবিন্দু সেনের কথা ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে আধুনিক গান। এ ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ মনে মনে বেশ দুঃখ পান এবং খানিকটা রুষ্টও হয়েছিলেন। তবে এ দুঃখ তাঁর বেশি দিন থাকেনি। সময়ের পরিণতিতে তিনি হয়ে ওঠেন শান্তিনিকেতনের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। বিভিন্ন ধরনের গানের প্রচুর রেকর্ড তাঁর একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৪৩ সালে তিনি শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনে যোগ দেন ও দীর্ঘ দিন তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যবিভাগের প্রধান ছিলেন এবং ১৯৮৪ সালে তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ পদে থেকে অবসর নেন। এই দীর্ঘসময় শান্তিনিকেতন আর তিনি প্রায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। বহুবার বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। পেয়েছেন অনেক অনেক সম্মান যায় মধ্যে অন্যতম—

শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকা (BFJA) ১৯৭৩
সঙ্গীত নাটক একাদেমি পুরস্কার ১৯৭৯
Gold Disc of Gramaophone Co. ১৯৮৩
পদ্মশ্রী পুরস্কার ভারত সরকার ১৯৮৬
দেশিকোত্তম (বিশ্বভারতী) ১৯৯৭

তাঁর মৃত্যুতে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি গভীর শোক ব্যক্ত করে জানিয়েছিলেন যে দেশ হারালো তাঁর প্রিয় কন্যা সর্বশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকে। এই মহান শিল্পীর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধা।

ডাঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ

(১৯২৩—১৯৯০)

এমন কিছু চিকিৎসক আছেন যাঁরা তাঁদের এই পেশাটিকে নিছক অর্থ-উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে নয় বরং নিপীড়িত মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করেন। চিকিৎসা বিদ্যা যেখানে পণ্য হয়ে ওঠে না। যেখানে অর্থের বিনিময়ে মনুষ্যত্ব বিক্রি হয়ে যায় না। যেখানে

অশোক বোস ও ডাঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ

বিজ্ঞানটিকে প্রকৃত অর্থে যন্ত্রণা মুক্তির উপকরণ স্বরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে, এমন একটি উদাহরণ রয়েছে ডাঃ পূর্ণেন্দু ঘোষের সমগ্র চিকিৎসক জীবনটিকে। মুখের কথায় বা সাংগঠনিক পরিচয়ে অনেক চিকিৎসকই হয়ত আজ দাবি করবেন তাঁরা জনগণের কত কাছের মানুষ, কিন্তু ডাঃ ঘোষ ছিলেন প্রয়োগবাদী মানুষ। নিছক দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে থেকে একদিকে যেমন জীবনের শেষ দিনগুলিও সাহিত্য কর্ম করে গেছেন, বিলাসপুরের দুঃস্থ মানুষজনও তেমন পেয়েছেন তাঁর সুচিকিৎসা ও অকৃত্রিম ভালবাসা। তিনি প্রগতিশীল চিকিৎসকদের কোন সংগঠন গড়ে তোলেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন ও সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে দৃঢ় চেতনা তাঁর সমসাময়িক ও তরুণ বেশ কয়েকজন চিকিৎসককেই উদ্বুদ্ধ করেছে। ক্ষুদ্র, স্বার্থসর্বস্ব জীবনযাত্রার যুগে শোষণহীন নতুন সমাজের লক্ষ্যে তাঁর ত্যাগ অবশ্যই সাহায্য করবে গতানুগতিকতার বাইরে এসে আরো কিছু করার কথা ভাবার। তিনি ছাত্রাবস্থায় কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংগ্রামে চিকিৎসক হিসাবে অংশ নিয়ে সুন্দরবনে চলে যান। তেভাগা আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেছেন। খলি পায়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রোগী দেখেছেন, আর্তের সেবা করেছেন। আন্দোলনকারীদেরও চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের উদ্বুদ্ধও করেছেন। আন্দোলনকারীদের কাছে রাঙা ডাক্তার হিসাবে জনপ্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং ভোজপুর কৃষক আন্দোলনেও অংশ নেন। 'ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ফ্রন্টে'র অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন। ছিলেন 'সেতু' পত্রিকার সম্পাদক।

জীবনপঞ্জী

পিতা : সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। মাতা : হেমালিনী ঘোষ। শিক্ষা : পুরুলিয়া মিড্‌ল স্কুল, খিদিরপুর একাদেমি, বিদ্যাসাগর কলেজ, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমান আর.জি.কর)।

কর্মজীবন : স্বাধীনভাবে চিকিৎসা। কলকাতা, চক্রধরপুর এবং বিলাসপুর।

কারাবাস : ১৯৪৯-৫০ (তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে), ১৯৭০ (নকশালবাড়ি আন্দোলনে অংশগ্রহণ), ১৯৭৪-৭৫ (ভোজপুর কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ)।

[সংকলন: দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পূর্ণেন্দুর ঘোষ : জয়দেব পাঠক]

[সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শোভা সেন, কলিম শরাফি, বাদল সরকার প্রমুখের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানাই—সম্পাদকমণ্ডলী]

রবার্ট সোলো

(১৯২৪-২০২৩)

জন কেনার্ড মেইনস্ পরবর্তী বিশ্ববরেণ্য সমাজ কল্যাণ অর্থনীতিক যিনি ধ্রুপদি অর্থনীতির সঙ্গে আধুনিক অর্থনীতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন এবং বৃদ্ধির অর্থনীতিকে (Growth Economy) উন্নত ও জনপ্রিয় করেন। এই ইহুদি-মার্কিন স্কুলের পাঠ শেষ করে মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্কলারশিপ নিয়ে হাভার্ড কলেজে পড়তে যান এবং সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৪১-এ মার্কিন সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে উত্তর আফ্রিকা ও ইতালিতে কর্মরত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫-এ দেশে ফিরে হাভার্ড ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান তত্ত্ব নিয়ে উচ্চশিক্ষা করেন। ১৯৪৯এ সহকারি অধ্যাপক হিসাবে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (এম.আই.টি.) অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। প্রথমে পরিসংখ্যানবিদ্যা (Statistics) ও পরিসংখ্যান অর্থনীতি (Econometrics) এবং পরে সমষ্টি অর্থনীতি (Macro-economics) পড়াতে শুরু করেন।

১৯৫৬ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বগুলি: (১) আ কনট্রিবিউশন টু দ্য থিয়োরি অফ ইকনমিক গ্রোথ, (২) টেকনিকাল চেঞ্জ অ্যাণ্ড দি এগ্রিগেট প্রোডাকশান ফাংশন; (৩) ইনভেস্টমেন্ট অ্যাণ্ড টেকনিকাল প্রগ্রেস। রয় হ্যারড ও এভসি ডোমারের প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম ও মূলধনের অনুপাত কেন্দ্রিক সাম্যের তত্ত্বকে তিনি মূলধনি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির বৃদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে সুস্থায়ী বৃদ্ধি সম্ভব। চার দশকের সহযোগী নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলশনের সাথে বের করে চললেন 'ভন নিউম্যান গ্রোথ থিওরি', 'থিওরি অফ ক্যাপিটাল', 'লিনিয়ার প্রোগ্রামিং', 'ফিলিপস কার্ভ' একের পর এক তত্ত্ব। তাঁর 'এক্সোজেনাস গ্রোথ মডেল' জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অর্থশাস্ত্রের গ্রোথ অ্যাকাউন্টিং শাখার তিনি ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেন। নিজে ১৯৮৭তে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। অর্থনীতিতে নোবেল পান তাঁর চার ছাত্র।

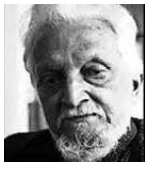

রণেন আয়ন দত্ত

(১৯২৭-২০২৪)

শিল্প ও বিজ্ঞাপন জগতের এক দিকপাল স্রষ্টা চলে গেলেন। অবিভক্ত বাংলার শ্রীহট্টের সন্তান ম্যাট্রিক পাশ করে ১৮৫৪-তে স্থাপিত কলকাতার স্কুল অফ আর্ট (১৯৫১-তে হয়ে যায় 'গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট, ক্যালকাটা)-এ ভর্তি হন। স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবার উৎসাহে। পার্সি ব্রাউন, ই বি হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, মুকুল দে প্রমুখ বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আলোয় স্কুলটি আলোকিত ছিল। সেখানে শিক্ষক হিসাবে পেলেন নামী চিত্রকর রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, মাখন দত্তগুপ্তদের। অন্নদা মুন্সীর বিজ্ঞাপন সংস্থা 'প্রবেশিকা'য় চাকরিতে যোগ দেন। সেখান থেকে মুম্বাইএর 'স্ট্রোন অ্যাকস', তারপর 'জে ডব্লিউ (পরে হিন্দুস্তান) টমসন'। শেষে ১৯৭৪ সালে তৈরি করেন নিজের সংস্থা 'আরএডি অ্যাসোসিয়েটস'।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন, ইলাস্ট্রেশন, প্রচ্ছদ শিল্প, সিনেমার প্রচার অঙ্কন, স্থাপত্য সজ্জা প্রভৃতিতে রপ্ত করেছেন সৃজনশীল মুন্সীয়ানার সঙ্গে নিজস্ব আকর্ষণীয় শৈলী। বিজ্ঞাপন জগতে তাঁর সৃষ্ট 'মেড ফর ইচ আদার', 'জবাকুসুম', 'শালিমার নারকেল তেল' প্রভৃতি খুব জনপ্রিয় হয়। প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উল্লেখযোগ্য। এর সঙ্গে 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'সুন্দরম' পত্রিকা, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ছবি আঁকা ও শিল্প পরিকল্পনার কাজ করেছেন। 'কাবুলিওয়ালা', 'হারানো সুর', 'ছুটি' চলচ্চিত্রের প্রচার চিত্র এঁকেছেন। স্থাপত্যসজ্জার অভিনব স্বাক্ষর রেখেছেন দিল্লির 'বেঙ্গল প্যাভিলিয়ন', মুম্বাই এর 'এয়ার ইণ্ডিয়া ভবন', রাঁচীর 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কোল ম্যানেজমেন্ট ভবন'। দিল্লির এশিয়া-৭২ মেলা মণ্ডপ তাঁর আরেকটি প্রশংসনীয় কাজ। এছাড়াও স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার আর্কাইভ, রামমোহন রায় স্মারক সংগ্রহশালা, দুর্গাপুর স্টিল মিউজিয়াম, গঙ্গায় জাহাজ পরিবহন সংগ্রহশালা প্রভৃতির অন্দরসজ্জা তাঁর করা।

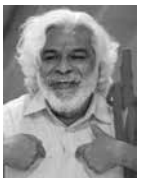

গদর

(১৯৪৯-২০২৩)

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের মেডাক জেলার তোপরানের গরিব দলিত কৃষি শ্রমিক পরিবারের সন্তান গুম্মাদি ভিট্টল রাও হয়ে উঠলেন বিখ্যাত বিপ্লবী চারণ কবি গদর। ছোটবেলায় বাবার কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আম্বেদকরের গল্প শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরে ছাত্রজীবনে ১৯৬৭-র নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের বজ্র নির্ঘোষ তাঁকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে টেনে আনে। এরপর শ্রীকাকুলামের কৃষক অভ্যুত্থান চেরাবান্দা রাজু প্রমুখের নেতৃত্বে কবি ভারভারা রাওদের সঙ্গে তাকেও সহযোগী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে উৎসাহ জোগায়। ১৯৬৮-তে তৈরি হয় 'আর্ট লাভার্স'। ১৯৭২-এ ছাত্রনেতা জর্জ রেড্ডি খুনের প্রতিবাদী আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭৩-এ তৈরি হল জননাট্যমণ্ডলী। লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন রূপে বিপ্লবী মতাদর্শকে মানুষের ঘরের আঙিনায় নিয়ে এলেন। ওই পর্বে মাঠে ময়দানে

অসংখ্য অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি গৌতম ঘোষের তেলেঙ্গানা সংগ্রামের উপর তৈরি 'মা ভূমি'তে গান গাইলেন, অভিনয় করলেন। গান গাইলেন অন্য কয়েকটি সিনেমাতেও।

আশির দশকের শুরুতে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে কোন্ডাপল্লী সীতারামাইয়ার নেতৃত্বাধীন সিপিআইএমএল (জনযুদ্ধ)-র সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে, প্রবাসী গদর বিপ্লবীদের নাম গ্রহণ করে, প্রকাশ্য জীবন থেকে অন্তরালে চলে গেলেন। একটি দশক ধরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন, কখনও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলেন। আদুর গা, গলায় লালপাড় চাদর, সাদা খাটো ধুতি, খালি পা, এক হাতে বাঁশের লাঠিতে লাল পতাকা। গদর নেচে গেয়ে কৃষক, দলিত, জনজাতি গরিব মানুষদের বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে গেলেন। প্রান্তিক মানুষদের জীবন যন্ত্রণা তুলে ধরলেন।

১৯৯০-এ প্রকাশ্যে এসে জননাট্যমণ্ডলীর কাজকর্ম শুরু করলেন। সেইসময় গ্রে হাউণ্ড বাহিনীর প্রাণঘাতী হামলায় গুরুতর আহত হয়েও বেঁচে ফিরে আসেন। ২০০৪-এ অন্ধ্রের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর আলোচনায় তিনি, ভারভারা রাও এবং কল্যাণ রাও দূতের কাজ করেন। বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি অন্ধ্রপ্রদেশের বাইরে অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে দেন। এরপর তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, তার প্রধান উদ্দীপক সঙ্গীত রচনা করেন এবং ব্যাপক দলিত, জনজাতি, গরিব কৃষককে সমাবেশিত করেন। তিনি তেলেঙ্গানা প্রজা পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০১৪-এ পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়। সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ নিয়ে গদর ২০১৮-তে প্রথম ভোট দেন, নতুন দল গঠনের ঘোষণা করেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাকে সমর্থন করেন।

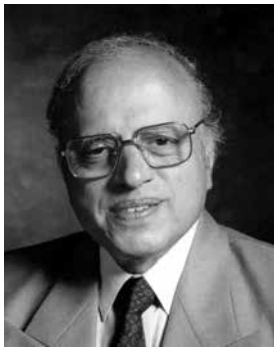

এম. এস. স্বামীনাথন

(১৯২৫-২০২৩)

শুধু ভারত নয় নোবেল বিজয়ী কৃষি বিশেষজ্ঞ (Agronomist) নর্মান বোরলাগের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সবুজ কৃষি বিপ্লবের (Green Agricultural Revolution) রূপকার। তাঁর মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার কুম্বাকোনামে অবস্থাপন্ন ভূস্বামী পরিবারে জন্ম। গান্ধীবাদী পিতা ছিলেন চিকিৎসক। বৃহৎ পরিবারের এক তৃতীয়াংশ জমি বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনে দিয়ে দেওয়া হয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কৃষি ও কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। এছাড়াও '৪৩-র বাংলার মন্বন্তর এবং দেশজুড়ে খাদ্যাভাব তাঁকে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে উৎসাহিত করে। তাই ডাক্তারি না পড়ে কেরল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণীবিদ্যা এবং কোয়েম্বাতুর কৃষি কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞানের স্নাতক হলেন। তারপর দিল্লির 'ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আই.এ.আর.আই.) থেকে সাইটোজেনেটিক্স নিয়ে স্নাতকোত্তর হন। এই সময় বাড়ির চাপে তিনি অল ইণ্ডিয়া সিভিল সার্ভিস প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হয়ে আই.পি.এস.-এ সুযোগ পান। কিন্তু তাতে না যোগ দিয়ে স্কলারশিপ নিয়ে ইউরোপে চলে যান। প্রথমে নেদারল্যাণ্ডসের ওয়াজেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়, পরে যুক্তরাজ্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেম্ব্রিজে জীবনসাথী শিক্ষাবিদ মীনা ভূতলিঙ্গমের সঙ্গে পরিচয়। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে পোস্ট ডক্টরাল করে ১৯৫৪তে ভারতে ফিরে এসে কটকের 'সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (সি.আর.আর.আই.)এর উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসাবে যোগ দেন।

সি.আর.আর.আইতে কৃষ্ণস্বামী রামাইয়ার নেতৃত্বে ভারতীয় ও জাপানি ধান চারার সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে যুক্ত ছিলেন। ওই বছরই দিল্লির আই.এ.আর.আইতে সাইটোজেনেটিস্ট পদে যোগ দেন এবং সেখানে ১৯৭২ অবধি যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ থেকে ছিলেন ডিরেক্টর পদে। সেইসময় ভারত জুড়ে কৃষি ফলনের সমস্যা ও খাদ্যাভাব চলছিল। স্বামীনাথন বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির পরিবর্তে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করার ব্রত নেন। সেই লক্ষ্যে বেশি উৎপাদনশীল ধান, গম ও আলুর প্রজাতি সৃষ্টিতে তিনি মনযোগী ছিলেন। নর্মান বোরলাগের দেওয়া মেক্সিকোর ক্ষুদ্রাকৃতি গমের চারার সঙ্গে জাপানি প্রজাতির গমের চারার সংকর করেন তিনি। গুরুদেব খুশ, দিলবাগ সিং আতোয়াল, আত্মারাম ভৈরব যোশি প্রমুখ কৃষিবিজ্ঞানীরা বেশি উৎপাদনশীল গমের চারা সৃষ্টি করলেন। তার সাথে সৃষ্টি হল আই.আর. ৩৬ সহ ৩০০ রকমের অতি উৎপাদনশীল ধানের বীজ ও চারা। এই রোগ প্রতিরোধক বেশি উৎপাদনশীল নতুন বীজ ও চারা দিয়ে চাষের ফলে সারা দেশ জুড়ে বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ফলন বৃদ্ধি হল। খাদ্যশস্য উৎপাদনের এই বিপুলবৃদ্ধির কৃষিপ্রক্রিয়াকে 'সবুজ বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হল। ১৯৭১-এ ঘোষণা করা হল ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর।

আর এই সফল সবুজ বিপ্লবের কাণ্ডারী স্বামীনাথন 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' (আই.সি.এ.আর)-এর ডিরেকটর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। ১৯৭৯-এ হলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব। ১৯৮০-তে হলেন জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ও পরে ডেপুটি চেয়ারম্যান। তারপর ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ অবধি ফিলিপাইনসের ম্যানিলার 'ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (আই.আর.আর.আই) এর ডিরেক্টর জেনারেলের পদে ছিলেন। প্রথম এশিয়ান ডি.জি. তিনি অন্যান্য দেশের খাদ্যসঙ্কট মেটাতেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার' এবং 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডে'র প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৭-তে গড়ে তোলেন এম.এস. স্বামীনাথন

রিসার্চ ফাউণ্ডেশন। পুরস্কৃত হয়েছেন পদ্মশ্রী, রমন ম্যাগাসেসে অ্যাওয়ার্ড, পদ্মভূষণ, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ, পদ্মবিভূষণ, ভারতরত্ন (মরণোত্তর) সহ বিভিন্ন সম্মাননায়। তিন বিদুষী কন্যা সৌম্যা (বিশেষজ্ঞ শিশু চিকিৎসক), মধুরা (অর্থনীতিবিদ) ও নিত্যা (শিক্ষাবিদ)-র মধ্যে সৌম্যা স্বামীনাথন যক্ষ্মা ও এইচ.আই.ভি-র উপর গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আই.সি.এম.আর.)এর ডিরেক্টর জেনারেল (২০১৫-'১৭) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (২০১৭-'১৯) ও প্রধান বিজ্ঞানী (২০১৯-) নিযুক্ত হন।

মারিও জাগালো

(১৯৩১-২০২৪)

এই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেফট উইঙ্গার এবং বিশ্ববরেণ্য ফুটবল ম্যানেজার ব্রাজিলকে খেলোয়াড় হিসাবে দু'বার বিশ্বকাপ এবং ম্যানেজার হিসাবে দু'বার বিশ্বকাপ ও একবার কোপা আমেরিকা উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৫৮-এ সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে তাঁর ফুটবল নৈপুণ্য নজর কেড়েছিল। খেলতেন লেফট উইঙ্গারে, প্রয়োজনে কাট করে লেফট ইনসাইড ফরোয়ার্ডের জায়গা নিতেন। নিচে নেমে ডিফেন্স করতেন, আবার দ্রুত উইং দিয়ে বল নিয়ে ছুটে যেতেন, গোলও করতেন। ফাইনালে ব্রাজিল ৫-২ গোলে সুইডেনকে হারায়, চতুর্থ গোলটি তাঁর। ১৯৬২-তে চিলিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিল ৩-১ গোলে পরাজিত করে চেকোশ্লোভাকিয়াকে। সেই দলে ছিলেন জাগালো। তাঁকে সতীর্থরা আদর করে ছোট্ট পিঁপড়ে নামে ডাকত। ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় ও ১৯৯৪-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ে এবং ১৯৯৭-তে বলিভিয়ায় ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা জয়ের নেপথ্যে তাঁর ম্যানেজার হিসাবে দক্ষতা অনস্বীকার্য।

এছাড়াও তিনি ব্রাজিলকে ১৯৯৮ সাল ফ্রান্স বিশ্বকাপে রানার্স, ১৯৯৫-উরুগুয়ের কোপা আমেরিকায় রানার্স, ১৯৯৬-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কনকাকাফ কাপে রানার্স এবং ১৯৯৭-সৌদি আরবের ফিফা কনফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন করেন। তাই সম্ভ্রম করে তাঁকে বলা হত প্রফেসর। সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্রাজিলের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। ক্লাব ফুটবলে প্রথমে আমেরিকা (১৯৪৮-'৪৯), তারপর ফ্ল্যামিঙ্গো (১৯৫০-'৫৮) এবং বোতাফোগো (১৯৫৮-'৬৫)-তে খেলেন। ক্লাব ফুটবলে ৩৫০-র মত ম্যাচে ৮০-র কাছাকাছি গোল। ব্রাজিলের জার্সিতে ৩৩ ম্যাচে পাঁচ গোল।

ফ্রানৎজ বেকেনবাউয়ার

(১৯৪৫-২০২৪)

পশ্চিম জার্মানি (ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি) দলের মধ্যমণি হয়ে লম্বা ছিপছিপে সুদর্শন এক মাথা চুল এক তরুণ বিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের পা থেকে কড়া অথচ পরিচ্ছন্ন ট্যাকল করে দ্রুত বল তুলে নিচ্ছেন। দ্রুততার সঙ্গে তৈরি করছেন অসামান্য সব প্রতি আক্রমণ। সারা মাঠ জুড়ে অক্লান্তভাবে খেলছেন, ডিফেন্স চেরা পাশ বাড়াচ্ছেন, প্রয়োজনে গোল করে আসছেন। তিনি আর কেউ নন বায়ার্ন মিউনিখ ও পশ্চিম জার্মানি দলের লিবেরো বা সুইপার পজিশনে খেলা সহখেলোয়াড় ও সমর্থকদের প্রিয় 'ডের কাইজার'। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির এক ডাক কর্মীর দ্বিতীয় সন্তান বাবার অমতে ফুটবল খেলতেন, বাবাকে লুকিয়েই এস.সি. মিউনিখের জুনিয়র দলে নাম লেখান। ১৯৫৯-তে বায়ার্ন মিউনিখের যুব দলে, ১৯৬৪-তে সিনিয়র দলে প্রথমে সেন্টার ফরোয়ার্ড, তারপর মিডফিল্ডার, তারপর ডিফেন্ডারে খেলেন। দলকে প্রথম ডিভিশনে তোলেন। ১৯৬৮-এ বুন্দেশলিগায় চ্যাম্পিয়ন করেন। তাঁর অধিনায়কত্বে বায়ার্ন ৭৪-৭৬ পরপর তিনবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৬৫-তে জাতীয় দলে ডাক। ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের কাছে পশ্চিম জার্মানি ৪-২ গোলে হারলেও ববি চার্লটনকে ভালোভাবে মার্কিং করেন। করেন চারটি গোল। সেরা তরুণ ফুটবলার হন।

১৯৬৬, '৭০ ও '৭৪ তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন। তিনটিতেই বিশ্ব অলষ্টার দলে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ থেকে পশ্চিম জার্মানির অধিনায়ক। ১৯৭২-এ দেশকে ইউরোপ চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯৭৪এ ম্যানেজার রেনাস মিশেল ও অধিনায়ক জোহান ক্রুয়েফের বিখ্যাত হল্যাণ্ড দলকে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারিয়ে দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেন। ১৯৭২ ও '৭৬এ পান বালঁ দ্য ট্রফি। ১৯৭৭-এ জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়ে নিউইয়র্ক কসমসে খেলতে যান। ১৯৭৭-'৮০ ও '৮৩তে খেলেন। ১৯৮১-'৮২তে খেলেন জার্মানির হামবার্গার এস. ভি.তে, ১৯৮৪-তে জার্মানির জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮৬ মেক্সিকো বিশ্বকাপে জার্মানিকে ফাইনালে তোলেন এবং ১৯৯০-তে ইতালি বিশ্বকাপে দেশকে চ্যাম্পিয়ান করেন। এরপর তিনি ক্লাব ম্যানেজারের দায়িত্ব নেন প্রথমে মার্সাই, তারপর বায়ার্ন। বায়ার্নকে ১৯৯৪-এ বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ান ও ১৯৯৬-এ উয়েফা চ্যাম্পিয়ান করান। তিনি ১৯৯৪ থেকে ২০০৯ অবধি বায়ার্নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারপর জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের ও ফিফার দায়িত্বে আসেন। বায়ার্নের হয়ে ৫৮২ ম্যাচে ৭৪ গোল এবং দেশের হয়ে ১০৩ ম্যাচে ১৪ গোল করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে অকালমৃত স্তিফেন ফুটবলার ছিলেন। স্তিফেনের পুত্র লুকাও ফুটবলার হয়েছেন।

ববি চার্লটন

(১৯৩৭-২০২৩)

সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। খেলতেন ইনসাইড ফরোয়ার্ড ও মিডফিল্ডার পজিশনে। প্রচণ্ড স্কিল, স্ট্যামিনা ও ফিটনেশের সাথে তিনি দু'পায়ের দুরপাল্লার শ্যুটিং, পাশিং ও বিপক্ষের ডিফেন্সে আক্রমণ হানার ক্ষমতা রাখতেন। ম্যাট বুশবি ও অন্যান্যদের তত্ত্বাবধানে ১৯৫৩-'৫৬ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড (এম.ইউ.) জুনিয়র দলে এবং '৫৬-'৭৩ অবধি এম. ইউ.-র সিনিয়র দলে খেলেন। দলকে এফ.এ. কাপ ('৬৩), ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ('৬৫, '৬৭) ও উয়েফা ইউরো কাপ ('৬৮) উপহার দেন। শেষদিকে এম.ইউ.তে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দুই কিংবদন্তী ফুটবলার—ডেনিশ 'ল ও জর্জ বেষ্ট। ১৯৭৪-'৮০ অবধি অন্যান্য ক্লাবের হয়ে খেলেন। ক্লাব ফুটবলে ৬৫২ ম্যাচে ২১১টি গোল। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলের জার্সিতে ১০৬ ম্যাচে ৪৯ গোল। ১৯৬২, '৬৬ ও '৭০ সালে ফিফা বিশ্বকাপ খেলেন। ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত '৬৬-র বিশ্বকাপে অ্যালফ র‍্যামসের কোচিংএ গর্ডন ব্যাঙ্কস, ববি মুর, বড়দা জ্যাকি চার্লটন, অ্যালেন বেল, জিওফ হার্স্ট প্রমুখ তারকা ফুটবলারদের নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে একমাত্র বিশ্বকাপটি উপহার দেন। ১৯৬৬তেই পান বালঁ দ্য। ১৯৭৪-'৮৪তে বিভিন্ন ক্লাবের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। স্যার উপাধি সহ বিভিন্ন উপাধি পান। দাদা জ্যাকি চার্লটন (১৯৩৫-২০২০) যিনি একসময় খনি শ্রমিক ছিলেন পরে পুলিশে চাকরি নেন, ছিলেন দুর্ধর্ষ ডিফেন্ডার। ১৯৫০-'৭৩ অবধি লিডস্ ইউনাইটেডে খেলে ক্লাবকে দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন করে ('৬৩-'৬৪) প্রথম ডিভিশনে তুলে প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়ান করান ('৬৭-৬৮) এবং এফ. এ. কাপ বিজয়ী হন। তিনি ইংল্যাণ্ডের হয়ে ১৯৬৬ ও '৭০ বিশ্বকাপে খেলেছিলেন।

বিষেণ সিং বেদী

(১৯৪৬-২০২৩)

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তার আগে ও সমসময়ে জিম লেকার, রিচি বেনো, সুভাষ গুপ্তে, সোনি রামাধীন, ল্যান্স গিবস, ডেরেক আণ্ডারউড প্রমুখ বিখ্যাত স্পিনাররা এসেছেন কিন্তু ১৯৬০-র দশকের শেষ থেকে ভারত যে অসাধারণ স্পিনার চতুষ্টয়, বিষেণ সিং বেদী, ভগবৎ চন্দ্রশেখর, এরাপল্লী প্রসন্ন ও শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাঘবনদের খেলাতে শুরু করল তার কোন তুলনা হয় না। দেশে বিদেশে তাঁদের কৃতিত্বে ভারত বেশ কিছু টেষ্ট ম্যাচ জিতেছিল। এই স্পিন চতুষ্টয়ের অন্যতম বেদী সামান্য তিন চার পদক্ষেপে বাঁ হাতে ছন্দময় ভঙ্গিতে যে বল করতেন তাতে যেমন ছিল ফ্লাইট, তেমন নিখুঁত লেন্থ, ঘূর্ণিময় বড় টার্ন। এর সঙ্গে বিষাক্ত আর্মার। আবিশ্বের নামী দামী ব্যাটসম্যানরা তাতে ঠকে যেতেন। অমৃতসরে জন্ম তাঁর, উত্তর পাঞ্জাবের হয়ে রঞ্জি খেলতেন। পরে দিল্লিতে চলে এসে দিল্লির হয়ে খেলতেন। ভারতের হয়ে ১৯৬৬ থেকে '৭৯ অবধি টেস্ট খেলে ৬৭টি ম্যাচে ২৬৬ উইকেট তুলে নিয়েছেন। গড় ছিল ২৯.৩৯। মনসুর আলি খাঁন পতৌদির পর ১৯৭৬-এ ভারতের অধিনায়ক হন। ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতেন নরদাম্পটনশায়ারের হয়ে।

মহম্মদ হাবিব

(১৯৪৯-২০২৩)

মাঠের বাইরে আপাত শান্ত, ছোট খাটো, রোগা পাতলা 'বড়ে মিঁয়া' যে মাঠে নামলেই এক তেজী হার না মানা যোদ্ধায় পরিণত হয়ে যেতেন, সাক্ষী ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকের ভারতীয় ও কলকাতা ময়দানের ফুটবল। হাবিবের অগ্রজ আজম ও মঈন হায়দ্রাবাদের ফুটবলার ছিলেন। কনিষ্ঠ মহম্মদ আকবর ১৯৭১ থেকে দীর্ঘদিন কলকাতা ময়দানের বড় দলগুলিতে খেলেছেন। হাবিব প্রথমে হায়দ্রাবাদ টেলিফোনসে খেলতেন। তারপর জ্যোতিষ গুহর রিক্রুটাররা তাঁকে ১৯৬৬-তে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নিয়ে আসে। তিনি বিভিন্ন পর্বে ইস্টবেঙ্গলে নয় বছর, মোহনবাগানে ছয় বছর এবং মহামেডান স্পোটিং এ দু'বছর, মোট ১৭ বছর কলকাতা ময়দানে দাপটের সঙ্গে খেলেন। ক্লাব ফুটবলে ৫০টি ট্রফি জয়। যার মধ্যে ১৯৭২ ও ১৯৭৭-এ ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ক্রিমুকুট।

সন্তোষ ট্রফিতে বাংলাকে চারবার চ্যাম্পিয়ান করেছেন (১৯৬৯, '৭১, '৭২ ও '৭৫)। করেছেন ৩৪টি গোল। বাংলার হয়ে ৩৩, হায়দ্রাবাদের হয়ে এক। ভারতের হয়ে ৩৩ ম্যাচে ১১ গোল। ১৯৭০-এর এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জয়, একই বছর মারডেকা ট্রফিতে তৃতীয় এবং ১৯৭১-এ পেস্তা সুকান কাপে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন। অনেক অবিস্মরণীয় ম্যাচ খেলেছেন। তার মধ্যে ১৯৬৯-এর সন্তোষ ট্রফিতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল এবং ১৯৭৭-এ নিউ ইয়র্ক কসমসের বিরুদ্ধে ম্যাচ অন্যতম। অসম্ভব পরিশ্রমী সুশৃঙ্খল ও নিষ্ঠাবান ছিলেন ফুটবলের প্রতি। একদিনও অনুশীলন বাদ দিতেন না। সম্পূর্ণ পেশাদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কোন চাকরি করেন নি। ভারত বিখ্যাত কোচ পি.কে. ব্যানার্জীর প্রধান অস্ত্র ছিলেন। খেলতেন উইথড্রয়াল ফরোয়ার্ড পজিশনে। নিজে গোল করার চাইতে বেশি গোল করাতেন। অসম্ভব স্ট্যামিনা ছিল। সারা মাঠ জুড়ে খেলতেন। প্রয়োজনে ডিফেন্স করতেন। আবার আক্রমণে নেতৃত্ব দিতেন।

উস্তাদ রশিদ খাঁন

(১৯৬৮-২০২৪)

নক্ষত্রের আকস্মিক পতন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমসাময়িক সবচাইতে বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন ওস্তাদ রশিদ, তাঁর সুকণ্ঠ, তান, লয়কারি, সরগম, বিলম্বিত খেয়াল, তারানার সুসমন্বিত পরিবেশনে। গোয়ালিয়র ঘরানার সঙ্গে সংপৃক্ত রামপুর-সহসওয়ান ঘরানার কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। ওই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ইনায়েত হোসেন খানের প্রপৌত্র ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বদায়ুঁনের সহসওয়ানে জন্ম। বাল্যে ও কৈশোরে মাতুল বিশিষ্ট শিল্পী উস্তাদ গোলাম মুস্তাফা খাঁন ও উস্তাদ নিসার হোসেন খাঁনের কাছে কঠোরভাবে তালিম নেন। ১৯৮০-তে উস্তাদ নিসারের সঙ্গে কলকাতার আই.টি.সি. সঙ্গীত আকাদেমিতে চলে আসেন। উস্তাদ নিসার শিক্ষক ও তিনি ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। তারপর কলকাতাকে ভালোবেসে এখানেই থেকে যান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ছাত্রী জয়িতা (সোমা) বসুকে বিবাহ করেন।

উস্তাদ আমির খাঁন এবং পণ্ডিত ভীমসেন যোশি রশিদের গায়কিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি আধুনিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে ছোট ছোট শ্রুতিমধুর বন্দিশ উপহার দিচ্ছিলেন। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, বিদেশি বাদ্যযন্ত্র, সুফি সঙ্গীত প্রভৃতির সঙ্গে যুগলবন্দীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতও গেয়েছিলেন। হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রের বহু জনপ্রিয় গান গেয়েছেন। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রভৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। অনেকদিন ধরে তাঁর প্রস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসা চলছিল। রেখে গেলেন তাঁর যাবতীয় রেকর্ডেড সৃষ্টি, দুই কন্যা ও গায়ক পুত্র আরমান খাঁনকে।

ডা: রণবীর মুখোপাধ্যায়

(১৯২৮-২০২৩)

বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ, সমাজসেবী এবং কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রণবীর মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় ছাত্র আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স করপস' (আই. এন.এ.সি.)-এর স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নোয়াখালি থেকে কলকাতা দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় আর্তের সেবায় ছুটে বেড়িয়েছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে বয় স্কাউট আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। প্রাক্তন বিপ্লবীদের নিয়ে 'বিপ্লবী নিকেতন' গড়ে তুলেছিলেন এবং তার সভাপতি ছিলেন। সারাজীবন মানুষের হয়ে কাজ করে গেছেন।

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষদের সুলভে উন্নত চোখের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ১৯৮০-তে কলকাতার পার্ক সার্কাসে গড়ে তোলেন 'আই কেয়ার অ্যাণ্ড মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার।' এছাড়াও তিনি বিবিধ গঠনমূলক কাজ ও অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ, ডি. এন. দে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্ত ছিলেন বহু গবেষণাপত্রের সঙ্গে। তাঁর অমায়িক উদ্দীপক ব্যবহার উৎসাহ জোগাতো। তিনি 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

শ্রীলা মজুমদার

(১৯৫৮-২০২৩)

কেবলমাত্র অভিনয় দিয়ে চলচ্চিত্র জগতের প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙ্গে এক সময় সমান্তরাল সিনেমার মুখ্য নারী চরিত্র হয়ে ওঠেন। মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, শ্যাম বেনেগাল, প্রকাশ ঝা, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যশস্বী পরিচালকদের চলচ্চিত্রে একের পর এক অভিনয় করে গেছেন। ব্যস্ত সময়ে নিয়মিত কলকাতা-মুম্বাই করেছেন। ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রে ঐশ্বর্য রাইয়ের কণ্ঠ তাঁর কণ্ঠে ডাবিং করেন।

বঙ্গবাসী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী শ্রীলা মঞ্চ অভিনয় থেকে চলচ্চিত্রে আসেন। 'পরশুরাম', 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে', 'খণ্ডহর', 'আরোহণ', 'মাণ্ডি', 'দামুল', 'চপার', 'খারিজ', 'চোখ', 'নাগমতী', 'এক পল', 'ভালোবাসার বাড়ি' প্রভৃতি ৩২টি চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে ভুগছিলেন। রেখে গেলেন সাংবাদিক স্বামী এস. এন.এম. আবদি এবং পুত্র সোহেল আবদিকে।

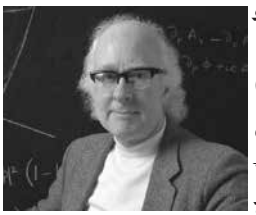

পিটার হিগস

(১৯২৯-২০২৪)

এই প্রচার বিমুখ বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক আরও অনেক বিজ্ঞানীর মত মহাবিশ্বের এক মৌলিক বিষয়ের উপর গবেষণা করছিলেন। এই জগৎ পারাবারে প্রতিটি বস্তুর ভর (Mass) কে জোগাচ্ছে? ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই বিষয়ে এক ধারণা দিলেন (Higgs Mechanism)। আলোকপাত করলেন এক ক্ষুদ্র কণার বিষয়ে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং তাঁর নামে এই মহাবিশ্বকে ভর জোগানো ক্ষুদ্র কণাগুলির নাম হল Higgs Bosan। 'ইওরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ' (CERN) জেনিভার কাছে

ফ্রান্স ও সুইৎজারল্যাণ্ডের সীমানার কাছে মাটির নিচে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে আলোর গতিতে ধাবমান বিপরীতমুখী প্রোটন কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে এই কণার অস্তিত্বের চিহ্ন পেলেন। পাঁচ দশক ধরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করা অধ্যাপক হিগস বেলজিয়াম-এর পদার্থবিদ ফ্রঁসোয়া এনগ্লেয়ার্ট-এর সঙ্গে ২০১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে হিগস ফিল্ড, স্পনটেনেয়স সিমিট্রি ব্রেকিং উল্লেখযোগ্য। পেয়েছেন হিউজেস মেডেল, রাদার ফোর্ড মেডেল, ডিরাক মেডেল ও পুরস্কার, সাকুরাই পুরস্কার সহ বহু সম্মাননা।

ড্যানিয়েল কাহ্নামান

(১৯৩৪-২০২৪)

বিরল শ্রেণীর গবেষক যিনি মনস্তত্ত্ববিদ হয়ে অর্থশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ২০০২-তে। একটা সময় সাথী এমোস টভারস্কি, পরবর্তিতে নিজে আনন্দবাদী মনস্তত্ত্ব (Hedonism), সিদ্ধান্ত গ্রহণের মনস্তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ধারণাগত পক্ষপাত, ব্যবহারিক অর্থনীতি, সম্ভাবনার তত্ত্ব, ক্ষতি এড়ানোর পন্থা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন আর চমকপ্রদ সব ধারণা উঠে এসেছে। সেগুলি হয়তো প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বের নিরিখে অযৌক্তিক, কিন্তু মানুষ এভাবেই দেখে বিচার করে ও সিদ্ধান্ত নেয়। বিহেভিয়েরাল ইকনমিকস থেকে হোমো ইকনমিকস তাঁর যুক্তিজালে সমৃদ্ধ হয়েছে, মনস্তত্ত্বের সঙ্গে অর্থনীতির সংশ্লেষ ঘটেছে। 'থিঙ্কিং, ফাস্ট অ্যান্ড স্লো', 'টু সিস্টেম থিওরি' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। এই ইজরায়েলি—আমেরিকান গবেষক অনেক সম্মাননা পেয়েছেন।

সিজার লুইস মেনোত্তি

(১৯৩৮-২০২৪)

আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত ১৯৭৮-র বিশ্বকাপ ফুটবলে দেখা যেত মাঠের পাশে শান্ত হয়ে বসে আছেন এক সোনালি চুলের ছিপছিপে প্রৌঢ় যুবক। তিনি আর কেউ নন, আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের কোচ মেনোত্তি। আর তাঁর প্রশিক্ষিত ফিলোল, পাসারেল্লা, তারানতিনি, আরডিলিস, লুকে, কেম্পেস, বার্তোনি প্রমুখ এগারজন টাট্টু ঘোড়া জাতীয় দলের নীল সাদা জার্সি গায়ে মাঠ তোলপাড় করছে। ওইবারই শক্তিশালী নেদারল্যান্ডসকে ফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনা প্রথম বিশ্বকাপ জেতে। পরের বছরেই জাপানে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপে মেনোত্তির কোচিং-এ মারাদোনা, দিয়াজরা দুর্ধর্ষ খেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত মেনোত্তি জয়-পরাজয়ের চাইতে সুন্দর ফুটবলের উপর জোর দিতেন।

নিজে ছিলেন স্ট্রাইকার। ১৯৬০-'৬৮ আন্তর্জাতিক ক্লাব ফুটবলে রোজারিও সেন্ট্রাল, রেসিং ক্লাব, বোকা জুনিয়র, নিউইয়র্ক জেনারেলস, স্যান্টোস ও জুভেন্টাসের মত নামী দলে খেলেছেন। খেলেছেন পেলের সাথে। জাতীয় দলের হয়ে ১১টি ম্যাচ খেলে দুটি গোল করেন। ১৯৭০ থেকে ৩৭ বছরের কোচিং জীবনে ১১টি ক্লাব এবং আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো জাতীয় দলের কোচিং করিয়েছেন। উপদেষ্টা হিসাবে আমৃত্যু ফুটবলের সাথে জড়িত ছিলেন।

[সংকলন: অরণি সেন]

- ইউক্রেন, গাজা, লেবানন, সিরিয়া, ইরান-ইজরায়েল, ইয়েমেন, সুদান, নাইজেরিয়া, মায়ানমার, মণিপুর সমস্ত যুদ্ধ, ধ্বংস, গণহত্যা, গণদূষণ বন্ধ হোক। উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, চীন-তাইওয়ান, চীন-ভারত যুদ্ধ উত্তেজনা বন্ধ হোক
- খাগরাগড়-দত্তপুকুর একের পর এক অবৈধ বোমা ও বাজি কারখানার বিস্ফোরণে দোষীদের শাস্তি হোক
- শিক্ষা, নিয়োগ, স্বাস্থ্য, রেশন, চিটফাণ্ড, কয়লা, বালি, গরুপাচার দুর্নীতিগুলিতে দোষীদের শাস্তি হোক
- ভারতের সাথে চীন, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, বাংলাদেশ, কানাডা প্রভৃতি দেশের সম্পর্কের উন্নতি হোক
- সিকিম, উত্তরকাশী প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের প্রতিকার চাই
- মরক্কো, আফগানিস্তানের ভয়াল ভূমিকম্পে দুর্গতদের প্রতি সহমর্মিতা
- সন্দেশখালির সংগ্রামী দলিত ও জনজাতি মহিলাদের; লাদাখের পরিবেশ ও স্বায়ত্বশাসন নিয়ে আন্দোলনকারীদের, শস্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলনকারী কৃষকদের প্রতি সহমর্মিতা
- সর্বভারতীয় নেট, নিট প্রভৃতি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসে দোষীদের শাস্তি চাই
- উপর্যুপরি রেল দুর্ঘটনায় ভারতীয় রেলকে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- বিতর্কিত তিনটি দণ্ড সংহিতা (BNS,BNSS, BSA) বাতিল করতে হবে
- নোবেল বিজয়িনী নার্গিস মহম্মদি সহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে
- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে বলপ্রয়োগে হকার উচ্ছেদ করা যাবে না
- রাজ্য জুড়ে তোলাবাজি, গুণ্ডামি, গণপিটুনি, হিংসা, সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে

বিশেষ স্মরণিকা

মাস্টারমশাই

শ্রী সনৎ রায়চৌধুরি (২০.০৯.১৯৩৯—০১.০৭.২০২৩)

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘদেহী। পরনে পাজামা বা ঢোলা প্যান্ট আর সরল একটি জামা। আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন মাস্টার মশাইকে এমন দেখেছি। এতটাই আলাপি প্রথম দর্শনেই অনেক কথা। চা খাওয়া। বললেন, 'একদিন এসো। অনেক গল্প করব।' গেলাম একদিন। পড়াচ্ছেন। ইতস্তত দু-চারটি ছেলে বসে অঙ্ক কষছে। উনিও একটা চৌকিতে বসে অংক কষে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে বসতে বললেন। বসলাম। লাল সিমেন্টের মেঝে। ঠান্ডা। প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া অনুভূতি। ভাইঝি গানের শিক্ষিকা। কাকা অন্ত প্রাণ। চা নিয়ে এলেন। খেতে খেতে গল্প শুরু হলো। দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতে এই নম্র, উদার মানুষটিকে বড্ড ভালো লেগে গেল।

২১ ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। আমরা ভাষা আন্দোলনের কথা পড়েছি। আমার পুত্র অংক কষতে যেত মাস্টারমশাই এর কাছে। তার কথায়, 'সবাই ছোটবেলা থেকে বড় হয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পড়ে। আমার নিজেকে প্রচন্ড ভাগ্যবান মনে হয় এটা ভেবে যে আমি বড় হয়েছি ভাষা আন্দোলনের এক বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়ে। তাঁর কাছে সেই আন্দোলনের গল্প শুনেছি। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। আমাদের বাড়িতে বসে সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি।'

রংপুর। রংপুর ভাষা আন্দোলনের সামনের সারির মুখ ছিলেন তিনি। এই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে থেকেই মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশুনো। অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান।

তত্ত্ব অপেক্ষা প্রয়োগেই ছিল 'মাস্টারমশাই' সনৎ রায়চৌধুরির টান। সাধারণ অতি সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে ভালোবাসতেন। অসংখ্য মানুষ তার সান্নিধ্যে এসে জীবনের দিশা খুঁজে পেয়েছেন। এই মানুষটিকে দেশ ছাড়তে হলো ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে। পিছনে পড়ে রইল সাধের জন্মভূমি। কিশোর বয়সের ক্রীড়াভূমি। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর।

রংপুর থেকে শিলিগুড়ি। অন্য পরিবেশ। অন্য দেশও বটে। একরাশ স্বপ্ন চোখে নিয়ে দেশ বদল করেছিলেন সনৎ রায়চৌধুরি। এপারে এসে খুঁজে পেলেন তার আকাঙ্ক্ষিত কাজ। ছেলে পড়ানো। 'ফাঁসি দেওয়া' স্কুলে শিক্ষক জীবনের শুরু। বছর দেড়েক সেখানে ছিলেন। বলা যায় মাস্টার মশাই হয়ে ওঠার সলতে পাকানো শুরু হলো শিলিগুড়িতে। এরপর ১৯৬১ সালে চলে এলেন চুঁচুড়ায়। এখানে তিনি অতিবাহিত করেছেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

১৯৬১ সাল। চুঁচুড়া শহর। ঐতিহাসিক এই শহরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মহসিন কলেজ, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, ডাফ স্কুল, আরো অনেক। চারিদিকে ঐতিহাসিক স্মারক। ইমামবাড়া, কাছেই ব্যান্ডেল চার্চ। গঙ্গার ধারে গড়ে ওঠা এই শহরে এসে সনৎ রায়চৌধুরি সম্ভবত জীবনটাকে নতুন খাতে এনে ফেললেন। সেই সময়ে 'দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাই স্কুল'-এ শিক্ষকতার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ শুরু করেন। চুঁচুড়া থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত পার্টি সংগঠনের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অবশেষে স্থায়ী হলেন 'সুগন্ধ্যা হাইস্কুল'-এ। এখান থেকেই ১৯৯৯ সালে অবসর গ্রহণ।

রংপুর থেকে শিলিগুড়ি হয়ে চুঁচুড়া আসার পথে ব্যতিক্রমী ঘটনা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকা, বর্তমান বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সদস্যপদ গ্রহণ, শিক্ষকতা সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করা। এই পথ পরিক্রমা অনুযায়ী নিবন্ধটির নাম 'মাস্টারমশাই' দেওয়া যায় না। প্রকৃত অর্থে 'মাস্টারমশাই' হয়ে উঠেছেন এরপর।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ৬০-৭০ দশক এক উত্তাল সময়। সমাজের চরিত্র বদলাচ্ছে। প্রভাব পড়ছে পরিবারের ওপর। যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। নতুন চিন্তা, চিন্তন প্রক্রিয়া, যুব সমাজকে আবেশিত করছে। এর মধ্যে ১৯৬২ সালে যখন কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত, সেই সময় তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হন। পরিণত সনৎ রায়চৌধুরী নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সি পি আই (এম. এল) এর সঙ্গে যুক্ত হন। সংগঠনের কাজে একাগ্র সনৎ রায়চৌধুরী ১৯৭০ সালের ২১ অক্টোবর আবার কারারুদ্ধ হন। মুক্ত হন ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে। হুগলি জেলে বন্দি থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর মনন চর্চা ব্যতিক্রমী। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেক মানুষ। উদারমনা এই মানুষটির ব্যবহার, পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা, ক্রমশ তাঁকে মানুষের প্রিয় করে তুলেছে। এরপর থেকে আরম্ভ করেন বাড়িতে পড়ানো। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় সব সময় অকৃতদার এই মাস্টারমশায়ের বাড়ি সরগরম করে রাখতো। যৎকিঞ্চিৎ ফি। তাও কে ফি দিচ্ছে, কে দিচ্ছে না, তাঁর কাছে সেসব ধর্তব্যের বিষয় ছিল না। আর্থিক অসুবিধের মধ্যে থাকা বা অন্য কোন অসুবিধার মধ্যে থাকা ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে যত্ন করে পড়াতেন তিনি। তাদের দিকে থাকত তাঁর কঠিন নজর। চুঁচুড়া শহরের তো বটেই, আশেপাশের এক বিরাট অঞ্চলের দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কের ভিত মজবুত করার জন্য ভরসা ছিলেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যায় করলে ক্ষমা করার অদ্ভুত শক্তি ছিল

তাঁর। যা এ যুগে দুর্লভ। তাঁর এই গুণ বহু বিপথে চলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে।

একটা ঘটনার কথা বলি। সাল তারিখের কথায় না গিয়েই বলি। স্কুটার চড়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে থেমে সম্ভবত কারো সঙ্গে কথা বলছিলেন। 'কি খবর বলো' - বলে সকলের খবরাখবর নেওয়া ছিল তাঁর বরাবরের স্বভাব। একটি গাড়ি তাঁর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি থাকা লোকজন হৈ হৈ ছুটে এসে গাড়ির ড্রাইভারকে ধরল। মাস্টারমশাই হাসপাতালে ভর্তি হলেন। সর্বত্র বিরাজমান তাঁর ছাত্র ছাত্রীরা। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিখ্যাত ডাক্তার হয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছেন। ক্ষতবিক্ষত পা নিয়েও হাসপাতালে যাওয়ার আগে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে যেন দোষারোপ করা না হয়। 'সে ইচ্ছে করে এমনটি করেনি।' এই ছিল তাঁর যুক্তি। অতএব, ড্রাইভারের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, এই ছিল তাঁর প্রথম চিন্তা। পরবর্তী সময়ে যদিও এই পায়ের চিকিৎসার কারণে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। অনেক চেষ্টার পর তাঁর পাটিকে বাঁচানো গিয়েছিল। বাকী জীবন পায়ের এই অসুবিধা নিয়ে কাটালেও কখনো এর জন্য কারো কাছে কোনো কথা বলা পছন্দ করতেন না। একবারের জন্যও দোষ দিতেন না সেই গাড়িচালকের। এই মননের অধিকারী ছিলেন প্রকৃত মাস্টারমশাই।

অনেক গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আজীবন। শ্রমজীবী হাসপাতাল গড়ে তোলা, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, বন্দিমুক্তি, গণদাবি কমিটি, ইণ্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট প্রমুখ সংগঠনের অভিভাবকের ভূমিকায় দেখা যেত তাঁকে। সব ছাপিয়ে তিনি ছাত্রদের পক্ষে, ছোটদের পক্ষে, মানব দরদী শিক্ষক। যেকোনো গণসংগঠনের মিছিলে তিনি থাকতেন পুরো ভাগে। যখন কোন ছাত্র ভালো ফল করতো বা কর্মজীবনে সাফল্য পেত, এই মানুষটির চোখে অনাবিল আনন্দে ভরে যেত। তাঁর ঘর ছিল সবার জন্য অবারিত দ্বার। ছাত্ররা অংক কষছে, আটকে গেলে তিনি কষে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ছিলেন 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

এহেন মানুষটিকে সযত্নে আগলে রাখতেন তাঁর ভাইঝি রীতা রায়চৌধুরি। তিনি সংগীত শিক্ষিকা। রীতাদির কাছ থেকে স্যারের গল্প শোনা আমাদের পরিবারে ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এমন বড় মনের মানুষ বর্তমান সময়ে দুর্লভ। আর একজন মানুষ ছিলেন যিনি সনৎ রায়চৌধুরিকে সুস্থ করে তুলেছিলেন সেবা করে, তিনি অসীম অধিকারী। যাঁর কাছ থেকেও অনেক কথা শুনেছি। রাত্রিবেলা নৈহাটি কলেজে পড়া, সংগঠনের কাজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া, সবটাতেই অনেকটা জায়গা জুড়ে অসীমবাবু ছিলেন পাশাপাশি। তাই মাস্টার মশায়ের জীবনাবসানের পর তাঁর মুখে শুনলাম, 'দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হলাম।'

চলে গেলেন। ১ জুলাই ২০২৩। সামান্য কয়েকদিন ভুগেছেন যকৃতের কর্কট রোগে। রংপুরে যে মানুষটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, ঘাত প্রতিঘাতের পর্ব শেষ করে ছাত্রদরদী এই মানুষটি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীর মনের মণিকোঠায় মাস্টারমশাই অনেকদিন পর্যন্ত অমলিন থেকে যাবেন। দিশা দেখাবেন।

শ্রী অভিজিৎ সেন

(০১.০১.১৯৮১—৩১.১০.২০২৩)

'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন' পত্রিকার সক্রিয় কর্মী, পরোপকারী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারী শ্রী অভিজিৎ সেনের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ।—স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন পরিবার

বিজ্ঞান প্রচারে প্রতি মুহূর্তে যাঁকে স্মরণ করি...

শ্রী সমর বাগচী (১৯৩৩-২০২৩)

চন্দন সুরভি দাস

সালটা ২০০৬। সবে আলাপ বছর খানেক। ভয়ে ভয়ে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলাম। তখন থাকতেন টালিগঞ্জের ভবানী সিনেমার উল্টোদিকের গলিতে। চলে গেলাম একটি অগোছালো বইএর ম্যানিসক্রিপট নিয়ে। মুখবন্ধ লিখে দিতে হবে এই আবেদনে। লিখে তো দেবেন না, কিছু হয়নি বলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন এই ভাবনায় ভয়ে ভয়ে হাজির হলাম কোনো এক সন্ধ্যায়। না তেমন কিছু হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেললেন বেশ খানিকটা। প্রাণ খুলে বললেন অনেক কথা। যেন কত দিনের পরিচয়, ভরসা দিলেন প্রচুর, সঙ্গে এক গাদা বই-র নাম। তখন প্রায় কোনো বই আমার পড়া নয়। একটুও না বকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে বললেন সাত দিন পর একবার ফোন কোরো। তখন বলবো কবে আসতে হবে। সাত দিনের মাথায় ফোন করলাম। বললেন তুমি ফোন নম্বর দিয়ে যাওনি, লেখাটা হয়ে গেছে নিয়ে যেও। এখানেই শেষ নয়। আরও মজার ঘটনাটা এখনও বাকি।

বইটির নাম ছিল গ্লোবাল ওয়ার্মিং। কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান করবো যাদবপুরের কোনো এক জায়গায়। বিনে পয়সার ঘর বলতে যাদবপুর বাজারের দোতলার ব্যবসায়ী সমিতির ছোট্ট অফিসঘর। জনা ২০ বসতে পারবে। কে উদ্বোধন করবে অনেক ভেবে দেখলাম তিনি নিশ্চয় আসবেন না। তাই আশুতোষ কলেজের আমার বিষয়ের অধ্যাপক শুধাংশু কোলে স্যরকে বললাম। তবে নতুন বই হাতে দিয়ে আসবো বলে ফোন না করে টালিগঞ্জের বাড়িতে হাজির হলাম। বই দিয়ে বললাম যাদবপুরে একদিন বইর প্রকাশ অনুষ্ঠানে জড়ো হবো কয়েকজন। নিমন্ত্রণ বলতে ওইটুকুই।

নির্দিষ্ট দিনে কোলে স্যারকে নিয়ে বন্ধুবান্ধবসহ হাজির হলাম সমিতির ঘরে। ঘরে ঢুকেই দেখি লোকজন তেমন নেই, কিন্তু বসে আছেন স্যর সমর বাগচী। ঠিকানা তো সেভাবে দেইনি। কিভাবে এলেন? একদম ডট পাঁচ টায়। শুধু বই উদ্বোধন নয় প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে অনর্গল বক্তৃতা।

এই হলো সমর বাগচী। তারপর প্রায় ২৩ বছর দেখা হয়েছে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক আন্দোলনের নানান অনুষ্ঠানে। বাড়িতে যাওয়ার অভ্যেসটাও ক্রমশ বাড়লো। তারপর কোনো লেখা বা বই স্যরকে না দেখিয়ে কিংবা কারেকশন না করে বেরোয়নি। শেষ বই বিশ্ব পরিচয় ২০২১ সালে স্যরের অডিও শুভেচ্ছা দিয়েই প্রকাশ হয়েছে।

গত ২০ জুলাই ২০২৩ ৯০ বছর বয়সে চলে গেলেন চির যৌবনের দূত সমর বাগচী। বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিয়ে কাটিয়েছেন জীবনের অনেকটা সময়। দূরদর্শনে QUEST প্রোগ্রাম দিয়ে যার শুরু। শেষ দু'বছর পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন সর্বত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করার তাগিদে বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করেছেন প্রায় শতাধিক।

দূরদর্শনের Quest অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ জনপ্রিয়। গণমাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ১৯৯২ সালে পান জাতীয় পুরস্কার। পরে ছাপার অক্ষরে Quest বইটি বের হয়। বাড়িতে বাতিল, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে বিজ্ঞানের অসংখ্য এক্সপেরিমেন্ট কিভাবে করা যায় হাতে নাতে—তাঁর বিবরণ রয়েছে Quest-এ।

১৯৬২-তে BITM-এ কিউরেটর হিসাবে চাকুরিতে প্রবেশ। পরে এখানেই হন ডিরেক্টর। পড়াশুনা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে হলেও বিজ্ঞান চেতনার প্রসারকে ধ্যান-জ্ঞান করে কাটিয়ে দেন সারাটা জীবন। যেখানেই যেতেন সঙ্গে থাকত কাঁধে ঝোলা।—মজা করে বলতেন 'কাকের বাসা'। কারণ কি ছিল না তাতে? বাড়ির ভাঙাচোরা বাতিল সব জিনিস, খেলনা, শিশি বোতল, টুকরো কাগজ—আরও কত কী। এসব নিয়েই বসে পড়তেন ছাত্রদের মাঝে। চলতো হাতেনাতে বিজ্ঞানের সূত্রগুলির রহস্য সন্ধান।

বিজ্ঞানের জন্য হেঁটেছেন সারাজীবন। সঙ্গে আউড়াতেন জীবনানন্দ ও অরুণ মিত্রের কবিতা। স্যরের দুই প্রিয় কবি। এমন কোনোদিন হয়নি, বাড়িতে গেছি, এদের কবিতা না শুনে ফিরেছি। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটস এর কবিতা খুব পছন্দ করতেন। সেই সঙ্গে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের পরিবেশভাবনায় ভাবিত ছিলেন।

বাজার অর্থনীতি কিভাবে আমাদের চাহিদা বাড়াচ্ছে এবং পরিবেশ ধ্বংস করছে এ নিয়ে তাঁর ছিল সুচিন্তিত মতামত। শেষ জীবনে অসুস্থ শরীর নিয়ে বিজ্ঞান সংগঠনের অনুরোধে অসংখ্য সেমিনারে বক্তৃতা করেছেন এ নিয়ে। এ সবের বাইরে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতাই হোক কিংবা দেওচা-পাচামি কয়লা উত্তোলনের বিরুদ্ধে কিংবা জলবায়ু জাস্টিস নিয়ে গলা ফাঁটিয়েছেন ও হেঁটেছেন তরুণ তরুণীদের সঙ্গে। ছুঁতে পারেনি কখনো বার্ধক্য। সুস্থ সমাজ না গড়লে আগামী প্রজন্ম হারাবে বিশাল কিছু—এই বেদবাক্য বিশ্বাস করতেন অন্তর দিয়ে। ছিলেন 'ন্যাশনাল এলায়েন্স ফর পিপলস্ মুভমেন্ট'-এর একজন বরিষ্ঠ নেতা। 'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সত্যিই আমরা আজ পিতৃহারা হয়েছি কোনোদিন শিক্ষকতা না করা এক আধুনিক শিক্ষককে হারিয়ে।

Remembering Sthabir Dasgupta

(Obituary)

Jayanta Bhattacharya

"A Great Case"

Remembering Sthabir Dasgupta

Sthabir Dasgupta's life too—embodying many streams in his life, namely, a doctor by passion and profession, once a political activist and whole-timer of CPI(ML) of the late 1960s and early 1970s, an activist against inherent maladies of medicine by equal passion, a relentless writer against the dehumanising face of techno-medicine controlled by corporate, a strong upholder of public health programmes and who always endeavoured to put people at the centre stage of health policy (not effusing from the top brasses ensconced in air conditioned rooms), sometimes against vaccination, lending his implicit and reticent favour for 'conspiracy theories' around COVID epidemic, and, moreover, a prolific writer. At the same time, he, often in his later years, went at length against the present practice of technology and medicine, even to the point of dismissing it.

He was born on 14 January, 1949 and died in ventilation on 5 September, 2023. Truly speaking, he was the son or product of a tumultuous time of the Naxalbari period (1967-1972) in which he fully breathed in and assimilated the spirit—critical analytical capacity, relentless queries to any sort of power game, be it in material political world, be it in the realm of medicine, with his unquestionable dedication to general populace arising out of that time. His commitments and inheritance are explicitly contained in the Swapner Sottor: Maya Rohiya Gelo (The Memories from the Insurgent Revolution of the Seventies). He lived in the period he has depicted in his book. He was also an active actor of the time. After so many years, many people who believed in the revolutionary dream are bereft any vestigial commitment to that legacy of the time—power to the hands of people. But Sthabir Dasgupta did not belong to that degraded genre. He carried it forward as a private oncologist trained in oncology from UK, doctor and social scientist.

In one of his early books (among so many books written by him) Cancer: Purono Bhoy, Notun Bhabona (Cancer: Old Fears and New Thoughts), published in 2010, seemingly like a soothsayer relating myths around conquering cancer and consistent robust propaganda to perpetuate it to Nazi propaganda machinery. In his own words, "Nazism also operates in a subtle way. Nazism is a faith. Apparently its activities produce many 'benefits' in its initial phase. Those who are believers get increasingly obsessed with those illusions. More and more, these beliefs get stronger and stronger. In course of time, its intensity makes the person gets petrified and beefy immune to all logic". (pp. 223-224) Such an analysis for cancer-victory propaganda seems to be truer for today's India's state propaganda.

To note at this juncture, the turn to cheer of technologically wining over cancer was not because the picture was improving. Rather, the mood of post-war America was optimistic. Popular belief in technology and scientific progress overwhelmed thoughtful counter-messages based in scepticism and caution.

In his early years, following the footsteps of Dr Manu Kothari and Dr Lopa Mehta (Nature of Cancer, published in 1973, and the second book The Other Side of Cancer, 2009), Dasgupta strongly raised his voice against existing understanding and treatment of cancer, even to an extent to stick to old drugs and therapies instead of more effective newer ones. Is this a kind of orthodoxy replacing his avowed principles of critical thinking? Later in his years he stressed on the understanding of epigenetic theory of cancer causation. In a research paper "The history of cancer epigenetics", published in 2004 in no other journal than Nature Reviews, it was observed, "Since its discovery in 1983, the epigenetics of human cancer has been in the shadows of human cancer genetics.

But this area has become increasingly visible with a growing understanding of specific epigenetic mechanisms and their role in cancer".

A few interested readers might also be interested to go through the article "Commerce and Corporate Capital Exceeding Science—Cancer: The Disease of Modernity" for a comprehensive appraisal of cancer research where corporate greed and avarice for unquenchable profit deem patients as guinea pigs to conduct all kinds of experiments through medicine or new technologies (https://thedoctorsdialogue.com/cancer-disease-of-modernity/#comments).

But it should be emphasised here that what we—including me, Sthabir Dasgupta and others—are doing is not any fundamental research works in this field. What we produce always comes from rigorous researches of western scholars' papers or books or monographs. Following this logic, it can be said that we are making an 'Indian version' of critiques already in circulation in western academic world.

Actually, one must not think that medicine up until now has remained an individual or contractual type of activity that takes place between patient and doctor, and which has only recently taken social tasks on board. On the contrary, medicine has been a social activity since the eighteenth century. In a certain sense, 'social medicine' does not exist because all medicine is already social. Medicine has always been a social practice. What does not exist is non-social medicine, clinical individualising medicine, medicine of the singular relation. All this is a myth that defended and justified a certain form of social practice of medicine: private professional practice. Thus, if in reality medicine is social, at least since its great rise in the eighteenth century, the present crisis is not really new, and its historical roots must be sought in the social practice of medicine.

At this juncture, we need to make distinctions between (1) Clinical Health (or patients being treated privately as an individual) and Public Health (taking community as the point of intervention), (2) Health (following the historical Alma-Ata Conference of 1978) and Health Care (as a commodity with varying costs), and (3) viable primary health care system for every citizen and super-specialty hospitals.

What emerged at the beginning of the twentieth century, was the fact that medicine could be dangerous, not through its ignorance and falseness, but through its knowledge, precisely because it was a science. This characteristic phenomenon of the history of modern medicine has acquired a new dimension today in so far as that, until the most recent decades, medical risk concerned only the individual under care. At most, one could adversely affect the individual's direct descendants, that is, the power of a possible negative action limited itself to a family or its descendants. Nowadays, with the techniques at the disposal of medicine, the possibility for modifying the genetic cell structure not only affects the individual or his descendants but the entire human race. Every aspect of life now becomes the subject of medical intervention. We do not know yet whether man is capable of fabricating a living being which will make it possible to modify the entire history of life and the future of life.

Sthabir Dasgupta tried his best to bring to our most of these aspects of lacunae in health policy-making and great influence of corporate tributaries in shaping false perceptions about our own need for being healthy. He fought tooth and nail against 'medicalisation' of life in all its aspects. But sometimes he, in my opinion, failed to acknowledge due recognition of devoted new researches for the betterment of mankind. Better to keep in mind all the scientific researchers are not dictated by corporate and all scientists are not stooges of giant MNCs.

In the decades ahead, the pace of biomedical discovery will accelerate. The state of an individual person will be characterised with increasing precision from the molecular level to the genomic level to the organ level and by interactions with medications, nutrients, the micro-biome, therapeutic devices, and the environment. This "precision medicine" will become possible because of huge data sets on large populations, with millions of characterisa-tions of each person. Study populations will grow to millions, which will allow observational studies with novel statistical methods that will allow discovery of useful, reproducible patterns and relationships from these data.

This will give answer to the question raised by Sthabir Dasgupta—why all the patients do not respond equally to chemotherapy? Medicine will proceed towards personalised treatment.

(Courtesy: Frontier, 23-30 Sept. 2023) (Abridged)

ক্রোড়পত্র

VISCERAL LEISHMANIASIS OR KALA-AZAR

Ramaprasad Goswami

Visceral leishmaniasis or Kala-azar is endemic in 75 tropical and subtropical countries. India, Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Sudan, and South Sudan together are responsible for more than 90% cases worldwide. Endemic areas in India: Bihar, West Bengal, Jharkhand, eastern UP.

In the Indian subcontinent the disease is caused by *L. donovani* which is transmitted by the sand fly vector *P. argentipes* and humans are the reservoirs. The ratio of latent VL to active VL may be in the range of 4:1 to 50:1 in an endemic region.

The incubation period can vary between 2 and 8 months. The disease may remain latent in most infected persons. However, such persons may develop active VL after many years of latent infection (2–29% within 3 years).

Clinical features: The classic pentad of VL includes:

- Fever
- Progressive weight loss
- Hepatosplenomegaly
- Pancytopenia
- Hypergammaglobulinemia

In endemic areas low-grade symptoms may be present for weeks to months before the patient seeks medical attention. The spleen can be massively enlarged and it is soft to firm and non-tender (a hard spleen points toward other diagnoses).

Visceral leishmaniasis may also present acutely in non-immune persons (Such as - a British student coming to Baishali district, Bihar for anthropological study) which is characterized by abrupt onset high fever and chills, sometimes with a periodicity mimicking malaria.

Typical laboratory findings include:

- Anaemia (normocytic and normochromic)
- Leukopenia (severe eosinopenia is suggestive)
- Thrombocytopenia
- Hypergammaglobulinemia (can be as high as 9 g/dL)
- High erythrocyte sedimentation rate (ESR)

Diagnosis: The classical pentad in endemic area has high positive predictive value for diagnosis. Parasitological diagnosis is the gold standard.

Splenic aspiration has high sensitivity (93–99%) and can also be used for quantification of parasite burden and monitoring of treatment response. However, it has the risk of life-threatening hemorrhage.

Bone marrow aspiration is a safer alternative but it is less sensitive (60–85%). Liver biopsy is even less sensitive.

Molecular approaches can reach up to 93% sensitivity and 96% specificity. Quantitative PCR assay can assess parasite burden and is also useful for monitoring treatment response.

Immunologic tests include rK39 immunochromatography and direct agglutination test (DAT) using blood sample. Both have high specificity (>90%).

The rK39 strip test is very easy to perform, field adaptive and highly sensitive and specific. It can also be performed using urine sample (Goswami RP et al, J Post Grad Med, 2012). K39 strip test is usually done with 1 drop of blood and 2 drops of buffer but test with urine sample is to be done with 2 drops of urine and 1 drop of buffer. Appearance of two red lines is the positive result.

The test may be positive in ~12% of healthy endemic control i.e. normal host. In that case it represents either past history of VL or present asymptomatic subclinical infection. Another aspect of the test is that it remains positive long after clinical cure - ~100% up to 5 years, ~50% upto 10 years and rarely more than 20 years. So it can not be used in relapse cases where tissue aspiration or PCR is to be done.

The diagnostic criteria in remote peripheral area –

(1) Patient coming from endemic area with clinical features of VL

(2) K39 strip test positivity

(3) No past history of VL

KAtex (latex agglutination test) using urine sample is a promising test. It is cartridge based test. A meta-analysis in 2018 found that KAtex had good specificity (97%) but suffered from poor sensitivity (77%). But the positive aspect of the test is that it becomes negative after clinical cure. So it may be adopted as test of cure.

K39 is the test of diagnosis and KAtex is the test of cure.

Immunocompromised hosts - VL with HIV :

Immunocompromised patients with *Leishmania* infection have higher risk of progressing to clinical VL (4-fold in transplant patients and 100–2,300-fold in HIV patients). The impaired cell-mediated immunity causes higher parasite burden. VL co-infection also causes progression of HIV infection.

Atypical presentations are much more common in

patients with CD4 count <50 cells/mm^3 and include:

- Atypical skin lesions
- Gastro-intestinal tract involvement (chronic diarrhea, malabsorption, etc.)
- Airway, pleural, or pericardial involvement
- Eye involvement like anterior uveitis

Parasitological diagnosis is easier with many tissue samples like skin, buccal mucus membrane or rectal scrapings. PCR remains highly sensitive but serology may be less sensitive in these patients.

Treatment: The recent treatment options for VL –

1. Liposomal amphotericin B(LAmB)
2. Miltefosine
3. Paromomycin

Drug	Dose		Duration
Liposomal amphotericin B	10 mg/kg		Single dose infusion
Miltefosine	2–11 years	2.5 mg/kg/day	28 days
	>12 years and <25 kg body weight	50 mg/day	
	25–50 kg body weight	100 mg/day	
	>50 kg body weight	150 mg/day	

Liposomal amphotericin B: The preferred treatment for VL is liposomal amphotericin B which can be used in all age groups and even in pregnancy. The drug acts like "Magic Bullet ". This is a targeted delivery, the drug being concentrated in macrophage monocyte system where LD bodies are also concentrated. As it does not invade other visceral cells, It is generally less toxic to kidney. Adverse reactions may include fever, rigor, nausea, vomiting, hypokalaemia and hypomagnesemia. The use of single dose LAmB (10mg/kg) has revolutionised the management of VL. Cure rate >90%.

Liposomal amphotericin B, branded *as AmBisome (Gilead Pharmaceuticals, Foster City, CA), is* recommended by World Health Organization (WHO) for management of VL and it is available in India with preferential pricing for developing countries. Authors used a liposomal amphotericin B preparation, developed in India and commercially available as FungisomeTM (Lifecare Innovations Ltd., Gurgaon, Haryana, India), for the treatment of VL. Fungisome requires sonication* for 45 minutes before administration. Like AmBisome, Fungisome is also an intravenous infusion (normal saline in contrast to 5% dextrose for AmBisome). Authors observed a short course 2-day regimen of 15 mg/kg Fungisome yielded 100% cure rate at 6 months after completion of treatment. [*Applying sound energy to agitate particles in a liquid]

Miltefosine: The most beautiful part of miltefosine therapy is that it is the only oral agent available for the treatment of VL. But its half-life is very long –first elimination half-life is 7 days and terminal elimination half-life is 30 days. Miltefosine is eliminated from the body very slowly being still detectable from human plasma 5-6 months after end of therapy. The presence of subtherapeutic miltefosine concentration in blood beyond months after treatment contributes to selection of resistant parasite. So it should be used as single agent.

Adverse reactions of miltefosine include nausea, vomiting, dizziness, scrotal pain, nephrotoxicity, and hepatotoxicity. Miltefosine is teratogenic and is contraindicated in pregnancy. Recently eye toxicities and blindness have been reported.

Paromomycin: Paromomycin (11mg/kg IM for 10 days) is used in combination with miltefosine in India. The adverse effects of paromomycin include injection site pain, raised aspartate aminotransferase, reversible ototoxicity, and nephrotoxicity.

Two older agents used in VL:

1) *Amphotericin B deoxycholate* (0.75 -1 mg/kg/day indusion daily or on alternate days x15-20 doses): Amphotericin B deoxycholate generally has poorer tolerability and higher toxicities than liposomal amphotericin B. However, it is being used as rescue therapy when other agents fail or cannot be used.

2) Pentavalent antimonials (SSG or Stibanate) (20mg/kg/day x 30): It is not being used now a days as >80% cases are resistant in India.SSG with Paromomycin is the WHO recommended first line therapy for uncomplicated VL in East Africa. Side effects are common – nausea, vomiting, pain abdomen, myalgia, arthralgia, hepatotoxicity and cardiotoxicity.SSG should not be given in pregnancy as ~60% spontaneous abortion has been reported.

Combination therapies: Future therapy would be combination therapy.

Advantages:

- Increased efficacy
- Decreased toxicities
- Decreased resistance
- Shorter duration
- Higher compliance
- Lesser chance of relapse and development of PKDL

Combination therapies in India(Sundar S *et al*, The Lancet.2011):

- Miltefosine + Paromomycin (11mg/kg IM) for 10 days
- LAmB 5 mg/kg SD followed by Miltefosine for 7 days
- LAmB 5 mg/kg SD followed by Paromomycin for 10days

Cure rate > 97%.

In another Indian study on combination therapy for VL (Goswami RP *et al*. Am J Trop Med Hyg. 2020), single dose 7.5 mg/kg Fungisome followed by miltefosine (2.5 mg/kg/day for 14 days) achieved 100% cure rate. There was no relapse and no incidence of PKDL over a follow-up period of 5 years.

Treatment of HIV and VL co-infection: VL co-infection is a criterion for stage 4 HIV disease. Co-infection is characterised by increased treatment failure, high relapse rate and high mortality.In a study conducted in Eastern India (Goswami *et al*, Am J Trop Med Hyg 2017), the secondary prophylaxis with liposomal or conventional amphotericin B deoxycholate (1 mg/kg monthly) till CD4 count >200/micro liter significantly reduced relapse as well as mortality (100% in 6 months follow-up).

In 2021 WHO formed a Guideline Development Group for management of HIV-VL co-infection. The author was one of the members of the group.

WHO recommendations for treating HIV-VL co-infection in South-East Asia- 2021

- Liposomal amphotericin B (Total 30 mg/kg at 5 mg/kg on days 1, 3, 5, 7, 9 and 11) + miltefosine(100 mg/day for 14 days)
- Secondary prophylaxis should be given after the first episode of visceral leishmaniasis
- Routinely screen for TB at visceral leishmaniasis diagnosis and further follow-up

POST-KALA-AZAR DERMAL LEISHMANIASIS

Post-kala-azar dermal leishmaniasis manifests as macular, papular, nodular, verrucous or erythematous skin lesions after treatment of VL in 10-20% cases within months to 3 years. It does not ulcerate, does not itch and does not involve palms and soles usually.

The likely factors associated with this response are suboptimal therapy, host genetic predisposition, parasite strain difference, ultraviolet light exposure etc. PKDL might be drug related phenomenon – it is rarely seen after full course of AmB but commonly seen after Stibanate and Miltefosine.

The diagnosis can be done clinically. However, it is also possible to demonstrate amastigotes in the slit skin smear or by PCR.

PKDL patients are infectious to sand flies and hence may act as a reservoir of *Leishmania* in a community. Effective treatment of PKDL patients may be helpful in eliminating VL.

Treatment: The treatment of PKDL typically requires longer duration and outcome is frequently unsatisfactory.

	Treatment regimen for PKDL in India.	
Drug	Dose	Duration
Miltefosine	Daily dose same as VL	12 weeks
Amphotericin B deoxycholate	1 mg/kg/day infusion	60−80 doses over 4 months
Liposomal amphotericin B	5 mg/kg twice weekly	3 weeks

The first two regimens are impractical, toxic and compliance is very low. The future treatment should be combination therapy. Many studies are published in international literature on combination particularly with LAmB and miltefosine (15-20 mg/kg LAmB in 3-5doses with miltefosine for 3-6 weeks).

Prevention

An infectious disease is interaction of agent, host and environment. The agent (LD) is identified and effective chemotherapy and newer techniques for drug delivery have been developed. Newer insecticides have been used to combat sandfly resistance. But are these enough? Though the cases have been dramatically declined over past few years, Kala-azar does not seem to be eliminated in India. It is still occurring in sporadic areas over more than expected rate (>1/1000 population)emerging in new area and re-emerging in old area. Scientific research is not enough for elimination of an infectious disease in a developing country. Kala-azar is the disease of the poorest of poor. It is the political commitment of our leaders and administrators to look at the poor living condition of agricultural labourers in remote villages, who are the great productive forces and prime victim of this deadly disease. They live in a poorly thatched mud house, with cracks and crevices in walls, co-habiting with domestic animals. This is ideal situation for sand fly breeding. So an improved basic health system (social commitment of leaders and health workers) and environment (pucca house with cemented walls with seperate animal house) are basic necessities.

It is worth mentioning that recently Bangladesh is declared to have achieved Kala-azar elimination by WHO and the author was one of the members of Independent Validation Team (IVT) of WHO. Bangladesh has taught

the lesson that social commitment with improved grassroot level basic health system can achieve the target of Kala-azar elimination.

Elimination of human reservoir:

- Improved basic health system
- Improved testing and treatment of VL cases
- Effective treatment of PKDL patients

Vector control:

- Insect repellents (e.g., N, N-diethyl-meta-toluamide)
- Insecticides (e.g., permethrin)
- Insecticide treated bed nets
- Indoor residual spray (e.g., dichlorodiethyltrichloroethane)

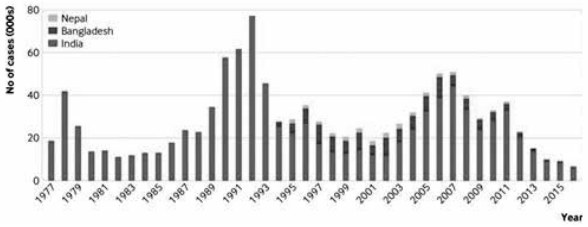

Before concluding, I like to make some comments on the natural history of this disease.

- The downward trend may be the result of the "natural" fluctuation of the disease. Communities that had some herd immunity in the past may gradually becoming fully susceptible.
- The rising trend in post-Kala-azar dermal leishmaniasis together with the emergence of coinfection with HIV is concerning
- Patients with these conditions may serve as reservoirs of infection, perpetuating transmission even when the elimination targets are reached. Treatments for both conditions are far from ideal till now.

In India, VL is stated to be purely anthroponotic. Is it fact or myth? There is no sincere scientific effort or evidence published in international literature to establish this presumption.

Future studies should be aimed at:

1) **Asymtomatic human carrier?**

Observations from an Indian study (V N Rabi Das *et al*, PLoSNegl Trop Dis 2020) suggested the probability:

- 5794 healthy individuals from VL endemic region
- 308 Rk39 positive
- 42 RT-PCR confirmed asymptomatic VL.
- They were followed up through repeated qPCR.
- 10 out of 42 converted to symptomatic cases over years

2) **Asymtomatic animal reservoir?**

One study from Indian subcontinent (Bhattarai N R *et al*. Emerg Infect Dis, 2010) showed PCR positivity among healthy persons (6.1%) and animals(cows 5%, goats 16%)in an area of active VL transmission in Nepal.

No form of chemoprophylaxis is available for preventing leishmaniasis. Till now, no vaccine is available for humans. However, several vaccines are in development. An effective vaccine for susceptible population may be the answer in future.

[Dr. Ramaprasad Goswami, Professor, Formerly at Department of Tropical Medicine, School of Tropical Medicine, Kolkata]

বিস্মৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কাজের চর্চা আগামীতেও চলবে

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

জলবায়ু পরিবর্তনের যে সমস্ত আশু বিপদগুলো বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে বাহক বাহিত সংক্রামক রোগের অর্থাৎ ভেক্টর বোর্ন 'ইনফেকসিয়াস ডিজিজ' গুলোর উত্থান অন্যতম। বিজ্ঞানীদের ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, সারাবিশ্বব্যাপী খরা, অনিয়মিত বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির মতো অনভিপ্রেত ঘটনাগুলো আগামীদিনে ঘটতে চলেছে। এর সঙ্গে পরিবেশে বিদ্যমান জৈব ও অজৈব উপাদানের মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন আসবে।

আগামী দশকগুলোতে ক্ষুদ্রপ্রাণী, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী আণুবিক্ষণিক জীবাণুদের খাদ্য, বাসস্থান এমনকি জীবনধারণই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এদের বাসস্থান পরিবর্তন ও অনুকূল পরিবেশে পর্যাপ্ত বংশবিস্তার অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর জেরে, নতুন নতুন ভৌগোলিক পরিবেশে পোকা-মাকড় এবং বাদুড়ের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা রয়েছে। সঙ্গে বাড়বে এদের দ্বারা বাহিত প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস-ঘটিত নানা সংক্রামক রোগ। এর ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানিজ এনকেফ্যালাইটিস, স্ক্রাব টাইফাসের মত এখনকার ত্রাস-সৃষ্টিকারী রোগগুলো ছাড়াও পীতজ্বর, কালাজ্বর ও প্লেগের মতো পুরনো সমস্যাগুলোও বাড়বার

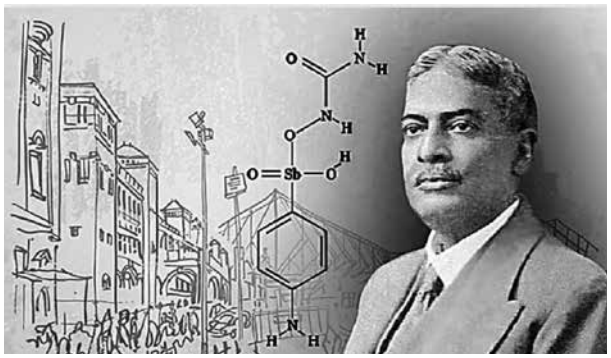

সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তাই আগে থেকে এই সমস্ত রোগগুলোর মোকাবিলার পরিকল্পনা নেওয়া উচিত, মত বিশেষজ্ঞদের।

এই প্রেক্ষিতে একটি প্রায় ভুলতে বসা রোগ- 'কালাজ্বর' নিয়ে কিছু আলোকপাত করব, যা একসময়ে এক বিভীষিকা ছিল ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, তথা আমাদের বাংলায়।

বিগত শতকে কালাজ্বর ভয়াবহ মহামারীরূপে কয়েকবার আমাদের দেশের উপর আঘাত হেনেছে। ঘটে গেছে বহু অকাল মৃত্যু। আক্রান্ত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। আজও আমরা কালাজ্বর সৃষ্টিকারী পরজীবীটিকে পুরোপুরি শায়েস্তা করতে পারিনি। পারিনি এই রোগটিকে সমূলে উৎখাত করতে। মহামারি আকারে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে এখনও পূর্বভারতে বিশেষতঃ পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, ও পশ্চিমবাংলায় কালাজ্বরে আক্রান্ত হবার ঘটনা প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বিষুব অঞ্চলে ভয়াবহতার নিরিখে ম্যালেরিয়ার পর পরজীবীঘটিত রোগগুলোর মধ্যে কালাজ্বরের স্থান দ্বিতীয়।

কালাজ্বর আসলে একটি এককোষী পরজীবীঘটিত রোগ। এই পরজীবীটির নাম- 'লিশম্যানিয়া'। লিশম্যানিয়া কোনও সময়ে ত্বকের প্রদাহ, আবার কোনও সময়ে উদরের বিভিন্ন অঙ্গে সমস্যা সৃষ্টি করে। কালাজ্বরকে উদরের লিশম্যানিয়েসিস বলাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯০৩ সালে 'লিশম্যান' ও 'ডোনোভ্যান' নামের দুইজন বিজ্ঞানী একইসাথে যথাক্রমে ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে কালাজ্বরের পরজীবীটি আবিষ্কার করেন। সেবছর ম্যালেরিয়া পরজীবীর আবিষ্কর্তা রোনাল্ড রস কালাজ্বর সৃষ্টিকারী পরজীবীটির নাম দেন 'লিশম্যানিয়া ডোনোভ্যানি'।

কালাজ্বর বিষুব অঞ্চলে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ কয়েকবার মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। কেবল ১৯৭৮ সালেই কালাজ্বরে আমাদের দেশে মোট কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৯১ সালে আবার ভয়াবহরূপে এটি দেখা যায় ভারত ও সুদানে। ভারতবর্ষে এই সময়ে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হন। ভারত ও সুদান মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ হাজার। সারা পৃথিবীতে এখনও প্রতি বছর প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়।

ভারতে কালাজ্বরের পরজীবী 'লিশম্যানিয়া ডোনোভ্যানি' মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয় 'স্যান্ডফ্লাই' (বেলেমাছি) নামক একরকম মাছির মাধ্যমে, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম- 'ফ্লেবোটোমাস আর্জেন্টিপস'। এই পরজীবীর জীবনচক্রের একটি ভাগ (প্রোম্যাস্টিগোট অবস্থা) অতিবাহিত হয় এই প্রকার মাছির খাদ্যনালীতে, আর অপরভাগ (আম্যাস্টিগোট অবস্থা) আক্রান্ত মানুষের ম্যাক্রোফাজ কোষে।

কালাজ্বর আক্রান্ত মানুষের মধ্যে জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্যভাব ইত্যাদি নজরে এলেও যকৃত ও প্লীহার বড়ো হয়ে যাওয়াকে চিকিৎসকরা মূল রোগলক্ষণ বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত বলি, কালাজ্বর শব্দটি এসেছে কালা-আজার (kala-azar) শব্দটি থেকে। অসমিয়া ভাষায় azar শব্দের অর্থ জ্বর। এই জ্বর হলে রোগীর শরীরের রং কালো হয়ে যেত বলে রোগটিকে কালাজ্বর বলা হয়। অর্থাৎ রোগীর ত্বকের কালো রং এই রোগের আরেকটি লক্ষণ। ঠিকমত ওষুধ খেলে কালাজ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। বাজারে কালাজ্বরের ওষুধ সুলভেই পাওয়া যায়। লিশম্যানিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম অ্যান্টিমনির যৌগ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' ব্যবহার করে সারা বিশ্বে যিনি হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। তিনি হলেন বিশিষ্ট ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। এটা ডা. ব্রহ্মচারীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী।

ডা. ব্রহ্মচারী প্রকৃত অর্থে একজন বিস্মৃত অথচ 'জিনিয়াস' ভারতীয় বিজ্ঞানী। কালাজ্বর রোগের কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কারের সুবাদে তিনি লক্ষ লক্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কৃতিত্বকে সম্মান দেখাতে দু'বার (১৯২৯ ও ১৯৪২ সালে) তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই পুরস্কার তিনি পাননি। ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট ও রায় বাহাদুর উপাধি এবং কাইজার- ই-হিন্দ স্বর্ণপদক নিয়েই তাঁকে থাকতে হয়েছিল।

ডা. ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর বিহারের জামালপুরে। বিহারের জামালপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়েতে কর্মরত চিকিৎসক ডা. নীলমনি ব্রহ্মচারীর সুপুত্র উপেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি জামালপুরে স্কুলের পাঠ শেষ করে হুগলির কলেজ থেকে গণিত ও রসায়নে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে একসাথে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে যথাক্রমে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক এবং রসায়ন নিয়ে স্নাতকত্তোর ডিগ্রি লাভ করেন। ডা. ব্রহ্মচারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শারীরবিদ্যা শাখায় পি.এইচ. ডি লাভ করেন।

১৯০৫ সালে ডা. ব্রহ্মচারী ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমানে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ)-এ শিক্ষক-চিকিৎসক হিসাবে যোগ দেন। তাঁর গবেষক জীবনের অনেকটাই এই মেডিক্যাল কলেজে অতিবাহিত হয়। কালাজ্বরের চিকিৎসার ওষুধও এই কলেজের গবেষণাগারে তিনি আবিষ্কার করেন।

১৯১৩ সালে ব্রাজিলের চিকিৎসক ভিয়ান্না কালাজ্বরের চিকিৎসায় টারটার এমেটিক রাসায়নিকের সফল প্রয়োগ করেন। টারটার এমেটিক অ্যান্টিমনি টারটারেটের একটি পটাশিয়াম সমন্বিত লবণ।

১৯১৫ সালে সিসিলিতে দুই চিকিৎসক (ক্রিশ্চিনা ও কোরটিনা) টারটার এমেটিক রাসায়নিক ব্যবহারের সাফল্য তুলে ধরেন। এই সময়ে কলকাতায় চিকিৎসক রজারসও টারটার এমেটিক ব্যবহারে সফলতা পান। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, এই রাসায়নিক ব্যবহারে বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। ডা. ব্রহ্মচারী প্রথমে পটাসিয়ামের বদলে এই রাসায়নিকে সোডিয়াম ব্যবহার করেন। কিন্তু তাতেও সেভাবে সাফল্য এল না। এরপর তিনি ধাতব অ্যান্টিমনি ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এতেও পুরোপুরিভাবে ভাল ফল না পাওয়ায়, তিনি বিকল্প চিকিৎসার দিকে ঝোঁকেন। এই সময় ইউরোপে বিজ্ঞানী আর্লিক 'স্লিপিং সিকনেস' রোগের চিকিৎসায় প্যারা আর্সানিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম সমন্বিত লবণ ব্যবহারে দারুণ সাফল্য পান। ডা. ব্রহ্মচারী ঠিক করেন, তিনি আর্সেনিলিক অ্যাসিডের পরিবর্তে অ্যান্টিমণি ব্যবহার করবেন। সমকালীন সময়ে অনেকেই এই নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১৯-এ ডা. ব্রহ্মচারী তৈরি করেন ইউরিয়া স্টিবামিন। এটি একটি প্যারা অ্যামিনোফিনাইল স্টিরানিক অ্যাসিডের ইউরিয়া সমন্বিত লবণ। এই রাসায়নিকের ব্যবহারে ডা. ব্রহ্মচারী ব্যাপক সাড়া পান। কালাজ্বরের চিকিৎসায় ইউরিয়া স্টিবামিন মহৌষধি হিসাবে সামনে আসে। ভারতে ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত হাজার হাজার কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীর প্রাণ বাঁচে। গরীব-গুর্বো মানুষের মৃত-সঞ্জীবনী হয়ে ওঠে ইউরিয়া স্টিবামিন।

১৯৩২ সালে তৎকালীন ভারত সরকার নিযুক্ত কালাজ্বর কমিশনের নির্দেশক কর্নেল এইচ.ই.সর্ট এই ওষুধটির ভূয়সি প্রশংসা ক'রে বলেন, ইউরিয়া স্টিবামিন গত সাত বছরে হাজার হাজার কালাজ্বর আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে।

জেনে রাখা ভাল, কালাজ্বর রোগটির সঙ্গে ডা. ব্রহ্মচারীর নাম জুড়ে গেলেও, তৎকালীন বেশ কয়েকটি সংক্রামক রোগের উপর তিনি সাফল্যের সঙ্গে গবেষণা করেছেন। এদের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার, সেরিব্রোস্পাইন্যাল মেনিনজাইটিস, ফাইলেরিয়াসিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কুষ্ঠ এবং সিফিলিস উল্লেখনীয়। কলকাতা ও ঢাকাতে আবির্ভূত কোয়ার্টান রোগের আবিষ্কার তিনিই করেন।

ডা. ব্রহ্মচারীর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল, ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে ছিলেন। সমাজ কল্যাণমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতেও তাঁকে দেখা গেছে। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা সংস্থা ও সমিতির সম্মানীয় পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডা. ব্রহ্মচারীর মৃত্যু হয় ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।

ডা. ব্রহ্মচারীর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হলো, তাঁর দানশীলতা। বিভিন্ন গবেষণামূলক ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তাঁর আর্থিক সহায়তায় উপকৃত হয়।

বস্তুতঃ কালাজ্বর হওয়ার ঘটনা বর্তমানে কয়েকটি অঞ্চলে আকস্মিকভাবে দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। যদিও বিগত দশকে ড্রাগ- রেসিস্ট্যান্ট লিশম্যানিয়ার উদ্ভব হওয়ায় কালাজ্বর রোগটির প্রকোপ কিছুটা মাথাচাড়া দিয়েছে। বর্তমানে এই রোগের চিকিৎসায় প্রাথমিকভাবে পেন্টাভ্যালেন্ট অ্যান্টিমনি সমন্বিত ওষুধ এবং পরবর্তীতে পেন্টামিডিন ও অ্যাম্ফটেরিসিন-বি কে কাজে লাগানো হয়।

সম্প্রতি দেওয়া সরকারি হিসাব মতে, সারাদেশে ২০০৭-এ যেখানে কালাজ্বরের সংখ্যা ছিল ৪৪,৫৩৩ সেখানে ২০২২-এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৩৪-এ। অর্থাৎ এই রোগের হ্রাস ঘটেছে ৯৮.৭ শতাংশ। অনুমান, বেসরকারিভাবে করোনা কালের এই পরিসংখ্যান নিখুঁত ও যথাযথ নয়। তবে রোগীর সংখ্যা যে কমেছে, তা যথেষ্টই ইতিবাচক। এই মুহূর্তে কালাজ্বরের চিত্রটা কিছুটা স্বস্তি দিলেও জলবায়ু পরিবর্তনের নিরিখে যে স্বস্তিদায়ক থাকবে না, তা আগেই আলোচনা করেছি। এখন দেখার, ভবিষ্যতের এই চ্যালেঞ্জকে আগামী প্রজন্মের গবেষক ও নীতি নির্ধারকরা কীভাবে মোকাবিলা করেন। তবে একই সাথে আগামীতেও ডা. উপেন্দ্র ব্রহ্মচারীর কাজ যে আলোচনায় উঠে আসবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

[লেখক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
এবং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো]

কালাজ্বর দূরীকরণ কর্মসূচি: সাফল্য ও কিছু সীমাবদ্ধতা

দীপঙ্কর মাজী

এক আদিবাসী ভদ্রলোক। বয়স ৪০এর কোঠায়। বাড়ি উত্তরবঙ্গের একটি অজ গ্রামে। প্রায় ৮-৯ মাস হয়ে গেল, অদ্ভুত একটা জ্বরে ভুগছেন। মাঝে মাঝে ২-৪ দিনের জন্য জ্বরটা ছেড়ে যায়। কিন্তু আবার ঘুরে আসে। জ্বরের মাত্রা বেশি হয়। কিন্তু শরীরটাকে একেবারে জখম করে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় না-পাশী ডাক্তারদেরই দেখিয়ে ওষুধপত্র খেয়েছেন। মাঝে একবার প্রতিবেশীর পরামর্শে বিহারে গিয়েও ডাক্তার দেখিয়ে এসেছেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। এখন প্রায় শয্যাশায়ী। দিনমজুরির যে কাজ ওঁর, সেখানে নেওয়ার তো প্রশ্নই নেই। হাত-পা ফুলে গিয়েছে। পেটটাও ফুলেছে। ইদানিং আবার খুব কাশি দেখা দিয়েছে।

অবশেষে এক স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শে, শেষ সম্বলটুকু বাঁধা দিয়ে, জেলা হাসপাতাল গিয়ে ভর্তি হলেন। সেখানে ধরা পড়ল—রোগটা কালাজ্বর! সঙ্গে বুকের টিবি এবং মারাত্মক অ্যানিমিয়া। চিকিৎসা শুরু হল। কালাজ্বরের ইঞ্জেকশানও পড়ল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভর্তির ৭-৮ দিনের মাথায় রোগীর মৃত্যু হল।

এমন ঘটনা আমাদের দেশে আজও ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর ৭৬ বছর পার হয়ে গেছে। ১৯৯০-তে কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু হওয়ার পরেও ৩৩ বছর চলে গেছে। তবু আজও এমন ঘটনা ঘটে।

কালাজ্বর অসুখটা প্রধানতঃ দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় প্রসার ঘটেছে। কালাজ্বর উপদ্রুত এলাকায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও রক্ত পরীক্ষা করে কালাজ্বর নির্ণয় করার ব্যবস্থা রয়েছে। কালাজ্বরের চিকিৎসার আধুনিকতম ওষুধও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কালাজ্বরের প্রকোপ অনেকাংশে কমে এলেও মানুষের দীর্ঘ রোগভোগ এবং মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু আজও নির্মূল করা যায়নি।

দীর্ঘস্থায়ী জ্বর যে কালাজ্বরের লক্ষণ হতে পারে এবং তার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা যে গ্রামীণ হাসপাতালেই সম্ভব, ওই বিষয়ে প্রান্তিক মানুষের ধারণা এবং সচেতনতা ও সহজগম্যতার (access) আজও ঘাটতি রয়ে গেছে।

কালাজ্বরের জন্য জনস্বাস্থ্যমূলক ক্রিয়াকর্ম আমাদের দেশে শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে। ২ বছরের মধ্যেই নূতন রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যুর ঘটনা অনেকটা কমে আসে। সেইসময় এই অসুখের চিকিৎসা হত সোডিয়াম স্টিবোগ্লুকোনেট ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে। নাম থেকেই আন্দাজ করতে পারবেন এটি একটি অ্যান্টিমনি-ঘটিত যৌগ (stibo=antimony) যা ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামাইনেরই উন্নত বিকল্প।

২০০০ সালে নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আরও গুছিয়ে শুরু করা হয়। ভারতের চারটি রাজ্যকে স্থায়ী-আক্রান্ত রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যথা—বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। অবশ্য এছাড়া আরও কয়েকটি রাজ্যে অনিয়মিতভাবে কালাজ্বরের রোগী পাওয়া যায়। যেমন—আসাম, সিকিম প্রভৃতি। নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় আক্রান্ত জেলা ও ব্লক বা মিউনিসিপ্যালিটিরও তালিকা তৈরি হয়। প্রথমোক্ত ৪টি রাজ্যের জন্য। এখানে উল্লেখ্ করা যেতে পারে যে, এই রাজ্যগুলির সঙ্গে সীমানায় যুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলিও কালাজ্বর আক্রান্ত; অর্থাৎ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান।

আমাদের দেশে কালাজ্বরের দু'রকম রূপ দেখা যায়। একটি হল সাধারণ কালাজ্বর, যেটির কথা আগেই বলেছি। এখানে লিভার, প্লীহা (spleen) ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ আক্রান্ত হয় এবং জ্বর দেখা দেয়। আর একটি হল ত্বকের কালাজ্বর যা সাধারণত সাধারণ কালাজ্বর থেকে সেরে ওঠার ১-৩ বছর পরে হয়। এক্ষেত্রে জ্বর বা কোনও অসুস্থতা হয় না। ত্বকে গুটি বা ফ্যাকাশে ছোপ ছোপ দাগ সৃষ্টি হয়। ত্বকের কালাজ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির থেকেও বেলে মাছির কামড়ের মাধ্যমে কালাজ্বর অন্য ব্যক্তিকে সংক্রামিত করতে পারে।

কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চলতে চলতে ২০১৪ সাল থেকে কেবল সাধারণ কালাজ্বর নয়, ত্বকের কালাজ্বর নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সক্রিয় চেষ্টা শুরু হয়।

ইতিমধ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে সাধারণ কালাজ্বর নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল। এক্ষেত্রে 'নির্মূল'-এর মাপকাঠি হল : ব্লকস্তরে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যা পিছু নতুন রোগীর সংখ্যা বছরে ১টিরও কম হবে। ২০১৫-র লক্ষ্যমাত্রা বিফল হলেও পশ্চিমবঙ্গ ২০১৭ সালে নির্মূলীকরণের এই মাত্রায় পৌঁছতে সমর্থ হয়। এর পরে উত্তরপ্রদেশও লক্ষ্যে পৌঁছয়। অবশেষে গত বছরে (২০২৩) চারটি রাজ্যই একই বন্ধনীতে আসে। এখানে নির্মূলের অর্থ এই নয় যে, অসুখটি আর কারও হচ্ছে না বা হবে না। এর অর্থ—কালাজ্বর সংক্রমণের মাত্রা কমে এমন জায়গায় আসবে যে অসুখটি আর জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে থাকবে না। এবং বর্তমানে যারা সংক্রমিত, তাদের থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে গিয়ে ব্যাপকতা লাভ করতে পারবে না।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে কালাজ্বর দূরীকরণ কর্মসূচি চলছে, তার ক্রিয়াকর্মগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া যাক।

(ক) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা : ম্যালেরিয়া নির্ণয় যেমন আঙুল ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট্-এর সাহায্য সহজেই করা যায়। সাধারণ কালাজ্বরও আঙুল ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে আর.কে. ৩৯ 'র‍্যাপিড ডায়াগনস্টিক কিট'-এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কালাজ্বর আক্রান্ত জেলায় সব হাসপাতাল এবং ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও এই পরীক্ষা হয়ে থাকে।

সাধারণ কালাজ্বরের চিকিৎসা এক দিনের একটি ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশানের দ্বারা করা যায়। তবে ত্বকের কালাজ্বরে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে ৩ মাস ওষুধ খাওয়ার দরকার পড়ে।

(খ) রোগের নজরদারি : আসা (ASHA) এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সারা বছর ধরেই নজরদারি চলে। কিন্তু তাছাড়াও, বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে সক্রিয় রোগ সন্ধানে (Active Case Search) করা হয়—বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে। সার্ভে করে যাঁদের রোগী হিসাবে অনুমান করা হয় (Suspected case), তাঁদের মেডিক্যাল ক্যাম্পে এনে রক্তপরীক্ষা এবং ক্লিনিক্যাল চেক্-আপ করানো হয়। ত্বকের কালাজ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে টিস্যু পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) বেলে মাছি নিধনের জন্য স্প্রে : কালাজ্বরের বাহক যে বেলে মাছি, তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আক্রান্ত গ্রাম ও ওয়ার্ডগুলিতে বছরে দুই বার বাড়ি বাড়ি বিশেষ একটি ইনসেকটিসাইড স্প্রে করা হয়। স্প্রে-টি করার নিয়ম ঘরের ভিতরে দেওয়ালে এবং গোয়াল ঘরে। কারণ, এই জায়গাগুলিতেই প্রায়শঃ বেলে মাছি দেওয়ালের ফাটলের ভিতরে আশ্রয় নেয়। আবার, মানুষ বা প্রাণীর রক্ত খাওয়ার পর দেওয়ালে বসেই বিশ্রাম নেয়। বাড়ির লোকেদের বলা হয় স্প্রে-র পরে অন্ততঃ ৩ মাস দেওয়ালে মাটি

লেপা বা চুনকাম না করতে। তা না হলে ইনসেকটিসাইডের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

(ঘ) জনসচেতনা কর্মসূচি : কালাজ্বর অসুখটি কিভাবে সংক্রমিত হয়, কেমন করে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, অসুখটির লক্ষণ কী, চিকিৎসার সুযোগ কোথায় রয়েছে, ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার বার্তা দেওয়া হয়।

(ঙ) আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি : যেহেতু প্রধানতঃ দরিদ্র মানুষই এই রোগের কবলে পড়েন। তাই তাঁদের সাহায্য করার জন্য এই কাজগুলি করা হয়।

• **চিকিৎসা সম্পূর্ণ করলে টাকা**—একজন দরিদ্র মানুষকে যেহেতু তাঁর দিনের রুজি বাদ দিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হয়, তাই চিকিৎসার কোর্স সম্পূর্ণ করলে ভর্তুকি হিসাবে দেওয়া হয় সাধারণ কালাজ্বরে ৫০০ টাকা এবং ত্বকের কালাজ্বরে ৪০০০ টাকা।

• **পুষ্টিকর খাদ্য**—প্রত্যেক কালাজ্বর রোগীকে প্রতিমাসে ১০০০ টাকা মূল্যের পুষ্টিকর শুকনো খাবার দেওয়া হয় ৬ মাস ধরে।

• **যাতায়াতের খরচ**—চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য রোগী এবং একজন সহায়ককে গাড়ির খরচ দেওয়া হয়; গাড়ি ভাড়া করার খরচ বা গণপরিবহণে যাওয়ার খরচ, যেখানে যেমনটি দরকার। জেলার ভিতরে যাতায়াতের জন্য অনধিক ২০০০ টাকা এবং জেলার বাইরে কোনও হাসপাতালে যেতে হলে অনধিক ৫০০০ টাকা।

উপরোক্ত কর্মসূচি পালন করে কালাজ্বারকে বহুলাংশেই কমিয়ে ফেলা গেছে এবং দূরীকরণের লক্ষ্যরেখা ছোঁয়াও গেছে—এ কথা ঠিক। কিন্তু অসুখটি বা রোগের পরজীবী জীবাণু ও তার বাহক তো একেবারে মুছে যায়নি। সজাগ নজরদারি এবং জনসচেতনতামূলক কাজ নিবিষ্টভাবে চালিয়ে না গেলে এই সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

[লেখক জনস্বাস্থ্যকর্মী]

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী – বিস্মরণে বৈজ্ঞানিক, বিস্মৃত বৈজ্ঞানিক সাধনা

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

শুরুর কথা

আজ থেকে প্রায় ১৮০ বছর আগে সেসময়ের মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান যিনি একাধারে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনের এমডি, বহু ভাষাবিদ, গবেষক এবং ভারতের IMS (Indian Medical Service)-এ স্থান পাওয়া প্রথম ভারতীয় সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় চিকিৎসকদের ভারতে বসবাস ও চিকিৎসা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন – "granting all the praise and honour due to hard-working and intelligent professors, the **European medical officers were at best birds of passage, and could not, therefore, permanently improve the position and prospects of the profession out of the service**." ("Address in Medicine: The Present State of the Medical Profession in Bengal (delivered on February 3rd, 1864)," *British Medical Journal* 2 (July-December 1864): 88) ফলে এসমস্ত "পরিযায়ী পাখিদের" বিকল্প হচ্ছে ইউরোপীয় জ্ঞানকে নিজেদের মতো করে আত্মীকরণ করে নেওয়া। একে আমরা যদি জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভ্রূণরূপ ধরি তাহলে মনে হয় গুরুতর কোন প্রমাদ হবে না।

পরাধীন ভারতে স্বাধীনভাবে গবেষণার চিন্তায় উজ্জীবিত বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করেছিলেন সেসময়ের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ-নেওয়া মারণান্তক অসুখ কালাজ্বরের সবচেয়ে ফলদায়ী চিকিৎসা – ইউরিয়া স্টিবামিন ওষুধ।

ব্রহ্মচারী ১৯৩৬ সালে ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন – "As a matter of the most vital concern in **nation-building**, the problem of nutrition demands very careful consideration by statesmen and scientists alike, more so due to the fact, as has been recently observed, that a great part of the world's population is not consuming the **necessary food stuff**. An eminent Swiss authority predicts the decay of civilization unless there is a fundamental revision of the people's diet."

আমরা "নেশন-বিল্ডিং" শব্দটিকে খেয়াল করব। দেশ এবং জাতির গঠনে, ব্রহ্মচারীর ধারণানুযায়ী, রাষ্ট্রনেতা, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জনকল্যাণী শক্তিকে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা – এসবের একটি যোগসূত্রে বিশ্বাস করেছিলেন ব্রহ্মচারী।

১৯৩৬ সালে যখন এ কথা ব্রহ্মচারী বলছেন সেসময় জাতীয়তাবাদী ভাবনার জোয়ারের কাল। এসময়ে, খুব অল্পকথায় বললে, ভারতে স্বাধীনতা আসবে কোন পথে এনিয়ে যেমন বিতর্ক চলছে, তেমনি চলছে স্বাধীন বা প্রাক-স্বাধীন ভারতে শিক্ষা এবং বিজ্ঞানচর্চার ধরন কেমন হবে এ নিয়েও বিভিন্ন মত ও পথের দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানচর্চার সাথে ভারতীয় উদ্যোগে স্বাধীন প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবসায়িক উদ্যোগ কোন পথে বিকশিত হবে –

বিবিধমুখী এরকম বিভিন্ন দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ চেহারা দেখার আগে আমরা একবার দেখে নেব ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই "জাতীয় শিক্ষা" নিয়ে কত পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। এবং তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কিভাবে পড়েছে পরবর্তী সময়ের চিন্তাজগতের ওপরে।

ইতিহাসের ধারায় ব্রহ্মচারী — বিস্মরণের অতীত ও বর্তমান

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের মান্য গবেষক রয় পোর্টার বলা যেতে পারে তাঁর ম্যাগনাম ওপাস দ্য গ্রেটেস্ট বেনিফিট টু ম্যানকাইন্ড গ্রন্থে বলছেন — "In many villages and clearings where the white men took his wares and weapons, he encountered ghastly unknown conditions: *kala-azar*, with its leprosy-like symptoms, in India and Africa"। সে তো না হয় হল। ভারতে এবং আফ্রিকায় "বিভৎস অজানা পরিস্থিতির" মুখোমুখি হতে হয়েছিল রয় পোর্টারের নিজের দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। কিন্তু এর পরে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন পোর্টার — "Colonial powers, however, would see disease in one light only: an evil, an enemy, a challenge, it had to be conquered in the name of progress." উপনিবেশিক শক্তি রোগকে এক শত্রু, এক আপদ এবং এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখতো এবং ভাবতো এদের জয় করা আসলে প্রগতির নামান্তর। এখানে বলার কথা, হ্যাঁ, শুধু রোগের ক্ষেত্রে এ সমস্যা বিদ্যমান ভাবলে আমরা ভুল করবো। উপনিবেশের শ্রেষ্ঠ মেধাসমূহকেও আপদ, শত্রু এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছে। হয়তো এ কারণে পোর্টার আবিষ্কারক হিসেবে রবার্ট কখ বা পল আর্লিখদের নাম তাঁর বইয়ে উল্লেখ করলেও *kala-azar*-এর আলোড়ন ফেলা চিকিৎসা ইউরিয়া স্টিবামিন বা এর আবিষ্কর্তা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নামোচ্চারণ করেননি।

১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সভাপতির পূর্বোক্ত ভাষণে ব্রহ্মচারী বললেন — "বাস্তব কথা হল এই যে, একটি দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল পুষ্টির অভাব। একে রাষ্ট্রনেতা এবং বৈজ্ঞানিকদের উভয়ের তরফে অতি যত্ন সহকারে দেখতে হবে। এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য থেকে বঞ্চিত। একজন নামী সুইস (Swiss) গবেষক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যদি না পৃথিবীর মানুষকে খাদ্যের জোগান দেওয়া যায় তাহলে সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" এরকম মানুষ-মুখী মানসিকতা ছিল তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি।—

আমার এ নাতিদীর্ঘ গবেষণাকর্ম জাতীয় স্মৃতিতে প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মরণে চলে যাওয়া (collective amnesia) চিকিৎসক-গবেষক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর আবিষ্কারের নানা বাঁক নিয়ে আলোচনা করেছি।

গবেষক, চিকিৎসক, আবিষ্কারক তথা স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পরে বন্দিত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যান্সেট-এ "অবিচ্যুয়ারি" বিভাগে লেখা হয়েছিল — "By the death of Sir Upendrnath

Brahmachari in Calcutta on Feb. 6, India has lost one her outstanding figures. He was not only a distinguished Indian physician — perhaps the most distinguished of his day — **but also a research worker of unusual merit**." ল্যান্সেট জার্নাল বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষ শুধুমাত্র একজন অসামান্য চিকিৎসককে হারিয়েছে তাই নয়, হারিয়েছে একজন অনন্যসাধারণ উচ্চমেধার গবেষককে। তাঁর গবেষণা নিয়ে মন্তব্য করা হল — "His early researches on antileishmanial drugs, which culminated in his preparation of **urea stibamine**, were financed by the Indian Research Fund Association." সবার শেষে প্রতিবেদনে বলা হয় — "If all distinguished Indians, and for that matter **all British officials**, had shared his liberal outlook, **many of the difficulties India face today would have been resolved**." অর্থাৎ, যদি বিজ্ঞানের জগতে কেবল সমস্ত ভারতীয়ই নয়, ব্রিটিশ অফিসারেরাও যদি তাঁর মতো মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে পারতেন তাহলে ভারতের অনেক সমস্যারই সমাধান করে ফেলা সম্ভব হত।

প্রসঙ্গত, ১৮২৩ সালে জন্ম নেওয়া ল্যান্সেট জার্নালে এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক টমাস ওয়াকলে-র র‍্যাডিক্যাল বিশ্বাস ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছিল। বর্তমানে ল্যান্সেটের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ৬০-এর বেশি। ল্যান্সেট-এর প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় বলা হয়েছিল (অক্টোবর ৫, ১৮২৩) — "It has long been a subject of surprise and regret, that in this extensive and intelligent community there has not hitherto existed a work that would convey to the Public, and to distant Practitioners as well as to, Students in Medicine and Surgery, reports of the Metropolitan Hospital Lectures." এই লক্ষ্যে "To Country Practitioners, whose remoteness from the head quarters, as it were, of scientific knowledge, leaves them almost without the means of ascertaining its progress — To the numerous classes of Students, whether here or in distant universities — To Colonial Practitioners — And, finally, to every individual in these realms." — এদের সবার কাছে চিকিৎসার জগতের গবেষণা ও অগ্রগতির খবর পৌঁছে দিতে হবে। সম্পাদকের স্পষ্ট ধারণা ছিল এ কাজের জন্য "we shall be assailed by much interested opposition"।

আমরা বুঝতে পারছি, খোদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রে জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকা আভিজাত্য এবং ঐতিহ্য-নির্ভর

বিজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের সাথে মুক্ত চিন্তার এবং স্বাধীন গবেষণার বিরোধ – বিশেষত মেডিসিনের জগতে – বাহ্য একটি বিষয় ছিল। ১৯ শতকের প্রথমার্ধ অব্দি অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের মেডিক্যাল শিক্ষায় মেডিসিনের সাথে সাথে বাইবেলও পড়তে হত। এ বিষয়ে বিশেষ ভালো আলোচনা পাওয়া যাবে জোয়ান লেন-এর সমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ *A Social History of Medicine* এবং এন ডি জেউসন-এর অতি আলোচিত "Medical Knowledge and the Patronage System in 18th Century England" প্রবন্ধে।

এরকম অবস্থাকে ভাঙ্গার জন্য একদিকে যেমন জেরেমি বেন্থাম সহ অন্যান্য চিন্তাবিদদের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন বা আদিতে লন্ডন ইউনিভার্সিটি (১৮২৬) তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য জন্ম নিয়েছে ল্যান্সেট তুল্য জার্নাল। অর্থাৎ, উপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার জগতে টানাপড়েন এবং দ্বন্দ্ব শুধু উপনিবেশিক-উপনিবেশিত এ দুয়ের বা দ্বিত্বতার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলনা। উল্লেখযোগ্য, উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কাঠামোর মধ্যেই অন্তর্লীন থেকেছে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার দ্বন্দ্ব। এরই নিকৃষ্ট প্রতিসৃত চেহারা আমরা দেখেছি উপনিবেশিক ভারতে।

বিজ্ঞানের মাঝে এরকম স্তরায়িত দ্বন্দ্ব নিয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রুনো লাতুরের *Science in Action: How to follow scientists and engineers through society* এবং টমাস কুনের *The Structure of Scientific Revolutions* সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক পড়ে থাকবেন আশা করি। এছাড়া সবার পরিচিত গ্রন্থ ডেভিড আর্নল্ড-এর কলোনাইজিং দ্য বডি এবং কপিল রাজের রিলোকেটিং মডার্ন সায়ান্স পথিকৃৎ স্থানীয়।

উপেন্দ্রনাথের জন্ম ও শিক্ষা বৃত্তান্তে (১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৩ – ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) প্রবেশের আগে আমরা বুঝে নিতে পারি তাঁর বেড়ে ওঠার সময়কালে উপনিবেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতির কিছু বিশিষ্ট রূপরেখা। কারণ চিন্তা তো সময়ের সন্তান – তা সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই হোক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা। সময় থেকে আলাদা করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে এগুলোকে দেখা যায়না, দেখা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদ – তৎকালীন সময়ের বিশিষ্টতা

১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধ জয় করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিলো। কিন্তু ১৮২৫ সালেই বিশ্ববাজারের অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয় ইংল্যান্ড। এ বিষয়ে দ্য ইকনোমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা "The slumps that shaped modern finance" পড়ে নেওয়া যায়। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চা ব্যবসার ক্ষেত্রে যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে এসেছিল তা গভীর প্রশ্নের মুখে পড়ে। এদের একচেটিয়া ব্যবসার জন্য ব্রিটেনের ধনাঢ্য শ্রেণিকে ২ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। এদিকে অস্ট্রেলিয়া চিন থেকে অনেক কমদামে চা কিনতো। কিন্তু ইংরেজরা কার্যত একটি ঘোরতর "চা-খোর" জাতি। এজন্য কমদামে ভালো চা পাওয়া ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনীতির অংশ হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া গুপ্তের গবেষণা দেখিয়েছে – "Evidence based on contemporary accounts suggests that a tradesman's family in 1749 in Britain spent three shillings a week for bread and four shillings on tea and sugar. But tea was still too expensive to become common man's drink. It was only in the nineteenth century that tea became a common beverage for British households. Per capita consumption per year increased from 1.1 pounds in 1820 to 5.9 pounds in 1900 and 9.6 pounds in 1931."

Table 1: Consumption of Tea: International Market Share

Year	Share in World Consumption (%)				
	United Kingdom	Rest of Europe	Russia/ USSR	North America (including West Indies)	Major Producing Countries
1910	39.2	4.2	21.0	18.3	4.4
1920	56.4	6.9	Not Available	18.1	6.6
1928	48.4	6.7	7.1	14.3	4.1
1936	53.5	6.3	3.1	14.2	9.3

Source: International Tea Committee, *Bulletin of Statistics*, 1946.

এরকম সময় দিয়েই শুরু হয় প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ (১৮২৪-২৬)। বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১৫০,০০০ সৈনিক গারো পাহাড়, আসাম এবং মণিপুরের বিপজ্জনক দুর্ভেদ্য অঞ্চলে লড়াই করে মারা যায়। সেসময়ের হিসেবে ৫-১৩ মিলিয়ন পাউন্ড (বর্তমান হিসেবে ৪০০ মিলিয়ন থেকে ১.৪ বিলিয়ন পাউন্ড) ক্ষতি হয় যুদ্ধের ফলে। কিন্তু এ যুদ্ধের পরে দুটি ঘটনা ঘটে – (১) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চিনের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার নাকচ করে, এবং (২) চার্লস আলেকজান্ডার ব্রুস, যিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে সফল এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে চা চাষ করা সম্ভব সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন। এরপরে আর বিশেষ সময় লাগেনি – আসাম ও সংলগ্ন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর চা চাষের সুরক্ষিত অঞ্চল। এর সাথে সাথে বদলে গেল এসব অঞ্চলের টোপোগ্রাফি, ডেমোগ্রাফি এবং খাদ্যাভ্যাস। এই ব্রুস সাহেবকে "ভারতে চায়ের জনক"ও বলা হয়।

একইসাথে বর্তমান বাংলাদেশের যশোর থেকে নদীয়া ও হুগলি হয়ে বর্ধমানে পৌঁছয় বেলেমাছি বা স্যান্ড ফ্লাই-বাহিত মারাত্মক রোগ কালাজ্বর (যদিও এ রোগটি যে বেলেমাছি বাহিত সে আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে)। তারপর আরও অগ্রসর হয়ে অল্পদিনের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং গারো পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে যায় এই রোগ

– পথে কোন জনপদ, গ্রাম বা লোকালয় এর হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

ইতিহাসে কুখ্যাত "বর্ধমান ফিভার" বস্তুত দুটি রোগের যুগপৎ আক্রমণে হয়েছিল। ব্রহ্মচারী ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এ প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর, ১৯১১) তাঁর গবেষণাপত্র "On the Nature of the Epidemic Fever in Lower Bengal Commonly Known as Burdwan Fever. (1854-75)"-এ দেখিয়েছিলেন – "It is thus evident that there was an epidemic of two diseases during the outbreak of Burdwan fever. The severe cases described by French were mostly cases of malaria (probably malignant tertian fever), while those that constituted the large majority of cases observed by Jackson were cases of Kala-azar."

১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর A Treatise on Kala-azar গ্রন্থে ব্রহ্মচারী জানাচ্ছেন – "কালা-আজার নামটি যদিও বহুল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যথোপযুক্ত নয়। এ নাম দিয়ে বোঝানো হয় যে এক বিশেষ ধরনের জ্বরে ত্বকের রঙ কালো হয়ে যায়। এজন্য অনেকেই মনে করেন একে "কালা-জ্বর" বলা উচিত।"

অঞ্চলভেদে কতভাবে এর নামের ভিন্নতা ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করেন তিনি। ১৮২৪-২৫-এ যশোরে যখন এ রোগের প্রকোপ দেখা যায় তখন একে "জ্বর-বিকার" বলা হত। এরই অন্যান্য নামগুলো হল – "দমদম জ্বর", "সাহেবদের রোগ", "সরকারি অসুখ", "কালা-দুঃখ", "কালা-হাজার" "আসাম ফিভার", ponos (Greece), semieh (Sudan), malattia de menssa (Sicily) ইত্যাদি। এসব থেকে কালাজ্বরের পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। জলপাইগুড়িতে একে বলা হত "পুষ্করা" আর আসামের মানুষ একে বলতো "সাহেবদের রোগ"।

যাহোক, আসামের সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চা বাগান তৈরি হল, "সাহেবদের রোগ" ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো স্থানীয় অধিবাসী এবং চা বাগানের কুলি তথা শ্রমিকদের মাঝে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে লাগলো এই ব্ল্যাক ডেথ বা কৃষ্ণ মৃত্যুর থাবায়। তখন আড়কাঠিদের দিয়ে ছোটনাগপুর অঞ্চলে থেকে দরিদ্র, ভুখা মানুষদের নিয়ে আসা হল চা বাগানের কুলি হিসেবে। চা বাগান তৈরির মধ্য দিয়ে আগেই আসাম এবং গারো পার্বত্য অঞ্চলের টোপোগ্রাফি পরিবর্তিত হয়েছিল। এবার নতুন করে ডেমোগ্রাফির পরিবর্তন শুরু হল। আরেকটা পরিবর্তন হল – আসামের মানুষের মাঝে চা পানের অভ্যেস তৈরি করে দেওয়া হল। পরিবর্তন হল পানাভ্যাসেরও। ৩,৫০,০০০-এর বেশি মানুষ এ রোগে মারা গিয়েছিল। আবার কোন কোন হিসেবে এ সংখ্যা ২৫ লক্ষও হতে পারে। এ রোগে সেসময়ে মৃত্যুহার ছিল ৯০%।

উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এক গভীর সংকটের মুখে পড়লো – মানুষ তথা চা বাগানের কুলিদের মৃত্যু আটকানো না গেলে চা উৎপাদন হবেনা, মুনাফায় ঘাটতি পড়বে। আবার বিজ্ঞানীদের কাছে দুটি প্রশ্ন এলো – (১) এ রোগ কিভাবে হয়? বাহক কে? (২) মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যাবে কিভাবে। মেরি গিবসন তাঁর "The Identification of Kala-azar and the Discovery of *Leishmania donovani*" গবেষণাপত্রে জানাচ্ছেন – "In the years following 1858, when the British government formally assumed power over the whole of British India, the government of Bengal became concerned by reports of an epidemic of quinine-resistant fever occurring in the district of Burdwan in Lower Bengal. The mortality was so great that the population, the productivity of the land, and consequently the government **revenue were greatly diminished**."

এক অদ্ভুত সমাপতন ঘটলো – সাম্রাজ্যবাদ চায় মুনাফার জন্য কুলিদের বাঁচিয়ে রাখতে, এবং বিজ্ঞান চায় একটি মানুষেরও যেন মৃত্যু না ঘটে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সে লক্ষ্যে তাদের সমস্ত শ্রম ঢেলে দেন। উপনিবেশিক শাসকেরা তার সুফলটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এটা বিজ্ঞানের ট্র্যাজেডি। শুধু তাই নয় একটি "মেডিক্যাল-স্টেট-পলিটিক্স কমপ্লেক্স" গড়ে ওঠে। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির যূপকাষ্ঠে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা বলি প্রদত্ত হন।

এর ভালো উদাহরণ দেখা যাবে ১৮৬৭-পরবর্তী উপনিবেশিক ভারতের কলেরা পলিসির ক্ষেত্রে। সুয়েজ খাল চালু হবার পরে কলেরা রোগী থাকলে জাহাজ শুদ্ধ কোয়ার‍্যান্টাইনে থাকা আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু এতে ইংরেজের মুনাফায় ঘাটতি পড়ছিল। এজন্য কলেরার সংজ্ঞা বদলে দেওয়া হল, কলেরা ছড়ানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রাহ্য ধারণাকেও আক্রমণ করা হল, অস্বীকার করা হল। এ ব্যাপারে অনবদ্য সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন শেল্ডন ওয়াটস তাঁর "From Rapid Change to Stasis: Official Responses to Cholera in British-Ruled India and Egypt: 1860-1921" (*Journal of World History*, Vol. 12, No. 2 (Fall, 2001), pp. 321-374)। তাঁর পর্যবেক্ষণে – "To maintain general amnesia, they silenced critics at the Royal Army Medical College at Netley who knew what the score was. They kept inconvenient documentary evidence, written before the policy change, under wraps and in some cases may have destroyed it." **আরেকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ চিকিৎসক অ্যান্ড্রু ডানকান তাঁর "A Phase in the History of Cholera in India"** (১৯০২ সালে **এডিনবার মেডিক্যাল জার্নাল**-এ প্রকাশিত) প্রবন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই বিপজ্জনক প্রবণতার বর্ণনা দিয়েছেন। "মেডিক্যাল-স্টেট-পলিটিক্স কমপ্লেক্স"-এর এর চাইতে ভালো উদাহরণ আর কি আছে?

১৮৬৭-৬৮ পরবর্তী সময়ে ভারতে কলেরা গবেষণার ক্ষেত্রে "পলিসি রিভার্সাল" বা নীতির আপাদমস্তক পরিবর্তনের ফলে শুধু কলেরা সংক্রান্ত গবেষণা নয়, সব শাখার স্বাধীন গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনিতেই পুঁজি এবং বাণিজ্যের প্রয়োজন ছাড়া অন্য বিষয়ে গবেষণায় উপনিবেশিক ভারতে উৎসাহ দেওয়া হত এমন নয়। এই সময়ের পরে তা আরও কমে যায়। এমনকি খোদ সাদা চামড়ার সাহেব রোনাল্ড রস তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের আমলাতন্ত্র বিভিন্ন পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে ব্রহ্মচারী "রাজভক্ত" ছিলেন কিনা (যে প্রশ্ন সম্প্রতি এক গবেষক তুলেছেন) এরকম এক প্রেক্ষিতে খুব জরুরি ছিলনা। অধিকতর জরুরি ছিল একজন কালা মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে যত যোগ্যতাই অর্জন করুন না কেন তিনি উপনিবেশিক বিজ্ঞানের আমলাতন্ত্রের সাথে কতটা লড়াই করে উঠতে পেরেছেন এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের জগতের ঘাঁৎঘোঁৎ ভালো বুঝতেন কিনা।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আমরা তার মাঝে খুঁজে দেখতে পারি অন্যভাবে। তাঁর নাম দুবার – ১৯২৯ এবং ১৯৪৬ – নোবেলের তালিকায় নমিনেশন পাওয়া সত্ত্বেও কেন নোবেল পুরস্কার পেলেন না। আর প্রথম ক্ষেত্রে এটা জেনে রাখা ভালো ইন্ডিয়া রিসার্চ ফান্ড থেকে অনুদান পাওয়ার দরুণ তাঁর আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামিনের বাজারে আসা সহজ হয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের (বর্তমানের নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) যে ঘরে এই অসম্ভব গবেষণাকর্মটি করেছেন সেটা আয়তনে জেলের একটা সেলের সাইজের বেশি কিছু ছিল না। তাঁর নিজের কথায় – "I recall with joy that memorable night in the Calcutta Campbell Hospital at Sealdah, where after a very hard day's work I found at about 10 o'clock that the results of my experiments were up to my expectations. But I didn't know then that providence had put into my hands a wondrous thing and that this little thing would save the lives of millions of my fellowmen. I shall never forget that room where Urea Stibamine was discovered. **The room where I had to labour for months without a gas point or a water tap and where I had to remain contented with an old kerosene lamp for my work at night**. To me it will ever remain a place of pilgrimage where the first light of Urea Stibamine dawned upon my mind." তাঁর গবেষণাকক্ষে কোন গ্যাসের সংযোগ ছিলনা, ছিলনা বিদ্যুৎ সংযোগ, এমনকি ট্যাপ ওয়াটারের সরবরাহও নয়। একটি পুরনো কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাত্রিবেলা কাজ করতেন আবিষ্কারের অদম্য আকাঙ্খায়।

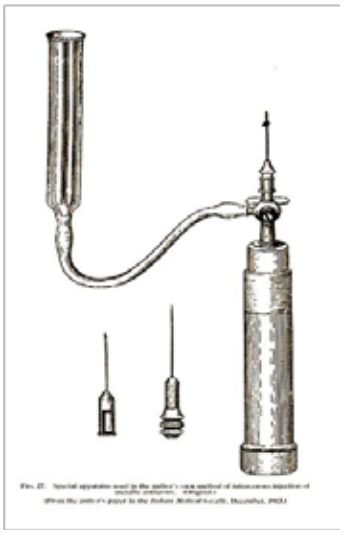

(যে ঘরে গবেষণা করতেন এবং ডানদিকে যে যন্ত্র দিয়ে রোগীদের দেহে ইউরিয়া স্টিবামিন ইঞ্জেকশন দিতেন)

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

যাঁদের ব্রহ্মচারীর মতো জীবন যাপন তাঁদের উপাধি হয় ব্রহ্মচারী। একটি কম সমর্থিত মত হল যে কেশবচন্দ্র ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন তাঁর বড়দাদা গোপালচন্দ্র ভারতী দীক্ষার পরে নিজেদের মুখোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী উপাধি গ্রহণ করেন। এদের নবম বা দশম বংশধর হচ্ছেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

এক অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারী এই মানুষটির গ্র্যাজুয়েশন ১৮৯৩ সালে হুগলি মহসিন কলেজ থেকে – অংক এবং কেমিস্ট্রি নিয়ে ডাবল অনার্স, Thysetes মেডেল পান। এরপরে ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কেমিস্ট্রিতে এমএ পাশ, সাথে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ। একই সময়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এলএমএফ ডিগ্রি পান ১৮৯৯ সালে। ১৯০০ সালে এমবি ডিগ্রি – মেডিসিন এবং সার্জারি দুটিতেই প্রথম হয়ে গুডিভ এবং ম্যাকলিওডস মেডেল পান। ১৯০২ সালে এমডি পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপরে ১৯০৪ সালে পিএইচডি অর্জন। বিষয় ছিল "Studies on Haemolysis"। তাঁর পিএইচডির থিসিসের সংক্ষিপ্ত এবং উন্নত চেহারার নতুন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় বায়োকেমিক্যাল জার্নাল-এ ১৯০৯ সালে "Some Observations on the Haemolysis of Blood by Hypoosmotic and Hyperosmotic Solutions of Sodium Chloride" শিরোনামে। এছাড়াও ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন থেকে Mente মেডেল এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উইলিয়াম জোন্স মেডেল লাভ করেন।

পরবর্তী সময়ে প্রায় সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে গবেষণার নির্ভুল লক্ষ্যে। প্রায় ১৫০টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে *নেচার, ল্যান্সেট,*

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, বায়োকেমিক্যাল জার্নাল, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ বা *ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট*-এর মতো জার্নালগুলোতে।

১৯০৩ সালে ৩ মাসের ব্যবধানে দুটি ঘটনা ঘটলো। ৩০ মে, ১৯০৩-এ ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হল রয়্যাল আর্মি মেডিক্যাল কলেজের (নেটলে) প্রফেসর লিশম্যানের গবেষণাপত্র "On the Possibility of Occurrence of Trypanosomiasis in India"। ভারত থেকে "দমদম জ্বর" নিয়ে আগত এক ব্রিটিশ সৈন্যের প্লীহা থেকে ম্যালেরিয়া থেকে ভিন্ন একধনের পরজীবী দেখতে পেলেন। "In July 1903, Donovan reported the finding of similar bodies from the spleen of patients suffering from prolonged fever with splenomegaly in Madras (now Chennai)." রোনাল্ড রসের মতো নোবেলজয়ী ব্যক্তিত্ব লিশম্যান এবং ডোনোভান দু'জনের আবিষ্কারকেই সম্মান জানিয়ে এই নতুন পরজীবীর নাম দেন *Leishmania donovani*। ব্রহ্মচারী যখন পিএইচডি করছেন তখন এই আবিষ্কারগুলো হচ্ছে।

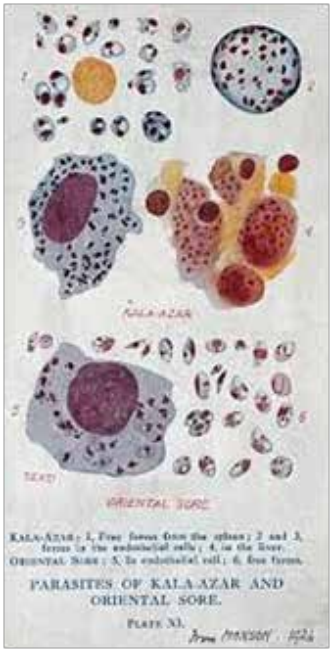

১৯০৬ সালে ব্রহ্মচারী একটি গবেষণাপত্র লেখেন "On a Contribution to the study of Fevers due to Leishman-Donovan Bodies" (সি পি ঠাকুর, "হিস্টরি অফ কালা-আজার", WHO থেকে প্রকাশিত)। পরজীবী তো আবিষ্কার হল। কিন্তু একে মারা যাবে কি করে? এ হল তখন গবেষকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ৩০ মে, ১৯০৮, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হল তাঁর গবেষণাপত্র – "Sporadic Kala-azar in Calcutta with Notes of a Case Treated with Atoxyl"। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল – "So far as my observations go, no drug can kill the parasites. I have used the following drugs without success: (1) Quinine internally; (2) quinine hypodermically; (3) fluorides; (4) arsenic and some of its new preparations, such as sodil cacodylas, arrhenal, and atoxyl; in some cases arrhenal and sodil cacodylas were given hypodermically; (5) methylene blue internally; (6) methylene blue hypodermically; (7) Izal in increasing doses; (8) cyllin in increasing doses up to half a drachm* thrice a day." অর্থাৎ, সঠিক ওষুধটি তখনও অধরা। Atoxyl হল প্যারা-আরসেনিলিক অ্যাসিডের মনোসোডিয়াম সল্ট। সিফিলিস এবং স্লিপিং সিকনেসসের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আগে হয়েছে। কিন্তু অনেক বিপজ্জনক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছিল। এছাড়া আরেকটি ওষুধ নিয়ে তখন বেশ সোরগোল পড়েছিল – টার্টার এমেটিক বা অ্যান্টিমনিল পটাশিয়াম টার্টারেট। [*1 drachm=60 grains]

কিন্তু সবমিলিয়ে সম্মিলিত ফলাফলে ব্রহ্মচারী সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। ১৯০৯-১০-এ বিশ্রুত বিজ্ঞানী পল আর্লিখ সিফিলিসের ওষুধ সালাভার্সান বা "ম্যাজিক বুলেট" আবিষ্কার করলেন। সালাভার্সান ছিল আর্সেনিকের যৌগ আর্সেফেনামিন। বলা হয় সালাভার্সান আবিষ্কারের সাথে সাথে কেমোথেরাপির যুগ শুরু হল।

তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সেসময়ে কালা জ্বরের জন্য চালু কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতেই তিনি পূর্ণত সন্তুষ্ট হননি, ভরসাও রাখতে পারেননি। ১৯১৩ সালে ব্রাজিলের চিকিৎসক গাস্পার ভায়ানা টার্টার এমেটিক (অ্যান্টিমনিল টার্টারেটের পটাশিয়াম সল্ট) দিয়ে চেষ্টা করছিলেন। ১৯১৫ সালে সিসিলিতে ক্রিষ্টিয়ানা এবং কর্টিনা টার্টার এমেটিকের সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন। কলকাতায় লিওনার্ড রজার্সও (স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন-এর তৎকালীন সময়ে সর্বময় কর্তা) টার্টার এমেটিকের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী চিকিৎসকেরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন টার্টার এমেটিকের দীর্ঘকালীন ব্যবহারে মারাত্মক সব ক্ষতিকারক দিক আছে। ব্রহ্মচারী ক্রমাগত অসন্তোষে ভুগছিলেন। যদি পটাশিয়ামের পরিবর্তে সোডিয়াম সল্টও ব্যবহার করা যায় তারও ক্ষতিকারক দিক যথেষ্ট।

ব্রহ্মচারীর মাথায় আসে আর্সেনিক এবং অ্যান্টিমনি পর্যায় সারণিতে একই গ্রুপে রয়েছে। এবং দুটি মৌলের ক্ষেত্রে রাসায়নিক ও বায়োলজিক্যাল চরিত্রে অনেক মিল আছে। তিনি এবার অ্যান্টিমনি দিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। প্রথমে পাউডার তৈরি করে, পরবর্তীতে অ্যান্টিমনির কোলয়ডিয় (colloidal) দ্রবণ তৈরি করে। সফল হলেন। তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ল্যান্সেট পত্রিকায় (অক্টোবর ২১, ১৯১৬) "The Preparation of Stable Colloidal Antimony" শিরোনামে। তিনি জানালেন – "The remarkable trypanocidal properties possessed by antimony, its specific action against the Leishmania, and the fact that in

মিশন ইউরিয়া স্টিবামিন

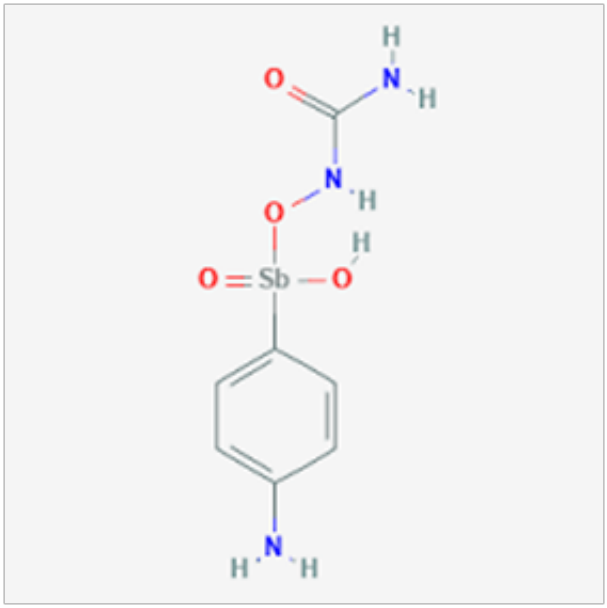

the colloids generally the ratio dosis curativa : dosis tolerata is very low, make it desirable to prepare a stable solution of colloidal antimony." তাঁর শেষ কথা ছিল – "The colloid obtained in this way seems to be a very stable substance, and in this respect differs from the Svedberg's colloid. The therapeutic use of the colloidal metallic antimony has already been described in the Indian Medical Gazette (May, 1916) Further observations on the **use of this drug in the same disease have shown similar beneficial results**."

শেষ বাক্যটি খেয়াল করলে বুঝবো যে আজকের যুগের ফেজ ১ ট্রায়ালের ছায়া তাঁর পরীক্ষায় ধরা আছে। এই গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছিলেন।

এরপরে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এ ১৯২২ সালে "Chemotherapy of Antimonial Compounds in Kala-azar Infection" শিরোনামে। এখানে প্রতিটি যৌগের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। দেখালেন ইউরিয়া স্টিবামিন (carbostibamide) সবচেয়ে কার্যকরী, ফলদায়ক এবং কম সময়ে সুস্থ করে তোলে।

১৯৮৬ সালে *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* *জার্নালে ফিলিপ মার্সডেন "The Discovery of Urea Stibamine"* (এপ্রিল-জুন, ১৯৮৬) *শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখান থেকে খানিকটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্রহ্মচারীর কাজকে চুম্বকে ধরতে সাহায্য করবে* – "He first synthesised several new inorganic antimonials and achieved some treatment success with colloidal metallic antimony which was taken up by the reticulo endothelial system. Dissatisfied with these results however he turned his attention to organic aromatic antimonials inspired by the idea that an antimonial having a constitution similar to atoxyl (which was found by Ehrlich to be effective in sleeping sickness) might prove useful in kala-azar. In 1919 supported by the Indian research fund he prepared P-Stibanilic Acid and various salts. In 1920 by heating Stibanilic Acid with urea he produced the first organic antimonial to achieve wide acceptance as a treatment for human leishmaniasis namely urea stibamine. The reason for this choice was that urea in combination with certain drugs reduces the pain on injection. Both Brahmachari and Shortt of the Indian Medical Service **found this drug to be extremely effective and safe in the treatment of kala-azar**."

(বাঁ দিকে, চিকিৎসার আগে এবং পরে কালা জ্বরের রোগীর মুখমণ্ডল।)

এবার এই ওষুধের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হল আসামে – চা বাগানে, গ্রামে-গঞ্জে, লোকালয়ে এবং অন্যত্র। *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল*-এ (৪ মে, ১৯২৯) "Preventive Medicine in Assam" শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হল – "In June, 1927, universal or mass treatment of all kala-azar patients with urea stibamine was inistituted consequent on a marked reduction having been effected in the cost of this preparation; previously only 10 per cent of the patients had been so treated, the remainder having received the less effective **sodium in antimony tartrate**. **The change of treatment resulted at once in a most gratifying**

ডানদিকে, রোগের ফলে একেবারে শীর্ণ দশা - cachexia)

increase of cures and a more regular attendance of patients at treatment centres."

১৯৩২ সালে সরকারি কালা-জ্বর কমিশনের ডিরেক্টর এইচ ই শর্ট বললেন – "We found Urea Stibamine an eminently safe and reliable drug and in seven years we treated some thousands of cases of Kala-azar and saw thousands more treated in treatment centers. The acute fulminating type characteristic of the peak period of an epidemic responds to treatment **extraordinarily promptly** and with an almost dramatic cessation of fever, diminution in the size of spleen and return to normal condition of health." এরসাথে মাথায় রাখতে হবে ইউরিয়া স্টিবামিন ব্যবহারের আগে যেখানে মৃত্যুহার প্রায় ৯০% ছিল, এ ওষুধ ব্যবহারের পরে তা বদলে গিয়ে সুস্থতার হার ৯০%।

ওষুধের পেটেন্ট এবং বিপণন

ভারতীয়দের (অন্তত সেসময়ের একদিকে জাতীয়তাবাদী প্রভাব, অন্যদিকে প্রাচীন সমাজের প্রভাবে) মধ্যে আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঔদাসিন্য লক্ষ্য করা যায়। জগদীশ বসু এর প্রোজ্জ্বলন্ত উদাহরণ। এর জন্য নোবেল প্রাইজ থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন। ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রেও কমবেশি একই কথা প্রযোজ্য। ওষুধের

পেটেন্ট নিলেন না বা আদৌ গা করেননি। এর ফলে বিভিন্ন কোম্পানি এরকম ফলদায়ী ওষুধ নিয়ে নিজেদের মতো করে বানিয়ে (ব্রহ্মচারীর ফর্মুলা অনুযায়ী নয়) বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। এরকম একটি কোম্পানি ছিল ইউনিয়ন ড্রাগ কোং। হাই কোর্ট অব্দি মামলা গড়ায়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এ (জুন, ১৯১৬) প্রকাশিত হয় "Urea Stibamine" শিরোনামে। এর প্রতিবেদনে বলা হয় – "**he gave the process of manufacturing to the world**, but reserved the name 'Urea Stibamine' as a fancy or trade designation, for his own private manufacture and share of the drug." এখানেই ইউরো-আমেরিকান বাণিজ্য বুদ্ধির সাথে ভারতীয়দের পার্থক্য। শেষ অব্দি হাই কোর্টের বিচারপতি সি সি ঘোষের রায়ে ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ স্বত্ব পান। বাথগেট কোম্পানিকে দেন ওষুধ বিক্রির অধিকার।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য। পূর্বোল্লেখিত কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিনের সর্বময় কর্তা সাদা চামড়ার শাসক লিওনার্ড রজার্স কালা চামড়ার উচ্চতর মেধাকে স্বীকার না করতে পারার জন্য ক্রমাগত ব্রহ্মচারীর বিরোধিতা করে গেছেন – কি গবেষণার ফলাফল নিয়ে, কি আন্তর্জাতিক দরবারে গবেষণাকে লঘু করে। এমনকি রজার্সের তীব্র বিরোধিতা ছিল অন্যতম একটি কারণ যে জন্য ব্রহ্মচারী রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবেও নির্বাচিত হতে পারেননি।

উল্লেখ করা দরকার কালাজ্বর, কলেরা, স্মল পক্স ইত্যাদি একের পর এক মহামারির মুখোমুখি হওয়া উপনিবেশিক এবং বিজ্ঞানের কেন্দ্র লন্ডনের মেডিক্যাল থিওরির মাঝে প্রতিসরণ ঘটেছে – উভয়ত। কেন্দ্র দ্বারা অনুমোদিত হলে তবেই সেটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে। এখানেই বিরোধ বেঁধেছিল উপনিবেশিক কেন্দ্রের প্রতিনিধি রজার্সের সাথে প্রান্তের বিজ্ঞানী ব্রহ্মচারীর।

অ্যালান বিউয়েল তাঁর *Romanticism and Colonial Disease* গ্রন্থে বলছেন – "There was a mutual refraction of colonial and metropolitan medical theory. The framing of "tropical disease" was thus not easily separated from the framing of the diseases of the urban poor"। অর্থাৎ, উপনিবেশের মেধাকে "অপর" এবং "আপদ" হিসেবে দেখা নিজেদের দেশের শহরের গরীবদের "অপর" দেখার মাঝে সঙ্গতি ছিল।

যাহোক, *নেচার* জার্নালে (ডিসেম্বর ১৬, ১৯৩৯) লিওনার্ড রজার্সের (যিনি ফেলো অফ রয়্যাল সোসাইটি ছিলেন) একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল "The Antimony Treatment of Kala-azar" শিরোনামে। এ প্রতিবেদনে অনেক তথ্যের মাঝে একবার ছুঁয়ে যাওয়া হল যে "The first of these was introduced (and **patented**) by Dr. U. N. Brahmanchari in Calcutta in 1921, under the name of urea stibamine. This proved less toxic and more effective, and it enabled more than 90 per cent of cases to be cured by intravenous injections within a few days"। আজকের অ্যাকডেমিক পরিভাষায় একে বলা হয় relativization – অর্থাৎ, কোন উপায়ে মূল বিষয়কে লঘু করে দেওয়া। এ প্রতিবেদনেই পরে লিখলেন – "according to Napier, who in 1925 found a course of stibosan to cost £2 *5s.* and one of urea stibamine £3 – a prohibitive sum for poor villagers in India."

মনে হয় দুরভিসন্ধি থেকে দুটি ভুল বা মিথ্যে তথ্য আন্তর্জাতিক গবেষক মহলে তুলে ধরলেন রজার্স – (১) ইউরিয়া স্টিবামিনকে "পেটেন্টেড" বললেন, যা কখনই ছিল না, এবং (২) ইউরিয়া স্টিবামিনের প্রতিটি ডোজের খরচ সেসময়ের হিসেবে ৩ পাউন্ড বলে দেখালেন।

এরপরে *নেচার*-এ (এপ্রিল ৬, ১৯৪০) পত্রিকার তরফে প্রকাশ করা হল একটি ছোট রিপোর্ট "Antimony Treatment of Kala-azar" শিরোনামে। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হল হল "He (Brahmachari) states that, contrary to Sir Leonard Rogers' statement, **urea stibamine was not patented**." আরও বলা হল – "Sir Leonard Rogers stated in his article that a course of treatment with urea stibamine cost £3 in 1925." কিন্তু বাস্তবে "Sir Upendranath states that urea stibamine is now supplied by the Government **at Rs. 1 per gram, and since 1·5 gm. is sufficient for complete cure, the total cost of the drug to-day is now Rs. 1. 8 (about 2s. 3d.)**." *নেচার*-এর উপসংহারে বলা হল – "Yet this cost is still relatively high for a country in· which the great majority of the population live dangerously near the starvation line, and there is still room for a rapidly effective and really cheap remedy for kala-azar."

আমরা শেষ বাক্যটি খেয়াল করলে বুঝবো সরকারের লক্ষ লক্ষ পাউন্ড মুনাফার জোগানদার শ্রমিকেরা এই রোগে উজাড় হয়ে গেলেও রাষ্ট্রের তরফে পাব্লিক হেলথের কোন প্রোগ্রাম উপনিবেশিক সরকারের তরফে ছিলনা। এরকম প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসার দায় রোগীর নিজের। আজকের ভারতবর্ষে সার্বজনীন টিকাকরণ নিয়ে রাষ্ট্রের তরফে যে পলিসি পঙ্গুতা তার মধ্যে কি সেদিনের কোন ছায়া আমরা দেখতে পাচ্ছি?

নেচার-এর সংবাদের অনেক আগে ডবল্যু এইচ গ্রে এবং জে ডবল্যু ট্রেভান-এর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় *Transactions of the Tropical Medicine and Hygiene*-এ (১৫ অক্টোবর, ১৯৩১)। সেখানে ব্রহ্মচারীকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় – "The first of them to achieve clinical success in India was "urea stibamine," prepared by BRAHMACHARI (1922) by the action of urea upon *para-amino*phenylstibinic acid (stibanilic acid). Its nature, however, was the **subject of controversy**." ওষুধটির পেটেন্ট না নেবার জন্য যে যার ইচ্ছেমতো উপাদানে অতি কার্যকরী ইউরিয়া স্টিবামিন তৈরি করে বাজারে আনে। একজন ভদ্রলোকের মতো ব্রহ্মচারী এর উত্তর দিয়েছিলেন *নেচার*-এ (জুন ২৯, ১৯৪০)। সেখানে তিনি বলেন–"the divergent results obtained by different investigators were due to the fact that various manufacturers put on the market so-called urea stibamine **which did not conform to my specifications**" ("Chemistry of Urea Stibamine")।

ওষুধটির পেটেন্ট না নেবার জন্য ওষুধটি বাজার থেকে হারিয়ে গেল। এখন আর এ ওষুধ তৈরি হয়না। শুধুমাত্র ওষুধ হারালো না হারিয়ে গেল জ্ঞানের জগতের একটি অনন্য শাখাও। অথচ এখনও ২০১৭ সালের হিসেব অনুযায়ী কালাজ্বর "neglected tropical diseases"-এর মধ্যে ২য় প্রাণঘাতী রোগ। ৭০টি দেশের ২ কোটি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত। ল্যান্সেট-এ ২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে – "An estimated 0·7–1 million new cases of leishmaniasis per year are reported from nearly 100 endemic countries." ("Leishmaniasis", আগস্ট ১৭, ২০১৮) *PLoS Tropical Neglected Disease*-এ প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে ৯৮টি দেশের ৩৫ কোটি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে আছে। ("Prevalence of *Leishmania* infection in three communities of Oti Region, Ghana", ২৭ মে, ২০২১) আরেকটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে প্রায় ৭০,০০০ মানুষ প্রতিবছর এ রোগে আক্রান্ত হয়।

বেদনা বিধুর নোবেল কাহিনী

১৯২৯ সালে নোবেলের জন্য ভারত থেকে নমিনেশন পেয়েছিলেন ব্রহ্মচারী। কিন্তু কে ছিলেন তাঁর প্রস্তাবক? প্রস্তাবক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক সুধাময় ঘোষ। আন্তর্জাতিক মহলে কে চেনে তাঁকে? ফলে ব্রহ্মচারী নোবেলের জন্য নির্বাচিত

হলেন না। কিন্তু নোবেলজয়ী সি ভি রমন আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং যোগাযোগের এই পরিসরটি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য ১৯৩০ সালে তিনি যখন নোবেল প্রাইজ পান তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ৬ জন আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানী। এঁদের মধ্যে নিলস বোর, রিচার্ড ফেইফার, ডি ব্রগলির মতো নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা ছিলেন। একই বছরে মেঘনাদ সাহা নমিনেশন পেয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাবক ছিলেন ডি এন বোস এবং শিশির মিত্র, যাদের আন্তর্জাতিক মান্যতা প্রায় কিছুই ছিল না। মেঘনাদ সাহাও নোবেল প্রাইজ পাননি।

ব্রহ্মচারীর গবেষণা ১৯২৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করেছিল। বিজ্ঞানের জগতে এ এক পরম প্রাপ্তি। আমরা যদি এর পাশে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য ১৯৯০ সালে নোবেলজয়ী জোসেফ মারের কথা স্মরণ করি তাহলে আরেকটু বোধগম্য হবে বিষয়টি। জোসেফ মারে কোন তাত্ত্বিক কাজ করেননি। ১৯৫৪ সালে পৃথিবীতে প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপন করেছিলেন। কয়েক কোটি মানুষের জীবন বেঁচেছে। সমধর্মী কাজ ব্রহ্মচারী করেও নোবেল থেকে বঞ্চিত। ১৯৪৬ সালেও ব্রহ্মচারী নমিনেশন পেয়েছিলেন। কিন্তু নোবেল জয় হয়নি।

অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ১৯৩৭ সালে তাঁকে নাইটহুড দেওয়া হয়।

The Imperial Society of Knights Bachelor

Know all men by these Presents that His Majesty's Secretary of State for the Home Department having notified unto this Society that on the First day of March One thousand nine hundred and thirty five, His Majesty was pleased to confer the Dignity of Knighthood upon

RAI BAHADUR UPENDRANATH BRAHMACHARI

সংযোজন

এপ্রিল, ১৯১১-তে এশিয়াটিক সোসাইটির মেডিক্যাল সেকশনে একটি পেপার পাঠ করলেন – "On the Nature of the Epidemic Fever in Lower Bengal Commonly Known as Burdwan Fever. (1854-75)" শিরোনামে। এই পেপারটি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট-এর সেপ্টেম্বর, ১৯১১ সংখ্যায় হুবহু প্রকাশিত হল। এখানে তাঁর নিজের যুক্তিবিন্যাস, বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক রিপোর্টের পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত হিসেবে জানালেন – "It is thus evident that there was an epidemic of **two diseases during the outbreak of Burdwan fever**. The severe cases described by French were mostly cases of **malaria** (probably malignant tertian fever), while those that constituted the large majority of cases observed by Jackson were cases of **Kala-azar**." অর্থাৎ "বর্ধমান ফিভার" প্রকৃত পক্ষে ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের যুগপৎ উপস্থিতির ফলে হয়েছে।

এই পেপারে তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ছিল – "The epidemiology of malaria seems, therefore, to have been closely connected with that of Kala-azar in the Burdwan epidemic. This fact is not purely of academic interest, but will be of greatest value to those who are concerned with the study of Epidemiology of Malaria in Bengal. **Whether there was a causal relationship between the two diseases is a subject of the greatest interest to the scientific enquirer**."

এখানেও তাঁর সিদ্ধান্তের ভরকেন্দ্রে থাকল মেডিসিনের গবেষণার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – (১) এই জ্বরের চরিত্র সঠিকভাবে শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক আগ্রহের জন্য নয়, ম্যালেরিয়ার এপিডেমিওলজি বোঝার জন্য প্রয়োজন, এবং (২) ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর এই দুটি রোগের আন্তঃসম্পর্ক বোঝা একজন বিজ্ঞান অনুসন্ধানীর কাছে সর্বোচ্চ আগ্রহের বিষয়।

এখানে যে বিষয়টি আমাদের ভাবায় তা হল, ১৯১৬ সালে ইউরিয়া স্টিবামিনের মতো আবিষ্কৃত হয়ে যাবার পরেও ক্ষণজন্মা অতুল প্রতিভাধর সুকুমার রায়ের চিকিৎসায় এ ওষুধ ব্যবহার করা হল'না কেন? সুকুমার রায় মারা যান ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩-এ। তাহলে কি চা বাগানের কুলিদের ওপরে যে ওষুধের প্রয়োগ অবিশ্বাস্য ফল দিয়েছিল, কয়েক হাজার মানুষকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, সে ওষুধ সেসময়ের কলকাতার 'এলিট' ডাক্তার এবং সমাজে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি? আমরা কি প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিতে চিরকালই পরাঙ্মুখ ছিলাম? অন্তত বাস্তব ইতিহাস তো সে কথাই বলে।

যাহোক, কলকাতায় প্রথম ব্লাড ব্যাংকের (পৃথিবীতে দ্বিতীয়) প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ – ১৯৩৯ সালে। তিনি ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি এবং সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের মতো সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীও ছিলেন। কলকাতা তথা ভারতে প্রথম ব্লাড ট্রান্সফিউসনের জনকও তিনি। কালাজ্বর ছাড়াও ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাক-ওয়াটার ফিভার, সেরেব্রোস্পাইনাল মেনিনজাইটিস, ডায়াবেটিস, সিফিলিস এবং ফাইলেরিয়াসিস নিয়ে গবেষণাকর্ম রয়েছে। তাঁর প্রায় ১৫০টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়কাল জুড়ে।

তাঁর জন্মের ১৫০ বছর পরে আমার মতো একজন সাধারণ নগণ্য চিকিৎসকের এ প্রবন্ধটি হল সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য – একজন অসামান্য আবিষ্কারকের সম্পূর্ণ বিস্মরণে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কালাজ্বরের গল্প এবং বরেণ্য বাঙালি চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক উপেন্দ্রনাথ

বাপ্পাদিত্য রায়

গল্পের শুরুঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অবহেলিত মনীষা; বিশিষ্ট চিকিৎসক, গবেষক ও বিজ্ঞান সাধক; কালান্তক কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কারক এবং বাংলার অত্যন্ত মেধাবী ও বরেণ্য সন্তান ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মের সার্ধ শতবর্ষে (১৮৭৩ – ১৯৪৬ খ্রি.) তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে একটি অকিঞ্চিৎকর গল্প।

চিকিৎসক পিতার কাছে অতীতের কালান্তক কালাজ্বরের নানারকম কাহিনী, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কালাজ্বরের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন অব্যর্থ ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার, আরেক বাঙালি মনীষা সুকুমার রায়ের কালাজ্বরে অকালমৃত্যুর কথা অনেকবার শুনলেও এম.বি.বি.এস. স্তরে সেভাবে কালাজ্বরের রোগী দেখার সুযোগ হয়নি। বরং এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে মেডিসিনে হাউসস্টাফশিপ করার সময়ে ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে কালাজ্বরের কয়েকজন রোগীকে দেখেছি। এরপর 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথে' ডি.পি.এইচ. করার সময় 'স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে' ক্লাস করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন কালাজ্বরের রোগীকে দেখি। চেন্নাইয়ের 'ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অফ এপিডেমিওলজি'-তে থাকার সময় আমরা বেঙ্গালুরুর 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স'-এ কালাজ্বর নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিয়ে সমৃদ্ধ হই। পরে পাটনার আর.এম.আর.আই. এম.এস. পরিদর্শনের সময় ওয়ার্ড ভর্তি কালাজ্বরের রোগী দেখতে পাই। আর সেখানে ইনস্টিটিউটের সামনে দেখতে পাই ডাঃ ব্রহ্মচারীর আবক্ষ মূর্তি।

চুম্বকে কালাজ্বরঃ কালাজ্বর একটি অবহেলিত ক্রান্তীয় রোগ (Neglected Tropical Disease) যার সাথে সরাসরি দারিদ্র, অপুষ্টি, সঠিক বাসস্থানের অভাব ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই রোগটি বিভিন্ন নামে মানব সমাজে ছিল ও আছে। দীর্ঘদিন এই রোগে ভুগলে গায়ের ত্বকের রং কালো হয়ে যায় সেই কারণে আমাদের অঞ্চলে কালো জ্বর, আর সেখান থেকেই বোধহয় কালাজ্বর (Black Fever বা Kala–azar) নামটি এসেছে। বিশ্বে ৯৮ টি দেশে কালাজ্বর পাওয়া যায় যার মধ্যে ভারতে রোগীর সংখ্যা সবচাইতে বেশি। তারপর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার আরও ১২ টি দেশে। কালাজ্বরের বৈজ্ঞানিক নাম Leishmaniasis। ভারতের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং নেপাল ও বাংলাদেশে Visceral Leishmaniasis (VL) ও Post Kala-azar Dermal Leishmaniasis (PKDL); পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাতে Cutaneous Leishmaniasis (CL) এবং রাজস্থানে Mucocutaneous Leishmaniasis (MCL) দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রা বিশেষত

তাদের সৈন্যরা যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ক্রান্তীয় সংক্রামক রোগগুলিতে আক্রান্ত হত তার অন্যতম ছিল কালাজ্বর। সেই সময় গঙ্গা – ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সাথে শ'য়ে শ'য়ে সৈন্য কালাজ্বরে ভুগত। মৃত্যু হার ছিল ৯০ %। অসমের চা বাগান, অবিভক্ত বাংলার যশোর ও বর্ধমান জেলা, দমদমের সৈন্য ব্যারাক, ওড়িশা প্রভৃতি ছিল কালাজ্বর সংক্রমণের একেকটি কেন্দ্র।

কালাজ্বরের কারণ অনুসন্ধান ও ওষুধ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান মিলিটারি সার্ভিসের ব্রিটিশ চিকিৎসকরা নিরন্তর গবেষণা চালাচ্ছিলেন। জানা গেল বুনো জন্তু, শেয়াল, কুকুর, ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি কালাজ্বরের জীবাণুর, যা এক ধরনের আদ্যপ্রাণী বা Protozoa, ধারক (Reservoir)। *Phlebotomous argentipes* নামক এক ধরনের ক্ষুদ্র বেলে মাছি (Sand Fly) এর বাহক (Vector)। এই নিশাচর রক্তভুক বেলে মাছিরা মাটির ঘর ও গোয়াল ঘরের মেঝে ও দেওয়ালের ফাটলে থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে। তারা লাফিয়ে চলে এবং ৫০ থেকে ১০০ মিটার অবধি যেতে পারে। তাদের কামড়ের মাধ্যমে প্রোটোজোয়ার Flagellated Promastogotes form মানুষের দেহে প্রবেশ করে Reticulo - endothelium System-কে গ্রাস করে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলে। Macrophage এর মধ্যে জীবাণু গুলি Amastogote form-এ থেকে যায়। রক্তের লোহিত ও শ্বেত কণিকা কমে যায়। জীবাণুর শরীরে প্রবেশ থেকে পূর্ণাঙ্গ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে (Incubation Period) এক থেকে চার মাস কখনও কখনও এক বছর লাগে। প্রবল জ্বর, লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ, দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ, রক্তাল্পতা, যকৃত ও প্লীহার বৃদ্ধি, অপুষ্টি, ওজন হ্রাস, ত্বকের রঙের

কালচে পরিবর্তন ইত্যাদি VL কালাজ্বরের উপসর্গ (Symptoms) ও লক্ষণ (Signs)। ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে হৃদপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গে জটিলতা ঘটিয়ে মৃত্যু হয়।

১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডাঃ লিশম্যান এবং ডাঃ ডোনোভান পৃথকভাবে প্রোটোজোয়াটি আবিষ্কার করায় সেটির নামকরণ হয় *Leishmania donovani* । ওই সার্ভিসের ডাঃ রোনাল্ড রস, যিনি ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরষ্কার পান, গবেষণা চালিয়ে লিশম্যান ও ডোনোভানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা চালিয়েও ব্রিটিশ চিকিৎসক গবেষকরা কালাজ্বরের কার্যকর ওষুধ বের করতে পারছিলেন না। ইতিমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চার বছর শিক্ষকতা করে ডাঃ ব্রহ্মচারী কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ) যোগ দিয়েছেন। পরাধীন দেশের যাবতীয় ঔপনিবেশিক অবহেলা ও বাধা এবং ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবের মধ্যেও তিনি একটি ছোট ঘরে সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন যৌগ কাজে লাগিয়ে তিনি কালাজ্বরের কার্যকর ওষুধ বের করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। অবশেষে ১৯১৬-তে প্রস্তুত করলেন Urea stibamine (Carbostibamide)। এখানে ঠিকমত পরীক্ষা করারও সুযোগ ছিল না, যেতে হল অসমের চা বাগানের 'কুলি কামিনদের' বস্তিতে। ১৯২০ নাগাদ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন অব্যর্থ ওষুধের আংশিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। কারণ ব্রিটিশরা একজন নেটিভ ডাক্তারের আবিষ্কার মেনে নিতে পারছিল না। অথচ তাঁর ওষুধ ছিল ৯০ % কার্যকর এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে তুলল। হিমালয়ের ওপারে চিনেও তাঁর ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা শুরু হল। ১৯২২ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন Dermal Leishmaniasis (এখন যাকে PKDL বলা হয়)। এই কালজয়ী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষকের প্রসঙ্গে পরে আসছি।

গল্পের পরের অংশঃ জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিগুলির প্রাথমিক সাফল্যের পর শিথিলতার কারণে গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ –'৯১ থেকে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তর প্রদেশের ৫৪ টি প্রাদুর্ভাবপূর্ণ (Endemic) জেলাকে নিয়ে কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০০০-এ ভারত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (MDG)'-এ স্বাক্ষর করে। ২০০২-তে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (NHP)' এবং দশম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০৭ এর মধ্যে দেশে কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণের (১০ হাজার জনসংখ্যায় এক জনের কম রোগী) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরে অবশ্য তা ২০১১ ও ২০১৫-তে দু-বার বর্ধিত হয়। ২০০৩-এ কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি 'ন্যাশনাল ভেক্টর বোরন ডিজিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (NVBDCP) ' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। GFATM অর্থ সাহায্য করে। ২০০৫-এ NVBDCP 'ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন (NRHM)' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এদিকে ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজ করে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেই। বালুরঘাট শহরের জেলা লাইব্রেরির একতলার একটি অংশে তখন জনস্বাস্থ্য বিভাগ। একদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যালেরিয়া অফিসার রাজ্যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকার একটি দলিলে কালাজ্বর নির্মূলের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন। কালাজ্বরের Nil রিপোর্ট দেখে একজন প্রবীণ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আমায়

বললেন, " আপনাকে অনেক কালাজ্বরের কেস দেখাতে পারি "।

পরদিন সকালেই তাঁকে আমাদের জিপে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে আমরা গেলাম বালুরঘাট ব্লকের খাঁপুর গ্রামে। এই সেই ঐতিহাসিক গ্রাম যেখান থেকে অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলার তেভাগা কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে হত কৌশল্যা কামারিনি, হোপাই মারডি, চিয়ার শাই শেখ প্রমুখ ২১ জন শহিদ কৃষক যোদ্ধার অবহেলিত শহিদ বেদী চোখে পড়ল। সেখানে প্রণাম জানিয়ে প্রথমে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসকের সাথে কথা বলে একজন অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ওই গ্রাম

ও আশপাশের গ্রামের সম্ভাব্য বাড়িগুলিতে গেলাম। আমাদের হাতে ততদিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র চলে এসেছে – rK 39 Rapid Diagnostic Kit। অ্যালডিহাইড টেস্টের মত দীর্ঘসুত্রী ও অত্যধিক ফলস পজিটিভ রেজাল্ট সম্পন্ন কিংবা Splenic বা Bone Marrow Aspiration এর মত চরম বেদনাদায়ক নির্ণয় পদ্ধতির বিপরীতে এটি আঙ্গুলে সামান্য খোঁচা দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা। সন্ধ্যেয় ফেরার আগে ক্লিনিকালি পজিটিভ কেসগুলির মধ্যে থেকে পাঁচটি কেস কে rK 39 দিয়ে কনফার্মড করা গেল। এরপর বালুরঘাট বিমানবন্দরের পাশে একটি চার্চের ফেইথ হিলিং সেশানে আদিবাসী সমাবেশে বেশ কয়েকটি কালাজ্বরের কেস পেলাম। মিশনারি অফ চ্যারিটি হাসপাতালের সিস্টার কমলা, যিনি নিজে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা একজন MD গাইনোকলজিস্ট, অনেকগুলি রোগীর সন্ধান দিলেন। অন্যান্য অঞ্চল থেকে, বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে প্রচুর কেস নির্ণয় হচ্ছিল। প্রথম PKDL রোগীর সন্ধান পেলাম গঙ্গারামপুর ব্লকের একটি গ্রামে। জেলা হাসপাতালের একমাত্র ডারমাটলজিস্ট ডাঃ

ব্যানার্জী খুবই সাহায্য করলেন। রোগীকে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে উনি Sponge Biopsy করে Skin smear এর স্যাম্পেল দিলেন। জেলায় কোন ব্যাবস্থা নেই, সেটি মালদার একটি নামী প্রাইভেট ল্যাব-এ পাঠানোর পর তাতে LD Bodies পাওয়া গেল।

এরমধ্যে খাসপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দ্বিতীয় মেডিকেল অফিসার ডাঃ শেঠ একটি কাণ্ড করে বসলেন। একদিন রাতে ফোনে জানালেন যে একটি আড়াই মাস ধরে জ্বরে ভোগা পাঁচ বছরের ওঁরাও মেয়েকে ওর ঠাকুমা ভর্তি করেছেন। এর আগে মেয়েটি জেলা হাসপাতালে ও একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিল। অনেক পরীক্ষা করেও কোন Diagnosis করা যায়নি, PUO (Pyrexia of Unknown Origin অর্থাৎ অজানা জ্বর) লিখে রেফার করা হয়েছিল। অনেকরকম Antibiotics দিয়েও জ্বর কমানো যায়নি। খুব দুর্বল, Severe Anaemia এবং Hepato-splenomegaly রয়েছে। ডাঃ শেঠ rK 39 দিয়ে পরীক্ষা করতে চান। পরেরদিন rK 39 এবং কালাজ্বরের ওষুধ Inj. SSG (Sodium Stibogluconate) নিয়ে হাজির হলাম। ক্লিনিকালি দেখার পর rK 39 পজিটিভ হল। আমরা নজরদারি রেখে

Inj. SSG চালু করব স্থির করলাম। ওখান থেকে খুঁজে খুঁজে তপন ব্লকের হাসাইপুর গ্রামের জনজাতি ওঁরাও পাড়ায় গেলাম। গরীব ভুমিহীন পরিযায়ী শ্রমিকদের বাস। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। নারী পুরুষ বেশিরভাগই ভিনরাজ্যে কাজে। বৃদ্ধ ও শিশুরা রয়েছেন। জানলাম এখানে অনেকদিন ধরে কালাজ্বর রয়েছে, অনেকে মারাও গেছেন। দু'দিন পর খবর এল মেয়েটির জ্বর কমতে শুরু করেছে। ওষুধের কোর্স সম্পূর্ণ করে মেয়েটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরায় আমাদের আনন্দের শেষ নেই। বিষয়টি STM তাদের জার্নালে প্রকাশ করল। জেলায় এত এত কালাজ্বর নির্ণয় হওয়ায় স্বাস্থ্য ভবনে হৈ চৈ পড়ে গেল। প্রতিবেদককে তলব করা হল।

খোদ রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তার চেম্বারে বিচার শুরু হল। পতঙ্গ বাহিত রোগের রাজ্য নোডাল অফিসারও ছিলেন। দু'জনেই প্রতিবেদককে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। যক্ষ্মা কর্মসূচিতে থাকার সময়

তাঁদের জেলার আনাচে কানাচে নিয়ে গিয়ে, প্রচুর সমস্যা তুলে ধরে খুব কষ্ট দিয়েছিলাম। প্রথমে একটু রাগারাগি করলেও বেশি কিছু বললেন না। বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন এত এত কেস দেখাচ্ছ কেন্দ্রকে কি জবাব দেব? একজন সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে নির্দেশ দিলেন জেলায় গিয়ে সরেজমিনে দেখতে। তিনি এসে জেলা ঘুরে আমাদের সমর্থন করলেন। আর আমরাও নতুন নতুন রোগীকে নির্ণয় করে তাদের চিকিৎসা করে যেতে লাগলাম। আমাদের দেখাদেখি মালদা প্রভৃতি জেলা কেস রিপোর্ট করতে শুরু করল।

পূর্ব ভারতের একটি গ্রাম

সরকার বাহাদুর দেখলাম নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা সীমান্ত গ্রামগুলিতে বাংলাদেশের সাথে সমন্বয় করে কাজের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কারণ ওদিকেও প্রচুর কেস। ওই সময় আমাদের হাতে আরেকটি অস্ত্র এল। Tab. Miltafosine কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হল। Inj. SSG নিতে রোগীদের খুব যন্ত্রণা হত। তাই অনেকে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতেন না। PKDL এর ক্ষেত্রে টানা ৯০ দিন ইঞ্জেকশন নিতে হত। এমনও হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী রোগীর বাড়িতে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা ঝুলছে। ইঞ্জেকশনের ভয়ে রোগী সপরিবারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন।

পরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসে ক্যানিং ১ ও বাসন্তী ব্লকে বিশেষ কালাজ্বর নির্মূলকরণ অভিযানে অংশ নিয়েছি। তখন দেখেছি প্রাদুর্ভাবযুক্ত ব্লক স্তরে Kala-azar Treatment Supervisor (KTS) পদের সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসায় Inj. Amphotericin B যুক্ত হয়েছে। অনেক পরে কয়েক বছর আগে স্নাতকোত্তর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিদর্শনে গিয়ে মালদায় তখনও বেশ কিছু কেস দেখলাম। Kala-azar – TB – HIV Co-existent কেসও ছিল, যাদের মৃত্যু হয়। ওষুধের অনিয়মিত সরবরাহ সেখানে একটি গুরুতর সমস্যা।

কালাজ্বরের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণঃ বর্তমানে নিম্নোক্ত চারটি কম্বিনেশনের প্রথম দুটির যে কোন একটি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

১) Inj. Amphotericin B – এক মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজন মাত্রায় ৫% ডেক্সট্রোজ ইনফিউশনে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ধরে। একদিন বাদে একদিন। এরকম ১৪ টি ইঞ্জেকশন।

২) Inj. Liposomal Amphotericin B – ১০মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজন মাত্রায় ৫% ডেক্সট্রোজ ইনফিউশনে। একটিমাত্র ইঞ্জেকশন। ব্যয় বহুল।

৩) Inj. Emulsified Amphotericin B – ১৫ থেকে ২০ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজন মাত্রায়। একটিমাত্র ইঞ্জেকশন।

৪) Tab. Miltafosine (২.৫ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) + Inj. Paromycin (১১ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) – ১০ দিন।

PKDL এর চিকিৎসা (যে কোন একটি) -

১) Tab. Miltafosine (ওজন অনুযায়ী ৫০ মিলিগ্রামের একটি বা দুটি ট্যাবলেট) – ২৮ দিন।

২) Inj. SSG (২০ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) – শিরায় বা মাংসপেশিতে X ৯০ – ১২০ দিন।

৩) Inj. Amphotericin B – তিন থেকে চারটি কোর্স, তিন থেকে চার মাস ধরে।

৪) Inj. Liposomal Amphotericin B (৫ মিলিগ্রাম / প্রতি কেজি ওজনে) - সপ্তাহে দু'বার করে তিন সপ্তাহ।

Amphotericin B হৃদপিণ্ড, যকৃত ও বৃক্কের রোগে এবং Miltafosine শিশু, গর্ভবতী ও বৃদ্ধদের দেওয়া যায়না।

বাহক বেলে মাছিদের নিয়ন্ত্রণে (Vector Control) পাকা গৃহের ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সহ পরিবেশের উন্নতি, সচেতনতা

বৃদ্ধি এবং মশারি ব্যবহার সহ ব্যক্তিগত প্রতিষেধনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। Integrated Vector Management নিয়ে খুব চর্চা চলছে। এছাড়াও বছরে দু'বার Alphacypermethrin 5% wp দিয়ে ঘর ও গোয়ালঘরে দেওয়ালের ছয় ফিট উচ্চতা অবধি Indoor Residual Spraying (IRS) করা হয়।

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীঃ এই বরেণ্য এবং বিস্মৃতপ্রায় দক্ষ চিকিৎসক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও বিরাট মাপের গবেষক ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩ পরাধীন ভারতের বাংলা প্রদেশের বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর সারডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডাঃ নীলমণি ব্রহ্মচারী ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের চিকিৎসক ছিলেন। মাতা ছিলেন সৌরভ সুন্দরী দেবী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র তিনি

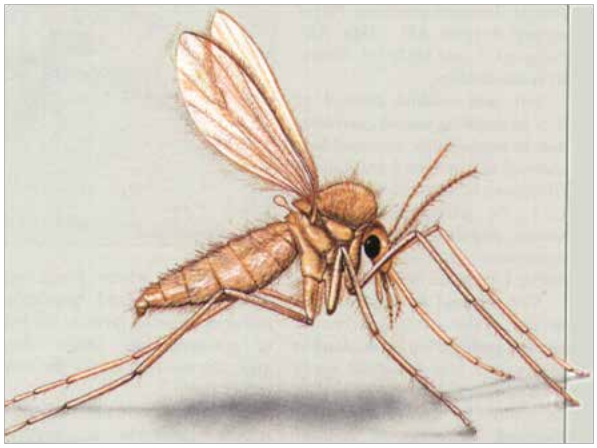

কালাজ্বরের বাহক বেলে মাছি

মুঙ্গের জেলার জামালপুরের রেলের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে হুগলি মহসীন কলেজ থেকে গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। এরপর তিনি রসায়ন নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ. পাশ করেন। তারপর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এম.বি. পরীক্ষার ফাইনালে মেডিসিন ও সার্জারি দুটি বিষয়েই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুডিফ ও ম্যাকলিওড মেডেল পান। তারপর এম.ডি. এবং পি.এইচ.ডি. করেন। তাঁর পি.এইচ.ডি. –র গবেষণা পত্র ছিল 'Studies in haemolysis'। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ননীবালা দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের তিনটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস ভুক্ত না হয়েও তাঁর মেধা ও দক্ষতার কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল, মেডিকেল কলেজ কলকাতা, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমান আর জি কর), ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল, স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন, আই.সি.এম.আর.-এ চিকিৎসা, অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। মেন্টে এবং উইলিয়াম জোন্স মেডেল পান। ১৫০ টি গবেষণা পত্র লিখেছেন যার অনেকগুলি *ল্যানসেট, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল* প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। ভয়াল কালাজ্বরের প্রকোপ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে তিনি কালাজরের ওষুধ তৈরির উপর মনোনিবেশ করেন। তারপর নিরলস গবেষণা চালিয়ে সেই সময়কার কালাজ্বরের যুগান্তকারী ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করেন যা ব্যাবহার করে লক্ষ লক্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। কালাজ্বর নিরাময় অসম্ভব রোগ থেকে নিরাময় সম্ভব রোগে পরিণত হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসক ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রিত দুনিয়া তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯২৯ ও ১৯৪২-এ দু দু'বার তাঁর নাম নোবেল পুরস্কারের জন্যে প্রস্তাবিত হয়েও বাতিল হয়ে যায়। পরে কায়সার-ই-হিন্দ গোল্ড মেডেল, রায় বাহাদুর, নাইটহুড, ফেলো অফ রয়াল সোসাইটি, লন্ডন প্রভৃতি সম্মাননা পান। ১৯৩৬-এ তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৯-এ ভারতের প্রথম ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করেন স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে।

এশিয়াটিক সোসাইটি, রেড ক্রশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ, চিড়িয়াখানা সহ বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, সেন্ট্রাল সেরামিক ইনস্টিটিউট সহ বহু প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা করেন। দেশ স্বাধীনতা লাভের আগেই এই মহান বিজ্ঞানসাধক, মানবতাবাদী, বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং একনিষ্ঠ গবেষকের মৃত্যু হয়। তাঁকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। কেবলমাত্র পরনির্ভর না হয়ে চিকিৎসা গবেষণার উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলি এবং মেডিকেল শিক্ষা ব্যাবস্থাকেও উন্নত করে তুলি যাতে আগামীদিনে প্রথম শ্রেণির গবেষকরা উঠে আসেন।

নরেন্দ্র মোদীর অমৃতকাল (সূত্রঃ ওয়ার্ল্ড ইনইকুইলিটি ল্যাব)

- ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলের থেকেও আর্থিক অসাম্য বেশি
- ভারত কার্যত আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণির ধনকুবের বা বিলিনিয়ারদের 'ধনিকতন্ত্র' বা 'প্লুটোক্রেসি'তে পরিণত হয়েছে
- ভারতীয়দের সমগ্র সম্পদের ৪০ শতাংশ ধনীতম এক শতাংশের কুক্ষিগত দালালি ব্যবসা (পড়ুন লুঠ) ইত্যাদির মাধ্যমে। তাদের আয় জাতীয় আয়ের ২২ শতাংশ
- অতি ধনী ১০ হাজার জনের গড় বার্ষিক আয় ৪৮ কোটি টাকা যা সাধারণ ভারতীয়দের গড় আয়ের দু'হাজার গুণ
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি আর্থিক অসাম্যের জন্য কুখ্যাত দেশগুলিতে এত অসাম্য নেই

ব্যক্তিত্ব

বিকাশ সিংহ, ব্যতিক্রমী এক বিজ্ঞানী

প্রকাশ দাস বিশ্বাস

সাম্প্রতিক অতীতে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যে সব বাঙালি সারা বিশ্বের নজর কেড়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ বিকাশ সিংহ (১৯৪৫-২০২৩)। সব দিক দিয়েই তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। গত ১১ আগস্ট, ২০২৩-এ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এই মৃত্যুকে অকালপ্রয়াণ বলা যাবে না তবে তাঁর প্রয়াণ যে এদেশের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক বড় ক্ষতি সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।

বিকাশ সিংহের জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৬ জুন মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে। কান্দি পাইকপাড়া রাজবংশের সন্তান বিকাশবাবুর পিতার নাম বৃন্দাবন চন্দ্র সিংহ। কান্দির রাজবংশ ছিল শিক্ষা সাহিত্যের অনুরাগী। কান্দির চতুর্দিকে এই রাজবংশের সমাজহিতৈষণার বহু চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বিকাশ সিংহের পিতৃদেব বৃন্দাবন চন্দ্র বেশ কিছুদিন ছিলেন কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক। বিকাশবাবুর জ্যেষ্ঠতাত বিমলচন্দ্র সিংহ ছিলেন সুসাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীপদের দায়িত্বও সামলেছিলেন বেশ কিছুদিন। বিকাশ সিংহের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় কান্দিতেই। এরপর উচ্চ শিক্ষা কলকাতায়, স্কটিশ চার্চ কলেজে। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যার সান্মানিক স্নাতক হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন অমল রায়চৌধুরি, শ্যামল সেনগুপ্ত, সমর ঘোষালের মতো দিকপাল শিক্ষকদের। কিশোর বয়সে তাঁদের কান্দির বাড়িতেই সান্নিধ্যে এসেছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর। ১৯৬০ সালে কান্দি রাজ কলেজের বিজ্ঞান ভবনের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তিনি। তাঁর জেষ্ঠতাত এবং পিতা বৃন্দাবন চন্দ্রের অনুরোধে বিজ্ঞান ভবন উদ্বোধন করতে এসে সকন্যা সত্যেন্দ্রনাথ রাজপরিবারের অতিথি হয়েছিলেন। তখনই আলাপ হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বিকেলে দাড়ি কামানোর সময় সত্যেন্দ্রনাথ ব্লেড নিয়ে সারফেস টেনশন বুঝিয়েছিলেন রাজবাড়ির কচিকাঁচাদের। বোধ করি তখন থেকেই বড় বৈজ্ঞানিক হবার বাসনা জেগেছিল বিকাশের মনে। পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যান্ডে যান। ভর্তি হন ক্রাইস্টস কলেজে। ১৯৬৬-র জানুয়ারিতে পিতার অসুস্থতার জন্য পড়া অসমাপ্ত রেখেই ফিরতে হয় দেশে। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর বিদেশে শিক্ষা নিয়ে কিঞ্চিত দোটানায় পড়লেও শেষ পর্যন্ত ওই বছরের সেপ্টেম্বরে আবার লন্ডনে যান। ১৯৬৭ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যাচারাল সায়েন্সে লাভ করেন ট্রাইপস ডিগ্রি। ওই বছরই ফিরে আসেন দেশে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির উজ্জ্বল ছাত্রী দেবযানীর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর। বিয়ের পরপরই রিসার্চ স্কলার হিসাবে তিনি লন্ডনের কিংস কলেজে যোগ দেন। লন্ডনে প্রবাসকালেই ১৯৭৪ সালে ১৯ আগস্ট তাঁদের প্রথম সন্তান তানিয়ার জন্ম হয়। ১৯৭০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান পিএইচডি ডিগ্রি। এই সময় তিনি ডেনমার্কের কোপেনহাগেনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন কিংস কলেজে। রাদারফোর্ড হাই এনার্জি ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে শুরু করেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার গবেষণা। কোয়ার্ক গ্লুকন প্লাজমা গবেষণার সূত্রে অচিরেই তিনি সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন । ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসসি উপাধিতে ভূষিত হন।

বারো বছর ইংল্যান্ডে কাটানোর পর ১৯৭৬ সালে বিজ্ঞানী রাজা রামান্নার আহবানে দেশে ফিরে যোগ দেন মুম্বাইয়ের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে। মুম্বাইয়ে থাকার সময়েই ১৯৭৯ সালে ৭ জুলাই জন্ম হয় তাঁর পুত্র অমর্ত্যর। ১৯৮৪-এ হোমি ভাবা চেয়ার প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন কলকাতার ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারে। ১৯৮৭ সালে ডিরেক্টর হন প্রতিষ্ঠানটির। সাইক্লোট্রন সেন্টারে উন্নত মানের সাইক্লোট্রন বসানোর কৃতিত্বও তাঁর। এই কেন্দ্রের সাইক্লোট্রন যন্ত্র পৃথিবীর অন্যতম সেরা সাইক্লোট্রন। ১৯৯২-এ কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এরও ডিরেক্টর হন। নিউক্লিয়ার এবং হাই এনার্জি ফিজিক্সে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতিতে পেয়েছেন বহু সম্মান। ১৯৮৯-এ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি তাঁকে ফেলোশিপ দেয়। এলাহাবাদের ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস তাঁকে ফেলোশিপ দেয় ১৯৯৩-এ। ২০০২ সালে তিনি ইতালির থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমি অফ সায়েন্সের ফেলোশিপ অর্জন করেন। ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স তাঁকে ফেলোশিপ দেয় ২০০৪-এ। ২০০৯ সালে হন লন্ডনের ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সের ফেলো। ২০০৭ সালে থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান ফিজিক্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। সদস্য ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য উন্নয়ন পর্ষদ (State planning board)-এরও।

বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৪-এ পেয়েছিলেন ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্ম শতবার্ষিকী পুরস্কার। ২০০১-এ পান ডি এ ই ডক্টর রাজা রামান্না পুরস্কার। ২০০২ সালে পদার্থবিদ্যায় অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য পান আর ডি বিড়লা অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন ফিজিক্স। ২০০৫-এর নভেম্বরে জার্মানির আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট ফাউন্ডেশন তাঁকে হামবোল্ট রিসার্চ এওয়ার্ডে ভূষিত করে। ২০০১-এ ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে। ২০১০-এ দেয় পদ্মভূষণ উপাধি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয় বঙ্গবিভূষণ এবং রবীন্দ্র পুরস্কার (২০২২)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আগরতলা এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ শিলচর তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়।

সারা জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়ভার সামলেছেন তিনি। ২০০৫ সালে তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (NIT)-র বোর্ড অফ গভর্নরস এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তাঁকে ওই পদে নিযুক্ত করে। ওই বছরই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালেও তিনি ওই পদে পুনরায় মনোনীত হন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তাঁকে কলকাতার দি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ এর লোকাল কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সিলেবাস কমিটির উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন।

কর্মজীবনে এতসব জটিল দায়িত্ব পালন করলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন খুব সুখের ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ গড়িয়েছিল আদালতে। বিবাদ গড়িয়েছিল বিচ্ছেদে। তবে তাতে তাঁর কর্ম চাঞ্চল্য হ্রাস পায়নি। বিকাশ সিংহ নিজেই যে শুধু খ্যাতিমান পরমাণু বিজ্ঞানী ছিলেন তাই নয়, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন অন্যান্য সহ বিজ্ঞানীদের মেন্টর। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যাতে গবেষণার জন্য উন্নততর সুযোগ সুবিধা পায় সেজন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই শতাব্দীর প্রথম শতকে ব্রহ্মাণ্ডের সূচনাবস্থা বোঝার জন্য সুইজারল্যান্ড-এর জেনেভা শহরে সার্ন-এ যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরই চেষ্টায় সেই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন বহু ভারতীয় বিজ্ঞানী। সার্ন-এর গবেষণায় যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল তার বেশ কিছু যন্ত্র তৈরি হয়েছিল কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে। হিগস বোসন কণার আবিষ্কারের কাজে লাগা এইসব সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছিল তাঁর তত্ত্বাবধানেই। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টাতেই তাঁর কতিপয় সহকর্মী রিলেটিভিস্টিক হেভি আয়ন কোলায়ডার নিয়ে গবেষণার সুযোগ পান আমেরিকার ব্রুকহেভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে। জার্মানিতে অ্যান্টি প্রোটন এবং আয়ন রিসার্চ প্রজেক্টে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল তাঁরই সৌজন্যে।

বেশ কিছু ভারতীয় বিজ্ঞানী যে লাইগো-র মত আন্তর্জাতিক গবেষক দলের সঙ্গে কাজ করেছেন তাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর প্রচেষ্টাতেই। পরমাণুর শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার না করে তাকে মানব কল্যাণে ব্যবহারের কথা বলেছেন আজীবন। পরমাণু শক্তি মানেই যে পারমাণবিক বোমা নয় তা বোঝাতে চেষ্টার কসুর করতেন না। হরিপুরের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাকে তাই তিনি স্বাগত জানান। পরমাণুর অমিত শক্তিকে চিকিৎসার কাজে লাগাতে কলকাতার ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারে তাই গড়ে তোলেন রেডিয়েশন মেডিসিন সেন্টার, যা এখন নিউক্লিয়ার মেডিসিন-এর এক নির্ভরযোগ্য জোগানদার। পরমাণুর শক্তিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগানোর এক সুমহান উদ্যোগ এটি। এই গবেষণাগারে উৎপাদিত আইসোটোপ ক্যান্সারের চিকিৎসায় খুবই কার্যকরী।

পরমাণু বিজ্ঞানের জটিল জগতের কারবারি হলেও প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভক্তপাঠক ছিলেন। তিনি দেশ-বিদেশের নামিদামি জার্নালে বিজ্ঞানের গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি ভেবেছেন সাধারণ পাঠকদের কথাও। সেজন্য সহজবোধ্য বাংলায় লিখেছেন বিজ্ঞানের জটিলতম বিষয় নিয়েও। তাঁর লেখা 'সৃষ্টি ও কৃষ্টি: বন্ধনহীন গ্রন্থি' (২০১২) এবং 'স্থান কাল ও বিশ্বলোক' (২০১৮) বই দুটি নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী।

সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরিতেও তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সহজ বোধ্য বাংলায় সাধারণের জন্য প্রবন্ধ লিখেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, নানাভাবে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রায় সূচনালগ্ন থেকে উত্তর কলকাতার হেদুয়ায় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামাঙ্কিত বিজ্ঞান মেলার চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। শুধু নাম ধার দেওয়া নয়, প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতেন মেলার কাজে। অশক্ত শরীরেও কোন অজুহাত না দিয়ে সশরীরে হাজিরা দিতেন মেলা প্রাঙ্গণে। এ বছর মেলার রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের পরিকল্পনাও শুরু করেছিলেন জোরকদমে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বিজ্ঞানী পিতৃভূমি কান্দি-কে ভোলেননি কখনো। সুযোগ পেলেই আসতেন কান্দিতে। এখানকার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ছিল তাঁর নাড়ির যোগ। বিজ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ শিখর ছুঁয়েও মাটির কাছাকাছি থাকার প্রয়াস হিসাবেই একে গণ্য করা যায়।

ড: বিন্দেশ্বর পাঠক—যেমন দেখেছিলাম

সৌরভ রায়

ড: বিন্দেশ্বর পাঠকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল হঠাৎই। এই প্রতিবেদক তখন কাম্বোডিয়ার রাজধানী নম্ পেন্-এর ভারতীয় দুতাবাসে কর্মরত। ওখানের এয়ারপোর্ট প্রায়ই যেতে হতো নানা কাজে। সেরকমই একদিন কোনো এক ভিআইপি-কে আনতে গিয়ে টার্মিনালে ঘোরাফেরা করছি। হঠাৎ দেখি ড: পাঠক ইমিগ্রেশনের বাইরে একটু বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোটখাটো কিছু সমস্যায় পড়েছিলেন বোধহয়। আমার সময় ছিল, তাই ওঁর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে আলাপ করে ওনার সমস্যা দূর করাই। উনি ভীষণ খুশি হন এবং ওঁর হোটেলে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেন। উনি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। এবং বেশ কয়েকদিন কাম্বোডিয়াতে কাটিয়ে আঁকোরভাট্ দেখে দেশে ফিরে গেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অল্পদিনেই ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং আমিও ওঁনাকে নিমন্ত্রণ করি। কয়েকদিন বেশ কাছ থেকে ওঁনাকে দেখার সুযোগ হয়েছিল সেসময়। তবে একটা মজার বিষয়ে না বলে পারছি না। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর সঙ্গে গেছিলাম। ওঁর বক্তৃতা মন দিয়ে শুনলেও ছাত্রছাত্রীদের মনে একটি বিষয়ে অবাক ভাব ছিল। সেটি উনি প্রথমে বুঝতে পারেননি, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিই। আসলে কাম্বোডিয়া খুব গরিব দেশ হলেও শৌচালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। খোলা মাঠে-ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করার সংস্কৃতি নেই। তাই উনি যখন বলছিলেন যে ভারতে কয়েক কোটি মানুষ খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে (Open Defecation) তখন ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপারটা হজম করতে পারছিলেন না একেবারেই। পাঁচ বছর ওই দেশে কাজ করেছি এবং দেশের আনাচে কানাচে গ্রামে গঞ্জে বহু ঘুরেছি কিন্তু কখনোই কোথাও সাধারণ মানুষকে পরিবেশ নোংরা করতে দেখিনি এবং প্রতিটি জনসাধারণের টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে পেয়েছি। এটাই ওখানের সংস্কৃতি।

মানুষ ড: পাঠক একই রকম যেমন জনসাধারণের সামনে তেমনি নিজস্ব জীবন আচার আচরণে। অত্যন্ত ভদ্র, মিষ্টভাষী, পণ্ডিত ও মাটির মানুষ কিন্তু ব্যক্তিত্বশালী পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত শৌচালয় ব্যবস্থা ছিল ওঁর কর্মযজ্ঞ ও আদর্শ। গান্ধীবাদী মানুষটি ছিলেন বিরাট কর্মযোগী। শৌচালয় নিয়ে তাঁর মতো গবেষণা এ দেশে কেউ করেননি এর আগে। নিজে আধুনিক শৌচালয়ের বিভিন্ন নক্সা পর্যন্ত করেছেন এই ভাবে যাতে অল্প জল ব্যবহার করলেই হয়। এসব বিষয়ে ভারতবর্ষে এত বিরাট ভাবে এর আগে কেউ গবেষণা করেছে কিনা জানা নেই। দিল্লির দ্বারকায় ওঁর নির্মিত শৌচালয় 'সংগ্রহশালা' দর্শন করলে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। এই সংগ্রহশালার আরো প্রচার দরকার।

ড: পাঠক শুধু তাত্ত্বিক গবেষণায় নিমজ্জিত ছিলেন না। এই বিষয়ে তত্ত্বের থেকে ব্যবহারিক কর্মসূচিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই তিনি 'সুলভ ইন্টারন্যাশানাল' নামক সমাজসেবী সংস্থা বানিয়ে সারা দেশেই ওঁর কর্মযজ্ঞ চালু করেন এবং এটাই ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় 'স্যানিটেশন' পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আন্দোলন। এখন ভারতে প্রতিটি শহরে, ট্রেন ও বাস টার্মিনালে যে 'সুলভ শৌচালয়' কয়েক কোটি মানুষ ব্যবহার করেন প্রতিনিয়ত, তা ওঁরই অবদান। তাই ওঁর অবদান ভারতীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বদাই উজ্জ্বল থাকবে। ওঁর মৃত্যু এক বিরাট ক্ষতি দেশের জন্য। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বয়সের তুলনায় সুন্দর স্বাস্থ্য। ভাবতেই পারছি না এত তাড়াতাড়ি ওঁর প্রয়াণ ঘটবে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: বিহারের বৈশালীর সন্তান বিন্দেশ্বর পাঠক (১৯৪৩-২০২৩) পাটনা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও সমাজতত্ত্বে স্নাতকোত্তর করে গান্ধীবাদী 'ভাঙ্গি মুক্তি আন্দোলনে' যুক্ত হন ১৯৬৮ নাগাদ। দলিত ভাঙ্গি সম্প্রদায়ের মানুষের মলমূত্র মাথায় নেওয়া ও হাত দিয়ে পরিষ্কার করার (Manual Scavenging) পদ্ধতির বিরোধিতা করেন এবং গবেষণার কাজে সারা ভারত ঘুরে বেড়ান।

এর পর তিনি এই মেথর সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে ১৯৭০-এ 'সুলভ ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থা গড়ে তোলেন যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। তাঁর কাজ ও গবেষণার দিশা ছিল: (১) হাত দিয়ে মলমূত্র সাফাই (Manual Scavenging) থেকে মুক্তি দিয়ে মেথর বা বাল্মিকী সম্প্রদায়কে আধুনিক যান্ত্রিক বর্জ্য সাফাই ব্যবস্থায় (Mechanized Scavenging System) এনে তাদের কর্মসংস্থানের এবং তাদের শিক্ষা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। (২) মলমূত্র সহ মানুষের বর্জ্য (Human Excreta) স্বাস্থ্য বিধি ও পরিবেশবান্ধবভাবে প্রকৃতিতে সংস্থাপন এবং (৩) জনপরিসরে (Public Places) ভদ্রসভ্য ও সম্মানজনক ভাবে এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ ও ব্যবস্থা করা। তাঁর গবেষণালব্ধ 'টু পিট পোর ফ্ল্যাশ উইদাউট স্ক্যাভেনজিং

টয়লেট' সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয় এবং তাদের শৌচাগার রূপান্তরিত প্ল্যান্টের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকরণজাত বর্জ্য থেকে নির্গত দুর্গন্ধহীন বায়ো-গ্যাস এবং ফসফরাস সহ অন্যান্য জৈবযুক্ত পরিষ্কার জল শক্তি ও সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে সর্বত্র সমাদৃত হয়।

এর পর তিনি 'পে অ্যান্ড ইউজ' 'সুলভ শৌচালয়' এর ধারণা (concept) নিয়ে এসে কাজে পরিণত করে স্যানিটেশন ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটান এবং কর্মক্ষেত্রে ও যাত্রাপথে জনপরিসর, বাস স্ট্যান্ড ও টারমিনাস, রেল স্টেশন ও টারমিনাস, বাজার, বন্দর ও বিমানবন্দর প্রভৃতি স্থানে এবং বিস্তীর্ণ বস্তি, শ্রমিক ও কলোনি এলাকায় ভদ্র ও সুস্থভাবে প্রাকৃতিক কাজের সুবন্দোবস্ত করে মানুষের প্রভূত সুবিধা করে দেন। প্রতিদিন এক কোটির বেশি মানুষ 'পে অ্যান্ড ইউজ সুলভ শৌচালয়' ব্যবহার করেন এবং এই মডেলের টয়লেট বিভিন্ন বস্তি, জনবসতি, কলোনি প্রভৃতি জায়গায় আরও কয়েক কোটি মানুষ ব্যবহার করেন। কারখানা ও পুরসভার বর্জ্যর সুসংস্থাপন নিয়েও তিনি ও তাঁর সংস্থা কাজ করেছে।

এছাড়াও তিনি মানবাধিকার, পরিবেশ দূষণমুক্তকরণ, অপ্রচলিত শক্তি, বর্জ্য সংস্থাপন, সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা প্রসার প্রভৃতির উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। এক সময় ভাগলপুর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন। ছিলেন 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' এবং 'স্বচ্ছ রেল মিশন' এর ব্র্যান্ড এম্বেসেডর।

এটা ঠিকই ভারতের বিষাক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী মনুবাদী সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু জাত কাঠামোয় তিনি মেথর সম্প্রদায়কে 'বিধির বিধান' জন্মগত বর্জ্য সাফাইয়ের পেশা থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি। তাঁদের একাংশের মধ্যে কিছুটা সংস্কার আনতে পেরেছেন। এটা ঠিকই তিনি দেশের সমস্ত গ্রামে পৌঁছতে পারেন নি। কিন্তু জনবহুল মহানগরী, অসংখ্য ঘিঞ্জি শহর ও মফস্বল গুলিতে সুলভ শৌচালয় বা সেই ধরনের শৌচালয় সকলের পরিচিত, বহুল ব্যবহৃত এবং খুবই কার্যকর। বিদেশের অনেক জায়গাতেও জনপ্রিয়। যেটুকু করতে পেরেছেন তা এককথায় অকল্পনীয়। এই বিপ্লবী গত ১৫ আগস্ট ২০২৩-এ প্রয়াত হলেন। তাঁর মহান কর্মকাণ্ডের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। তিনি ২০১৭-তে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় পুরস্কার এবং ১৯৯১-এ পদ্মভূষণ সম্মাননা পান। বিদেশেও তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার তাঁকে মরনোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মাননা দিলেন।—সম্পাদকমণ্ডলী।

সুখী দেশের তালিকা (ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২৪), কয়েকটি দেশ

(১) ফিনল্যাণ্ড
(২) ডেনমার্ক
(৩) আইসল্যাণ্ড
(৪) সুইডেন
(৫) ইজরায়েল
(৬) নেদারল্যাণ্ডস
(৭) নরওয়ে
(৮) লাক্সেমবার্গ
(৯) সুইজারল্যাণ্ড
(১০) অস্ট্রেলিয়া
(১৫) কানাডা
(২০) ব্রিটেন
(২৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
(৬০) চীন
(১২৬) ভারত

বালিকাবধূর সংখ্যা বাড়ছে (সূত্রঃ ল্যানসেট)

বিহার ১৫.৭ শতাংশ
উত্তরপ্রদেশ ১২.৫ শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ ১৫.২ শতাংশ
মহারাষ্ট্র ৮.২ শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৩-২০২৩-এ এক দশকে বৃদ্ধি ৫,০০,৩৪৬ জন (৩২.৩ শতাংশ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বার্বাডোজে অনুষ্ঠিত টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ২০০৭এর পরে। ৫০ ওভারের ক্রিকেট বিশ্বকাপেও ভারত দু'বার চ্যাম্পিয়ান হয় (১৯৮৩ ও ২০১১)

২০২৪এ CONMEBOL Copa America চ্যাম্পিয়ন হল আর্জেন্টিনা। ১৯১৬ থেকে শুরু হয়ে ৪৮ বারের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা (১৬), উরুগুয়ে (১৫), ব্রাজিল (৯) পেরু (২), প্যারাগুয়ে (২), চিলে (২), বলিভিয়া (১) ও কলম্বিয়া (১)।
২০২৪এর UEFA Euro Cup চ্যাম্পিয়ন হল স্পেন। ১৯৬০ থেকে শুরু হয়ে ১৭ বারের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয় স্পেন (৪), জার্মানি (৩), ইতালি (২), ফ্রান্স (২), সোভিয়েত ইউনিয়ন (১), চেকোশ্লোভাকিয়া (১), দ্য নেদারল্যাণ্ডস (১), ডেনমার্ক (১), গ্রিস (১) ও পর্তুগাল (১)।

পশ্চিম বাংলার নিজস্ব এ.ভি.এস. চাই

দয়ালবন্ধু মজুমদার

পশ্চিম বাংলার চন্দ্রবোড়া সহ বিষধর সাপগুলির কামড়ের কার্যকর চিকিৎসার জন্য পশ্চিম বাংলার নিজস্ব অ্যান্টি ভেনাম সেরাম (এভি এস) চাই। এই শিরোনামে একটি আবেদন নিবেদন ইত্যাদিকে একেবারে প্রায় আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পর, এ রাজ্যের নীতিনির্ধারকরা দাবিটি মেনে নিলে, সরকারি স্তরে ফাইল চালাচালি শুরু হয়, ২০১৯ সালের প্রথম দিকেই। মাঝে কোভিড এর অতিমারি এসে সকল কাজকর্ম দু' বছর পিছিয়ে দেয়। কোভিড এর সমস্যা প্রায় মিটে গেছে ২০২২ সালের মাঝামাঝি; কিন্তু ২০২৪ সালের প্রথম অর্ধেও বিশেষ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।

এর মধ্যে একটি স্তরের উন্নতি হয়েছে। ২০২২ সালে একটি বেসরকারি সংস্থা, এ রাজ্যে একটি সাপের বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র করার অনুমতি পেয়েছে। এ নিয়েও নানান সমস্যা দেখা দেয়। ২০১৮ সাল নাগাদ আমরা কয়েকজন, বিকাশ ভবনের বন্যপ্রাণ দপ্তরের বড় কর্তার সাথে দেখা করে, এ রাজ্যের সাপের বিষ সংগ্রহ করার জন্য কি করা উচিত জানতে চাই। উনি খুবই সহানুভূতির সাথে আমাদের কথা শোনেন, এবং সমস্যাটি পরিষ্কার করে বুঝতে পারেন। ওঁদের সরকারি আইন অনুযায়ী বাধ্যবাধকতার কথা আমাদের জানিয়ে কিছু কিছু পরামর্শ দেন। ওঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল, কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা কয়েক বছর ধরেই বিষ সংগ্রহ করার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত জমা করে ছোটাছুটি করছে, কিন্তু নিয়মের জটিলতায় কাউকেই অনুমতি দেওয়া হবে না। ওই বড়কর্তা আমাদের সম্ভাব্য গোটা তিনেক উপায় জানিয়ে দেন। যে কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থা চাইলে সাথে সাথেই অনুমতি পাবে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য দপ্তর নিজে বিষ সংগ্রহ করতে পারে, ওষুধ তৈরির জন্য। অন্য কোন রাজ্যে এরকম সম্ভাবনা আছে কি না আমাদের জানা নেই। আমাদের রাজ্যে যে এটা কোনদিনই সম্ভব নয় সেটা আমরা সাথে সাথেই বুঝে যাই। এছাড়া রাজ্য সরকারের আদিবাসী ও তপসিলি উন্নয়ন দপ্তর চাইতে পারে। সাপুড়েরা সাধারণত ওই রকমের তপসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের কর্ম সংস্থান হবে, এই যুক্তিতে সরকার একটি বিষ সংগ্রহ কেন্দ্রের অনুমতি চাইতে পারে। বর্ধমানের মেমারি অঞ্চলে বেশ কিছু সাপুড়ে বসবাস করেন। তাদের নিয়ে একটি সেল্ফ হেলপ গ্রুপ তৈরি করে, তাঁদের দিয়ে বিষ সংগ্রহ কেন্দ্রের অনুমতি চাওয়া যায়। এই সম্ভাবনাটি মাথায় রেখে আমরা নির্দিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাথেও যোগাযোগের চেষ্টা করি। আর একটি ব্যাপারে আমরা বেশ কিছু দূর এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম। এই ব্যপারটি একটু খুলে বলা দরকার।

সরাসরি স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে বিষ সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে এরকম একটি সংগ্রহ ও গবেষণা কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব করা হয়। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মশাই খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। ওখানে জায়গার অভাব নেই। অ্যানিমাল হাউস বলে চিহ্নিত একটি দোতলা বাড়ি বেশ কয়েক বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মাত্র দুই তিনটি ঘর নিয়ে এরকম একটি বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র করা সম্ভব। আসলে আমাদের তৈরি সম্পূর্ন প্রস্তাবনাটি (Complete Project Proposal) ছিল একটি PPP Model Project, অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি যৌথ কর্ম প্রস্তাবনা। সরকার শুধু পড়ে থাকা বাড়ির অংশ ব্যবহার করতে দেবে, আর জল ও বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করে দেবে। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থা সাপেদের সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, বিষ সংগ্রহ ইত্যাদি সকল কাজ করবে। আমাদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই বিষ সংগ্রহ কেন্দ্রটি একটি লাভজনক সংস্থা হতে পারত। এবং অবশ্যই এ রাজ্যের সাপের বিষ সংগ্রহ করার নানান জটিলতা কাটিয়ে ওঠা যেত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের নীতি নির্ধারকরা এই প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবতেই রাজি হননি।

যাই হোক, করোনার অতিমারি মিটে যাওয়ার পর গত ২০২২ সালের মাঝামাঝি একটি বেসরকারি সংস্থাই এ রাজ্যের সাপের বিষ সংগ্রহ করার অনুমতি পেয়েছে। এবার সেই বিষ দিয়ে শুধু এ রাজ্যের জন্য অ্যান্টি ভেনম তৈরি করবে কে? ২০০৯ সালেই এ রাজ্যের একমাত্র অ্যান্টিভেনম তৈরি করার সংস্থা, বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্টিভেনম তৈরি বন্ধ করে দিয়েছে। এই অতি বিখ্যাত রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কাছে আজও বিষ সংগ্রহ করার অনুমতি আছে। এরা চাইলে এখনও এ রাজ্যের সাপের বিষ সংগ্রহ করতে পারে। এই শেষের উৎসাহব্যঞ্জক খবরটিও আমাদের দেন, সেই বন্যপ্রাণ দপ্তরের বড় কর্তা। এ খবর পেয়েই আমরা বেঙ্গল কেমিক্যালস এর বড় কর্তার সাথে দেখা করার জন্য সচেষ্ট হই। খুব সহজে না হলেও, আমরা একদিন এই বড় কর্তার সাথে মধ্য কলকাতার আপিসে দেখা করি। উনিও সব শুনে আমাদের জানান যে, আমাদের প্রস্তাবটি খুবই ভালো, কিন্তু এটি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট দপ্তরের অনুমতির ওপর নির্ভর করছে। ওই বড় কর্তার কথায় আমরা এটাও বুঝে যাই যে, সেই অনুমতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও ওনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে আমরা ওঁদের আপিস থেকে ফিরে আসি।

বর্তমানে ভারতের সাপের বিষ এর অন্টিভেনোম তৈরি করে যে সাত - আটটি সংস্থা, সেগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ ভারতে। একমাত্র হিমাচল প্রদেশের কাসৌলিতে অবস্থিত সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আছে। বাকি সব বেসরকারি সংস্থা। কসৌলির সংস্থার সাথেও সরকারি স্তরে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যের যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিভেনম প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার সে পরিমাণ ঔষধ তৈরির পরিকাঠামোই নেই। সরকারি স্তরে

ঔষধ কেনার জন্য যে সকল নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ফাইল চালাচালি শুরু হয়েছে করোনার গণ্ডগোল শুরুর আগেই। মাঝে দু 'বছর থমকে যাওয়ার পর আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ফাইল চালাচালি। EOI, Tender ইত্যাদি সরকারি লাল ফিতার বাঁধন খুলে একটি বেসরকারি সংস্থাই এ রাজ্যের জন্য অ্যান্টিভেনম তৈরির অনুমতি পাবে। গোটা তিনেক বেসরকারি সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

লাল ফিতার বাঁধন খুলে একটি বেসরকারি সংস্থা চুড়ান্ত ভাবে বরাত পেলেও, কম করে দেড় বছর সময় লাগবে ওই ঔষধ তৈরি করতে।

স্বাস্থ্য দপ্তর এর দুই একজন কর্তাই এখনও বিষয়টি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে কয়েকজন আধিকারিক অবসর নিয়েছেন বা দূরে বদলি হয়ে গেছেন। এখন যে দু'একজন নানান জটিলতা কাটিয়ে বিষয়টা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদেরও কতদিন কাজ করার সুযোগ থাকবে আমরা জানি না। এই অধম, সামান্য ক্ষমতা নিয়েও, বেশ কিছু জেদি মানুষের উৎসাহে আজও কাজটা নিয়ে আলোচনা করা, আধিকারিকদের কাছে ছোটাছুটি করে তাগাদা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরও সরকারি চাকরি জীবন সমাপ্ত। এত তাড়াতাড়ি কিছু হয়ে যাবে, এমন আশাও করি না। তবুও এ রাজ্যের সাধারণ জনগণ যদি এটুকুও অবহিত হন, সেই আশা নিয়েই এই নিবন্ধটি লেখা হল।

শিশুদের ক্যান্সার —দু চার কথা

অরুণালোক ভট্টাচার্য

শৈশব ক্যান্সার প্রায়শই প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা কঠিন, কারণ সংশ্লিষ্ট লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি অনির্দিষ্ট, প্রারম্ভিক অবস্থায় অস্বচ্ছ এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যাধিগুলির উপসর্গের মতই। শৈশবকালীন ক্যান্সারের সর্বোত্তম চিকিৎসা তখনই সম্ভব যখন প্রাথমিক চিকিৎসকরা দ্রুত শিশু চিকিৎসক বা শিশু ক্যান্সার বিশারদের কাছে রেফার করতে পারবেন। তবেই মাত্র প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং রোগ এবং তৎসম্বন্ধীয় জটিলতা হ্রাস পেতে পারে।

শৈশব ক্যান্সার সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আলোচনা করলে, মোটামুটি একটা ধারণা তৈরি হতে পারে।

যদিও শৈশবকালীন ক্যান্সার বিরল, তবু পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যায় যে মার্কিন মুলুকে ১ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে রোগ-জনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ এটি। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে এবং ছোট বাচ্চাদের তুলনায় কিশোরদের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি।

অন্তত ৮৫ শতাংশ শৈশবের ক্যান্সার, তার নিজস্ব উপসর্গ ও লক্ষণ নিয়ে, উপস্থাপিত হয়। অবশিষ্ট ১০ থেকে ১৫ শতাংশ একদম অন্যরকম ও অস্বাভাবিক লক্ষণ এবং উপসর্গ নিয়ে দেখা দেয়। এদের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটতে পারে অনেক কারণে। শিশুর বয়স (বয়স্ক শিশুদের বিলম্ব ঘটে বেশি), ক্যান্সারের ধরন, সঠিক উপসর্গের উপস্থিতি, টিউমারের অবস্থান, প্রাথমিক চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসা, এবং যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হওয়া।

উপসর্গের উপস্থিতি থেকে শিশুর ক্যান্সারের রোগ নির্ণয়ের সময়কাল, একেকটি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে একেকরকম। যেমন, নিউরোব্লাস্টোমার ক্ষেত্রে সেটি গড়ে ২ থেকে ৫ সপ্তাহ, লিউকেমিয়ার জন্য গড়ে ৩ থেকে ৫ সপ্তাহ, লিম্ফোমার জন্য গড়ে ৭ থেকে ১০ সপ্তাহ, হাড়ের টিউমারের জন্য ৮ থেকে ১৫ সপ্তাহ এবং ব্রেন টিউমারের জন্য ৮ থেকে ২০ সপ্তাহ।

শৈশবকালীন ক্যান্সার সাধারণতঃ যে সব তন্ত্রী বা টিস্যু থেকে উদ্ভূত হয় সেগুলো হচ্ছে রক্ত, অস্থি মজ্জা, মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্র, লিম্ফ নোড, কিডনি, হাড় এবং নরম টিস্যু।

নির্দিষ্ট কোনও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হার শিশুর বয়সের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, নিউরোব্লাস্টোমা এবং উইল্মস টিউমার সাধারণত জন্ম থেকে চার বছরের মধ্যে দেখা দেয়। লিউকিমিয়া প্রায়শই ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে; এবং ইউইং সারকোমা, হজকিন লিম্ফোমা, এবং থাইরয়েড ক্যান্সার ১০ বছর থেকে বেশি বয়সের শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

রোগের রকমফেরে পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হারও পাল্টে যায়। সামগ্রিকভাবে সব রকমের শৈশব ক্যান্সারের ধরণ একসাথে বিবেচনা করলে, পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হার প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ। সন্দেহভাজন ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুর মূল্যায়নের প্রথম ধাপ হল, বিশদ ইতিহাস বা ঘটনাক্রম জানা । প্রধান অভিযোগ বা উপসর্গ গুলি খতিয়ে বিচার করা। শৈশব ক্যান্সারের প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ।

বিপদ সংকেত

- অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া এবং দুর্বলতা।
- শরীরে নতুন গজিয়ে ওঠা ক্রমবর্ধমান ফোলা বা টিউমার।
- বিনা কারণেই হঠাৎ শরীরের ওজন কমে যাওয়া।
- অকারণ জ্বর এবং অস্বাভাবিক দুর্বলতা।
- শরীরে হঠাৎ করে কালশিটে পড়া বা রক্তক্ষরণ।
- শরীরের এক বা একাধিক জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা যা কিনা দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।
- হঠাৎ করে খুঁড়িয়ে হাঁটা। ঘন ঘন মাথাব্যথা, বিশেষ করে যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে হয় এবং তার সাথে বমি।

- হঠাৎ চোখ বা দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন।

কোন শিশুরা ক্যান্সারপ্রবণ?

কিছু জিনগত সমস্যা এবং ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম (জন্মগত রোগ প্রতিরোধ করার সহজাত অক্ষমতা) ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ডাউন সিনড্রোম রুগিদের লিউকিমিয়া, অন্ডকোষের ক্যান্সার এবং রেটিনোব্লাস্টোমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এইরকম আরো অনেক জিনগত রোগ আছে, যাদের কোনও কোনও ধরণের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। অথবা ধরা যাক কোনও ক্যান্সার রুগি চিকিৎসায় সেরে উঠলো, তাদের আবার অন্যান্য ধরনের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি। এ ছাড়াও কিছু শৈশবের ক্যান্সার পরিবারের মধ্যে হওয়ার প্রবণতাও থাকে।

এবারে আমরা উপসর্গ ভিত্তিক কিছু শিশু ক্যান্সারের প্রকারভেদ সারণিবদ্ধ অবস্থায় দেখে নেবো।

উপসর্গ /লক্ষণ	প্রাথমিক পরীক্ষা	সম্ভাব্য ক্যান্সার
অস্বাভাবিক জ্বর ওজন কমে যাওয়া ফ্যাকাশে ভাব বা অল্পতে ক্লান্তি	রক্ত পরীক্ষা জীবাণু নির্ণয় এক্স রে/ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি/ স্ক্যান	যে কোনও ধরনের ক্যান্সার
স্নায়ুজনিত উপসর্গ সকালবেলা মাথাব্যথা ও বমি খিঁচুনি চলাফেরায় অসুবিধে দেখতে অসুবিধে	মাথা বা শিড়দাঁড়ার স্ক্যান নিউরোসার্জেনের মতামত	ব্রেন টিউমার
শরীরের গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া,যেগুলি অ্যান্টিবায়োটিকে উপশম হয় না	রক্ত পরীক্ষা জীবাণু নির্ণয় বুকের এক্স রে	লিউকিমিয়া লিম্ফোমা
মাংসপেশী ও অস্থি বিষয়ক- হাড়ের যন্ত্রণা হঠাৎ করে খুঁড়িয়ে চলা কোথাও টিউমারের মত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ফোলা	রক্ত পরীক্ষা বিভিন্ন জায়গার এক্স রে বা স্ক্যান	ইউইং সারকোমা লিউকিমিয়া নিউরোব্লাস্টোমা অস্টিওসারকোমা
আপাত কোনও কারণ ছাড়াই কাশি বা শ্বাসকষ্ট	বুকের এক্স রে	বুকের টিউমার ছড়িয়ে পড়া বা মেটাস্ট্যাসিস সারকোমা
পেট বা তলপেটে অস্বাভাবিক ফোলা	রক্ত পরীক্ষা কিডনি, লিভার ইত্যাদির পরীক্ষা পেট ও তলপেটের এক্স রে বা স্ক্যান	অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির টিউমার হেপাটোব্লাস্টোমা নিউরোব্লাস্টোমা রাবডোমায়োসারকোমা উইল্মস টিউমার
কালশিরে পড়া বা রক্তক্ষরণের প্রবণতা	রক্ত পরীক্ষা ও রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার পরীক্ষা	নিউরোব্লাস্টোমা লিউকিমিয়া লিম্ফোমা
চক্ষু পরীক্ষা চোখের কালো অংশটি হঠাৎ করে সাদা হয়ে যাওয়া চোখটি কোটর থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসা হঠাৎ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা চোখে রক্তক্ষরণ	চক্ষু বিশারদের মতামত	ব্রেন টিউমার নিউরোব্লাস্টোমা রেটিনোব্লাস্টোমা রাবডোমায়োসারকোমা

লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা

সামগ্রিক শৈশব ম্যালিগন্যান্সির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা। শিশু ক্যান্সারের মধ্যে সর্বাধিক। সেইজন্যে এই ক্যান্সারের একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। লিউকিমিয়ার মধ্যে আবার অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকিমিয়া, অ্যাকিউট মাইলোব্লাস্টিক লিউকিমিয়ার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি।

শৈশবকালীন লিউকিমিয়ার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক দশক জুড়ে লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমার বাড়বাড়ন্ত। এখানে বিজ্ঞানভিত্তিক কয়েকটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা হল-

মার্কিন দেশে ২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা ক্যান্সারের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১ শতাংশ। ১৯৭৫ সালে প্রতি মিলিয়নে যেখানে ২৫ টি কেস পাওয়া যেত, সেখানে ২০১৫ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি মিলিয়নে ৪১ টি।

৬৩টি ইউরোপীয় জনসংখ্যা-ভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা আক্রান্তর সংখ্যা ১৯৭০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেনের একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে লিউকিমিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রতি মিলিয়নে ৩৮ থেকে বেড়ে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বেড়ে ৪৬ হয়েছে।

কাদের মধ্যে লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা হওয়ার প্রবণতা বেশি?

লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা আক্রান্ত হওয়ার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে কিছুক্ষেত্রে পরিবেশগত বা জিনগত কিছু কারণ থাকতে পারে।

স্ক্যান্ডানেভিয়ান দেশে, কিছু গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, শিশুদের জন্মের ওজনের সঙ্গে লিউকিমিয়া রোগের সম্পর্ক রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশি ওজনের শিশুদের এই রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আরেকটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, একই ভ্রূণ থেকে জন্মানো যমজ শিশুর একজন যদি লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত হয়, তবে অপরজনেরও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্য একটি সাধারণ শিশুর তুলনায় অনেক বেশি।

কিছু জেনেটিক সিন্ড্রোম (যেমন, ডাউন সিনড্রোম, নিউরোফাইব্রোমাটোসিস টাইপ ১, ব্লুম সিনড্রোম, অ্যাটাক্সিয়া-টেলাঞ্জিয়েক্টাসিয়া) আক্রান্ত শিশুদের লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমার উপসর্গ

লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা সংক্রান্ত অধিকাংশ উপসর্গগুলিই অনির্দিষ্ট এবং সাধারণ অসুখ বিসুখের উপসর্গ থেকে তাদের পৃথক করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। ৩৩টি গবেষণায় ৩০০০ এর বেশি শিশুদের নিয়ে একটি মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে শৈশবকালীন লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত অর্ধেকেরও বেশি শিশুর রোগ নির্ণয়ের সময়ে নিম্নলিখিত পাঁচটি উপসর্গের মধ্যে অন্তত একটি অবশ্যই উপস্থিত: বড় লিভার,বড় প্লীহা, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া বা রক্তাল্পতা, জ্বর, বা সহজ রক্তক্ষরণ। ৬ শতাংশ শিশু রোগ নির্ণয়ের সময় প্রায় উপসর্গহীন ছিল।

রোগ নির্ণয়ের সময়ে লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমার ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি যে উপসর্গগুলি দেখা যায়, সেগুলি হল-

লিউকিমিয়া আক্রান্ত শিশুদের বেশিরভাগই বড় লিভার (৬৪%) বা বড় প্লীহা (৬১%) হল রোগের প্রথম সূত্র। শরীরের এইসব অঙ্গবৃদ্ধির লক্ষণগুলি হল-ক্ষিদে কমে যাওয়া,ওজন কমে যাওয়া, পেট ফুলে যাওয়া এবং পেটে ব্যথা হওয়া।

লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা আক্রান্ত শিশুদের অর্ধেকই আসে গাঁট ফোলা বা বড় হয়ে যাওয়া লিম্ফ গ্ল্যান্ড নিয়ে।

অর্ধেকেরও বেশি শিশু ভর্তি হয় জ্বর নিয়ে। জ্বর হতে পারে, সংক্রমণের জন্য বা লিউকিমিয়া রোগটারই জন্য।

রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা রোগের একটি অন্যতম প্রধান উপসর্গ। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শিশুর গায়ে কালশিটে পড়া দাগ আর তিন চতুর্থাংশের বেশির প্লেটলেটের সংখ্যা এক লাখের কম থাকে। রক্তাল্পতা ও হাঁপিয়ে যাওয়া লক্ষণটিও প্রায় পঞ্চাশ ভাগ রোগাক্রান্ত শিশুদের উপসর্গ। আর শ্বেতকণিকার সংখ্যা শতকরা ২০ জনের ক্ষেত্রে ৫০০০০ এর বেশি আর অর্ধেকের ক্ষেত্রে ১০০০০ এর নিচে।

লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা রোগাক্রান্ত শিশুদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হচ্ছে পায়ে এবং শরীরে ব্যথা। ব্যথার তীব্রতা এতই বেশি থাকে যে সাধারণ ব্যথার ওষুধে তার উপশম হয় না। এই উপসর্গ শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ রুগির ক্ষেত্রে দেখা যায়।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-

লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমার জন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ রক্তের গণনা (CBC) এবং ডিফারেনশিয়াল কাউন্ট, পেরিফেরাল স্মিয়ারের পর্যালোচনা, এবং অস্থি মজ্জা পরীক্ষা। যখন লিম্ফ নোড আকারে বড় হয়ে যায়, তখন প্রয়োজনমত একটি সন্দেহজনক লিম্ফ নোডের পরীক্ষা করা যেতে পারে। এটি দু'ভাবে করা যায়, একটি ফাইন নিডল অ্যাস্পিরেশন বা সূচ্যগ্র পরিমাণ টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা বা পুরো লিম্ফ নোডটি পরীক্ষার জন্য অপারেশনের মাধ্যমে বার করে নেওয়া।

কোষের আকার ও প্রকার-নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট আকারের এবং প্রকারের কোষ চেনাটা খুব জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ব্লাস্ট কোষ। লিম্ফয়েড বা মাইলয়েড এর ক্ষেত্রে এই ব্লাস্ট কোষের চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু নির্দিষ্ট।

সাইটোকেমিস্ট্রি বা কোষ-রসায়ন-লিউকিমিয়া সন্দেহ হলে, সাইটোকেমিক্যাল স্টাডিজের কিছু মূল্য আছে, কিন্তু লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য এটির বাধ্যবাধকতা নেই। লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমার সাথে সম্পর্কিত সাইটোকেমিক্যাল উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে-

পিরিওডিক অ্যাসিড শিফ-লিম্ফোব্লাস্টিক কোষের জন্য নির্দিষ্ট।

নন স্পেসিফিক এস্টারেজ এবং মাইলোপেরক্সিডেজ-

ফ্লো-সাইটোমেট্রি / ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি-এই পদ্ধতিতে লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমা কোষের ইমিউন চরিত্র বা অ্যান্টিজেন নির্ণয় করা যায়। যেমন-

- লিম্ফয়েড অ্যান্টিজেন
- মাইলয়েড অ্যান্টিজেন
- ম্যাচুরেশনাল অ্যান্টিজেন

সাইটোজেনেটিক্স বা মলিকুলার চরিত্র- রোগ নির্ণয়ের জন্য সাইটোজেনেটিক্স এবং মলিকুলার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রয়োজন নেই। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বা WHO সমস্ত লিউকিমিয়া ও লিম্ফোমার শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে এটিকে একটি অপরিহার্য মানদণ্ড বলে নির্দিষ্ট করেছেন।

ভারতের শিশুদের ক্যান্সারের অবস্থা

উচ্চ আয় গোষ্ঠীর দেশগুলিতে, ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের প্রায় আশি শতাংশই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। অথচ দেখুন, সমগ্র বিশ্বের শতকরা নব্বই ভাগ শিশুর বাস এই মধ্য এবং নিম্ন আয় গোষ্ঠীর দেশগুলিতে। আর শিশু ক্যান্সারের প্রায় আশি শতাংশেরই বাস এইসব দেশে। আর ভারত কিন্তু এই নিম্ন এবং মধ্য আয় গোষ্ঠীর দেশগুলিরই একটি। অসম স্বাস্থ্য পরিষেবা, অপ্রতুল স্বাস্থ্যকর্মী, অসম্পূর্ণ চিকিৎসা, এর ত্রহ্যস্পর্শে, ভারতের মত দেশে শিশু ক্যান্সার রুগিদের পরিণাম খুব আশাপ্রদ এখনই বলা যাবে না।

গত কয়েক দশকে ভারতে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যদি বা সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েও থাকে, রোগ নির্ণয় থেকে রোগ নিরাময় পর্যন্ত,এই

দীর্ঘ পথে এখনও অনেক বাধা রয়েছে। প্রথম সমস্যা হল উপযুক্ত পরিসংখ্যানের অভাব। দেশ জুড়ে শিশুদের ক্যান্সারের সংখ্যা কত, তার প্রকারভেদ, তার চিকিৎসা এবং তাদের পরিণতি –এই নিয়ে কোনো পরিসংখ্যান নেই। দেশের স্বাস্থ্যনীতির সিংহভাগ জুড়েই জনপ্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখে, প্রণয়ন করা হয়। ফলতঃ শিশু ক্যান্সারের তুলনায়, টিকাকরণ, শিশু এবং মাতৃস্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি প্রাধান্য পায় বেশি। অসাংগঠনিক সূত্র (জনসংখ্যা ভিত্তিক ক্যান্সার পরিসংখ্যান বা হাসপাতাল ভিত্তিক ক্যান্সার পরিসংখ্যান) থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে মোট ক্যান্সার রুগির ০.৭ থেকে ৪.৪ শতাংশ শিশু ক্যান্সার আক্রান্ত। পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায় যে ভারতে দিল্লিতে সর্বাধিক শিশু ক্যান্সারের সংখ্যা আর তার পরেই চেন্নাই। খুব সম্ভবতঃ এই দুটি জায়গায় শিশু ক্যান্সার চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত হওয়ায়, এখানে এই সংখ্যাধিক্য। শিশু ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও লিঙ্গবৈষম্য দর্শনীয়। আমাদের দেশে যেখানে বালক বালিকার ক্যান্সার আক্রান্তের আনুপাতিক হার ১.৫, উচ্চ আয় গোষ্ঠীর দেশগুলিতে এই অনুপাতটি প্রায় ১.১। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দেশে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মেয়েরা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিস্তর পিছিয়ে আছে। পরিসংখ্যানে এও দেখা গেছে যে, ভারতে লিউকিমিয়া এবং স্নায়ুযন্ত্রের ক্যান্সার অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় যথেষ্টই কম। এরকমটি কিন্তু হওয়ার কথা নয়। কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই শিশুদের ক্ষেত্রে এই দুটি ক্যান্সারের বাড় বাড়ন্ত। কারণ খুব সম্ভবতঃ বড়সংখ্যক শিশুদের রোগ ঠিকমত নির্ণয়ই হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় হল, যদিও শতকরা প্রায় ৮২.৫ জন শিশু মৃত্যুর ঠিক আগেই হাসপাতালে পৌঁছায়। তাদের শারীরিক অবস্থা এমনই থাকে যে মাত্রই ৪ থেকে ৫ শতাংশ শিশুকে ক্যান্সারের উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়।

তবে এই সমস্যা সমাধানের উপায়?

ভারতে শিশু ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ে সমস্যা, তার কারণাবলী এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়

সমস্যা	কারণ	সম্ভাব্য সমাধান
১-রোগনির্ণয়ের সমস্যা		
বিলম্বিত স্বাস্থ্য পরিষেবা	স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বল্পজ্ঞান অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি অমিল স্বাস্থ্য পরিষেবা শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লিঙ্গ বৈষম্য	শিশু ক্যান্সার নিয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক স্বাস্থ্যব্যস্থায় ক্যান্সার চিকিৎসার অন্তর্ভুক্তি। বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনা।
রোগনির্ণয়ে বিলম্ব	রোগ নির্ণয়কারী বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব উপযুক্ত ল্যাবরেটরি এবং যন্ত্রানুষঙ্গের অভাব।	স্বাস্থ্য কর্মীদের উপযুক্ত ও সঠিক প্রশিক্ষণ। প্রাথমিক ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে শিশু ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত করে তোলা।
২-চিকিৎসাজনিত সমস্যা		
চিকিৎসায় অনীহা এবং মাঝপথে চিকিৎসা পরিত্যাগ	ক্যান্সার চিকিৎসার ফলপ্রসূতা নিয়ে সংশয় এবং ভ্রান্ত ধারণা অর্থকরী সমস্যা পরিষেবায় অসন্তুষ্টি বেদনাদায়ক বা আগ্রাসী চিকিৎসায় অস্বীকার।	চিকিৎসা পূর্ববর্তী আলোচনা ও ফলাফল বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসা পূর্ণ করার উপকারিতার ব্যাখ্যা। টেলিফোনের সাহায্যে রুগির সাথে যোগাযোগ রাখা, যাতে সে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে পারে।
চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	দূর্বল পরিষেবা, ব্লাড ব্যাঙ্কের অভাব ও রক্তদানের অসুবিধা। অপুষ্টি সংক্রমণের সম্ভাবনা।	শিশু ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য এক সার্বিক পরিষেবা গড়ে তোলা, যেখানে অর্থকরী সাহায্য, থাকার জায়গা, পুষ্টি এবং ব্লাড ব্যাঙ্কের সুবিধা পাওয়া যাবে।
অসম্পূর্ণ পরিষেবা	বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ওষুধের অভাব প্রান্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শল্যচিকিৎসার অপ্রতুল পরিষেবা।	শিশু ক্যান্সারের সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো।

ভারতে শিশুদের বিভিন্ন রকম ক্যান্সার চিকিৎসার সমস্যা ও তার সমাধানের সম্ভাব্য সূত্র

শৈশব ক্যান্সার	উচ্চ আয় গোষ্ঠীর দেশগুলির তুলনায় রোগের প্রকারভেদ	উচ্চ আয় গোষ্ঠীর দেশগুলির তুলনায় রোগের পরিণতি	চিকিৎসার সমস্যা

লিউকিমিয়া	দেরিতে রোগনির্ণয় সাইটোজেনেটিক্স গত ভাবে খারাপ	সামগ্রিকভাবে বেঁচে থাকার হার ৪৫-৮১% যেখানে অন্য দেশে ৯০%	রোগ নির্ণয়ের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব। ওষুধের প্রতিক্রিয়া, খরচ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অপূর্ণ চিকিৎসা।
লিম্ফোমা	কম বয়সে রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রকারভেদে খারাপ, দেরিতে রোগনির্ণয়	বেঁচে থাকার হার অন্যান্য দেশের (৯৮%) তুলনায় কম(৯০%)	আমাদের দেশে টিবি রোগের সঙ্গে উপসর্গের মিল থাকার জন্য ও অকারণে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খাওয়ানোর জন্য দেরিতে চিকিৎসা।
ব্রেন বা অন্যান্য স্নায়ু জাত ক্যান্সার	অন্যান্য দেশের তুলনায় ৫০ শতাংশ। দেরিতে রোগ নির্ণয়।	পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রুগিদের মৃত্যুহার প্রায় ১৫.৩%	স্ক্যান ও অন্যান্য পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতা, বিশেজ্ঞ চিকিৎসক ও সার্জেনের ঘাটতি এবং সমন্বয়ের অভাব।
রেটিনোব্লাস্টোমা	দেরিতে রোগ নির্ণয়। প্রায় ৪০ % রুগি চোখের বাইরের উপসর্গ নিয়ে আসে	বেঁচে থাকার হার অন্যান্য দেশের (৯৫%) তুলনায় কম(৬৩-৯২%)	চিকিৎসা মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার শতকরা হার ৫০। মূল চক্ষু অপারেশনের আগেই চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া।

গত কয়েক দশকের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের পথ-

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি স্থাপন—

ভারতে পেডিয়াট্রিক অনকোলজি পরিষেবাগুলি ১৯৮০-র দশকে একদম আনকোরা অবস্থায় এবং শহর কেন্দ্রিক ছিল। পেডিয়াট্রিক অনকোলজিতে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফেলোশিপ এবং সাবস্পেশালিটি ডিগ্রি কোর্স গত দশকে পেডিয়াট্রিক অনকোলজির চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি এবং বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করেছে।

শহর থেকে শহরতলি এবং গ্রামে গঞ্জেও পরিষেবাগুলি ছড়িয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে অভিন্ন চিকিৎসা বিধি বা প্রোটোকল তৈরি করা।

অভিন্ন MCP-841 প্রোটোকল লাগু হওয়ার ফলে, অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকিমিয়া রুগিদের বেঁচে থাকার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা যেমন Indian Collaborative Childhood Leukaemia group বা শিশু চিকিৎসকদের জাতীয় সংস্থা Indian Academy of Pediatrics এর Hematology and Oncology বিভাগ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর্থিক সহায়তা এবং সামগ্রিক যত্ন

সরকারি এবং বেসরকারি জনহিতকর বিভিন্ন রকম কর্মসূচি, যা শিশু ক্যান্সারাক্রান্তদের সামগ্রিক পরিষেবা প্রদান করছে। ক্যান্সারের চিকিৎসায় অত্যধিক খরচ, চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এক অন্তরায়। সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বিমা প্রকল্পের সাহায্যে, আর্থিক সুবিধা হওয়াতে, শিশুরা অনেকক্ষেত্রেই চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে পারছে।

ভবিষ্যতের পথ—

ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং চিকিৎসা পরিত্যাগ:

চিকিৎসা পরিষেবা এবং পরিকাঠামো এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যে ক্যান্সারের চিকিৎসা তো বটেই, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক চিকিৎসা যেমন পুষ্টি বা সংক্রমণের চিকিৎসা করা যাবে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অভিভাবকদের সচেতন করাটাও জরুরি।

উন্নত মানের তথ্য বা ডেটা সংগ্রহ পদ্ধতি:

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ দ্বারা ন্যাশনাল ক্যান্সার রেজিস্ট্রি প্রোগ্রাম (NCRP) এর সূচনার মাধ্যমে ১৯৬১ সালে ক্যান্সার রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছিল। ১৯৮২ সালে PBCR (Population based cancer research) এবং HBCR (Hospital based cancer research) প্রসারিত হয়েছিল। জনসংখ্যা এবং এইচবিসিআরগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন এনসিআরপি নেটওয়ার্কে ৩৮টি পিবিসিআর এবং ১৮৯টি এইচবিসিআর রয়েছে।

দ্রুত রোগনির্ণয় এবং সঠিক চিকিৎসার দিশা দেখানো।

শৈশব ক্যান্সারকে আগে থেকে প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব। তাই দ্রুত রোগ নির্ণয় করাটা খুবই জরুরি। আর এই রোগ নির্ণয়ের জন্য সমাজের বিভিন্নরকম স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়াটাও প্রয়োজন। যত বেশি সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী এই রোগের বিষয়ে জানবেন তত দ্রুত এই রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়বে।

লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা

সরকারি স্তরে বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য। মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনেরও প্রয়োজনীয়তা

রয়েছে। তবেই এ দেশের মেয়েরা অন্যান্য চিকিৎসার মত ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ছেলেদের সঙ্গে একই সুযোগ সুবিধে ও পরিষেবা ভোগ করতে পারবে।

তথ্যসূত্র

- Overview of common presenting signs and symptoms of childhood cancer. AUTHOR: Daniel S Wechsler MD PhD, SECTION EDITOR: Alberto S Pappo MD, DEPUTY EDITOR: Sonali M Shah, MD-UPTODATE
- Overview of the clinical presentation and diagnosis of acute lymphoblastic leukemia/lymphoma in children AUTHORS: Terzah M Horton MD PhD, Jon C Aster MD PhD, SECTION EDITOR: Julie R Park MD, DEPUTY EDITOR: Alan G Rosmarin, MD, -UPTODATE
- Childhood Cancer in India; Shuvadeep Ganguly, Sally Kinsey, Sameer Bakhshi. a) Department of Medical Oncology, IRCH, AIIMS, New Delhi, India. b) Department of Paediatric Haematology, University of Leeds. c) Honorary Consultant Paediatric Haematologist, Leeds Teaching Hospitals Trust, Leeds, UK.

Few words on Universal Health Coverage (UHC)

Barun Kanjilal

[Excerpt from an interview of Prof. Barun Kanjilal, Eminent Professor of Health Economics. Compilation: Dr. Manoj Ghosh]

Q: What is UHC? Your perspective. Why is it essential?

BK: WHO definition of health is universal. UHC is to ensure that all people no matter who they are, where they live, they get equality of health service, whenever they need it without any incoming financial hardship. So basically it is an idealistic goal that everybody wants to achieve. All of us, anybody who needs healthcare, receives healthcare according to the need, probably with a payment but that won't cause financial stress. So it is a beautiful world if we achieve that. WHO started with a famous cube, 3 dimensions: % of people covered, service covered, % financial risk protection. Maximum number of people will be covered, max number of diseases or health issues will be covered, nobody will suffer from any substantial financial problem for that. This is the cube. It is like a room. Room is like a cube. Now your healthcare system is like a small suitcase in this room. This suitcase is also a cube, and we are expecting this small cube to increase in length, width and height. And ultimately it will touch the dimensions of the room. And when it reaches the room, that is our ultimate goal. Practically it'll never touch. It'll never reach that stage because not only the suitcase is expanding, so does the room. More people are coming, more needs are there, so more people are needed to be saved from financial stress. So, it's a dynamic process. The small box is expanding to become equivalent to the room but it'll never happen.

Why it is Essential? Well, one might think and link it to health just because the word health is there. But it is essential not only for health. But actually in a wider context, if you look at the two main problems: inequity and poverty. UHC is a step in a wider context. To fight against poverty and inequity. And if you look at the Sustainable Development Goals (SDG) (2015), there are 17 goals. One of the goals: SDG 3 is basically for Good Health and Wellbeing. One can argue that attainment and maintenance of UHC is key to achieve all of the 17 goals. It is basically valid and a need. For that it requires a fundamental sheet, how we think and how we define, and how we provide healthcare. Just you have to shift, you know, from that very disease specific, very much target oriented approach, number centric approach to more comprehensive people oriented approach.

Q: True sir, The way you are explaining …… people especially who are new to public health…We need to reach the underserved population… villages, rural areas, tribal areas. There are areas where people have not seen healthcare centers.

Some countries like Thailand have achieved UHC, I have read. So as per you, your perspective of what kind of financial model that Thailand is having India is not having, how we can go for that?

BK: Well, you know, as I have said UHC is not a financial model but a new paradigm as I have said.

Q: Yes sir.

BK: It is not only about financing, but also planning, delivery, provisioning everything in a model. So it's in a sense, be it Thailand, be India, or any other country model, the end point is of course the UHC type situation. The difference between these countries or models is what you are following to achieve UHC goals. Universally there are 4 types of models to achieve UHC. UHC is not a model. One model is like in the USA, entrepreneurship where the market is the key player. Second model is the NHS model like in the UK, Spain, Sri Lanka and most of the countries: where services are tax financed. Mandatory insurance models are also there like German, France etc. mainly social insurance follows. For them insurance is mandatory. And then like our country's mixed model, neither here, nor there. The uniqueness of UHC is that: it is the first time that financial hardship is being officially acknowledged since the Alma-Ata declaration, Health for All. It never said to achieve health for All what finance model or challenge you will face. But UHC is basically focusing on that. At the same it is also not telling you like, see it is a never ending process. You cannot reach an endpoint here, because there's none. It is not a one time thing. It's not like you have done, and that set. It is not so. And finance will flow for primary and comprehensive care, most of the time.

Going back to your question. It was 2002-2003. They started giving promises. They understood health is an issue. So, they announced that everybody will get health care. This is called the thirty baht scheme. Baht, currency, per head 30 baht, and you will get cure/treatment of all diseases, kind of a thing. Initially, it was thought it would come via insurance. But when they announced it for political reasons, they realized that within such a short span of time we wouldn't be able to organize that. So then they ultimately chose the Govt finance route. The Govt. will fund everything.

সবচাইতে বেশি যক্ষ্মা রোগী ভারতে

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২২-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯২টি দেশের ৭৫ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত
- যার মধ্যে ২৮.২ লক্ষ (১৭ শতাংশ) রোগীই ভারতের
- মোট ৮৭ শতাংশ রোগীই ৩০টি দেশের। যার মধ্যে ভারতের পরেঃ ইন্দোনেশিয়া (১০ শতাংশ), চিন (৭.১ শতাংশ) ফিলিপিনস (৭ শতাংশ), পাকিস্তান (৫.৭ শতাংশ), নাইজেরিয়া (৪.৫ শতাংশ), বাংলাদেশ (৩.৬ শতাংশ) এবং কঙ্গো (৩ শতাংশ)

ভারতের আর্থিক উন্নতি

''মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) নিরিখে ভারত দুনিয়ার পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে বলে ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে দেশের যে সব মানুষের আয় বাড়েনি, অনেকক্ষেত্রে কমেছে, তাঁরাও গর্বিত হচ্ছেন। অথচ মাথাপিছু আয়ে গোটা দুনিয়ার মধ্যে ভারতের স্থান ১৪০। কোভিডের আগে থেকেই আয়বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত ভোগ ব্যয় কমেছে। বেকারত্ব মাঝে মধ্যেই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।...''

—রঘুরাম রাজন

বাগদিদের স্থান

পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজবংশী ও নমশূদ্রদের পরেই বাগদিদের স্থান (২০১১ সেনসাস অনুযায়ী ৩১ লক্ষ)। শিক্ষার হার মাত্র ৬১%, বেশির ভাগই গরীব ভূমিহীন ক্ষেতমজুর (৫৮%)। ব্রিটিশ সরকারের ১৮৭১এর ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট এবং ভারত সরকারের ২০১৭-র ইদাতে কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের বহন করতে হচ্ছে অপরাধী জাতির তকমা।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

সাম্প্রতিক তিস্তার ভয়াবহ রূপ... উপত্যকাবাসী দেখেছেন...

রাজা রাউত

গত ৩ অক্টোবর ২০২৩ .. রাত থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৩ বুধবার সকাল পর্যন্ত প্রায় আট ঘন্টায় মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটে। এই স্বল্প সময়ে উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদের উপর মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিপাতের ঘটনাটি ঘটে। এতে ওই সময়ে ৪০.৯ মিমি. বৃষ্টিপাত হয়। যেখানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হল ৮.৬ মিমি.। স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি। বৃষ্টিপাতের জলের চাপে লোনাক হ্রদের জমা হিমবাহ ভেঙ্গে পরে নিম্নবর্তী ১৫ ফুট নিচে অবস্থিত চুংথাম জলাধারে। যা ছিল এই জলাধারের ধারণ ক্ষমতার বাইরে।

চুংথাম জলাধারের বাঁধ ভেঙ্গে নিম্নবর্তী চুংথাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্থ করে প্রবল বেগে জল নামতে থাকে তিস্তা নদীতে। এর ফলে তিস্তা নদীর জলস্তর ১৫-২০ ফুট উচ্চতা বেড়ে যায় এবং হরপা বান রূপে পাহাড়ি খাত বরাবর তির বেগে সব কিছু ধুয়ে-মুছে নিম্ন দিকে নামতে থাকে।

যার ফলে তিস্তা নদীর দুই তীর বরাবর ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয় এই মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিতে হড়পা বান তৈরি হয়ে। লোনাক হ্রদের আয়তনের চেয়ে জলের পরিমাণ তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যায়। এরপর চুংথাম জলাধার ভেঙ্গে যায়। সিংতামের কাছে বারডাংয়ে সেনাবাহিনীর ব্যারাক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২৩ জন সেনা নিখোঁজ হয়।

সেনাবাহিনীর গাড়ি, গোলা বারুদ, সরঞ্জাম ভেসে যায়। তিস্তা বরাবর আনুমানিক ১১টা সেতু ভেসে যায়।

দশ নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশ নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় ২৫০০০ মানুষের বাড়িঘর ভেঙ্গে যায়।

প্রায় ৩০০০ পর্যটক বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়েন। রাত্রি ২টায় হড়পা বানের ঘটনাটি ঘটায় লোকজন ঘুমের মধ্যেই দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ভেসে যান। ৬২ জন নিখোঁজ এবং নিহত হন ৫৬জন। সিকিম ও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পর্যটন শিল্প পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

বিপর্যয়ের কারণ :

আমরা যদি এই বিপর্যয়ের সঠিক কারণ অনুসন্ধান করতে চাই তাহলে বুঝতে হবে যে এই বিপর্যয়ের বীজ বহু আগেই বপন করা হয়েছিল তথাকথিত উন্নয়নের নামে। ২০১৩ সালে হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারের আবহ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন যে লোনাক হ্রদ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উপযুক্ত পদক্ষেপ করার জন্য সতর্ক করেছিলেন।

২০১৯ সালে বেঙ্গালুরুর আই আই এস এর হ্রদ বিজ্ঞানীরাও সাবধানী বার্তা দিয়ে জানিয়েছিলেন হিমবাহের গলনের ফলে বছর বছর জলের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে দ্রুত হারে বাড়ছে যা হ্রদের জল ধারণ ক্ষমতার বাইরে।

পার্বত্য অঞ্চলে মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটেই থাকে। আমরা যতই বলি কিংবা সরকারি বিবৃতি যাইহোক না কেন এবারের এই বিপর্যয়ের পিছনে প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষের তথাকথিত উন্নয়ন যুক্ত রয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং পরিবেশ দূষণের প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র পড়ে। ভারত ও চিন দুটি নব্য শিল্পোন্নত রাষ্ট্র। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের দুটি দেশই অগ্রগণ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই পড়ে। সিকিম রাজ্যটি ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে চিন সীমান্তে অবস্থিত। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণের প্রভাব এই পার্বত্য রাজ্যটির জলবায়ুতে পড়েছে। পার্বত্য উপত্যকায় মেঘের প্রবল জলীয় বাষ্প আনয়ন এবং দ্রুত ঘনীভবনের মাধ্যমে এই মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। সিকিম রাজ্যটি নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা হিমালয়ের কোলে অবস্থিত হওয়ায় নরম এবং ভঙ্গুর মৃত্তিকা স্তর দ্রুত ক্ষয় হয়ে কাদার ধসে পরিণত হয়েছে। হিমালয়ের কোলে যে স্থানে সিকিম অবস্থিত

সেটা তীব্র ভূমিকম্প প্রবল অঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়া নব্য ভঙ্গিল পর্বত হিমালয়ের গঠন প্রক্রিয়া এখনো শেষ না হওয়ায় অঞ্চলটি এখনো স্থির হয়নি। বলাবাহুল্য অস্থির অবস্থায় রয়েছে।

এছাড়া এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে মানুষের কার্যকলাপ। এই অস্থির অঞ্চলে চলছে নানা নির্মাণের কাজ। এই অঞ্চলে তিস্তার উপর চলছে অসংখ্য নদীবাঁধ, জলাধার, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তালা। ২০০০ সাল থেকে জলাধার, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ২০০৪ সালে তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্টেজের প্রায় ৪৭টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এর মধ্যে ৯টির কাজ সম্পন্ন হয়ে চালু হয়ে গেছে, এখনো ১৫টির কাজ চলছে।

সিকিমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে অসংখ্য বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, রেললাইন গড়ে তোলা হচ্ছে পাহাড় কেটে। পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্যও চলছে বনভূমি ও পাহাড় কেটে হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, মোটেল,

হোম স্টে গড়ে তোলার কাজ। নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে সেনার সুবিধার্থে তৈরি চলছে বিরাট চওড়া সড়ক পথ ও পাহাড় কেটে টানেল নির্মাণ।

তাহলে কি করণীয়:

সাধারণত মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া এখনো সম্ভব নয় তাই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেতে পারে। এর জন্য উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার ব্যবস্থা করা। মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিপাত সম্ভাবনাময় অঞ্চল এবং তার প্রভাবিত অঞ্চলগুলির চিহ্নিতকরণ।

পার্বত্য অঞ্চলে বসতি, রাস্তাঘাট তৈরির স্থান সঠিক বিবেচনার মাধ্যমে নির্বাচন করা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্মাণ করা পরিবেশের কথা মাথায় রেখে।

পার্বত্য অঞ্চলে জল নির্গমন প্রণালী, ঝোরা সমূহকে সংস্কার করা।

পার্বত্য অঞ্চলে নির্মাণ কাজে বিস্ফোরক ব্যবহারের পরিবর্তে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া।

পার্বত্য অঞ্চলে যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা ফেলার জন্য ডাম্পিং স্থল না তৈরি করা। নির্দিষ্ট স্থানে নোংরা আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

পার্বত্য অঞ্চলে পারত পক্ষে জলাধার তৈরি না করা। যদি করতেই হয় তাহলে বড় বড় জলাধার তৈরি না করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার তৈরি করা। বড় বড় জলাধার গুলোকে ভেঙে ফেলা।

পার্বত্য অঞ্চলের যত্রতত্র হোটেল, রেঁস্তোরা, মোটেল, হোম স্টে স্থাপন না করা।

বিপর্যয় মোকাবিলা করার দল গঠন করা স্থানীয় পর্যায়ে।

পার্বত্য অঞ্চলের বিপর্যয় বিষয়ে স্থানীয়লোকদের মতামত নেওয়া ও নিয়মিত তাদের সচেতন করা।

স্থানীয় আক্রান্ত মানুষদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

বিপর্যয়ের সময় খাবার, জল, বাসস্থান, অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং ওষুধের ব্যবস্থা রাখা।

বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন ও কাজের ব্যবস্থা করা।

সম্ভাবনাময় স্থানীয় সকলের জন্য বিপর্যয় বিমা চালু করা।

বাঁধ, জলাধার, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রেললাইনের মত বড় বড় প্রকল্প তৈরি করার ক্ষেত্রে পরিবেশবিদ, ভূ-তত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদদের সামাজিক কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ। আধিকারিকদের চাইতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত বেশি গুরুত্ব দেওয়া।

নদীকে নদীর মত বইতে দিতে হবে তাহলেই বোধহয় এই বিপর্যয় গুলো রোখা সম্ভব।

ড. রাধেলাল হরেলাল রিচারিয়া: এক ভুলে যাওয়া বিজ্ঞানীর কথা

অনুপম পাল

জন্ম ও শিক্ষা

প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ড. রাধেলাল হরেলাল রিচারিয়ার (১৯০৯-'৯৬) কথা আমরা জানি না বললেই চলে। প্রচার মাধ্যমে আমরা ড. স্বামীনাথনের নাম খুব শুনেছি। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও তাঁর নাম আছে সবুজ বিপ্লবের মূল কারিগর হিসাবে। কিন্তু ড. রাধেলাল হরেলাল রিচারিয়ার কথা! বিশ্বে এত বড় মাপের ধান বিজ্ঞানী নেই। কিন্তু আমরা তাঁর কথা ভুলে গিয়েছি। দুঃখের বিষয় কৃষির মূল ধারায় তাঁর গবেষণার কথা আলোচনার মধ্যে আসে না। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনেও তাঁর কোন উল্লেখ নেই। ১৯০৯ সালে মধ্যপ্রদেশের হৌসাঙ্গাবাদ জেলার সেওনি মালওয়া মহকুমার নন্দনভারা গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবা স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন সবজি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। কিশোর রাধেলাল বাবার সঙ্গে কাজ করে উৎসাহ পেতেন। আদিবাসীরা যখন তাঁর বাবার সঙ্গে গাছপালার গল্প করতেন কিশোর রাধেলাল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁদের প্রজ্ঞার কথা অনুভব করার চেষ্টা করতেন। পড়াশোনা শুরু হয়েছিল তাঁর গ্রামে; তারপরে বালাঘাট সেখান থেকে বারানসী। পরে নাগপুর থেকে উদ্ভিদ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আই সি এস পরীক্ষার বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব ছেড়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি করতে চলে যান অধ্যাপক হাডসনের কাছে। তাঁর মাস্টারমশাই বলেছিলেন "আসল কাজ তখনই হয় যদি গবেষণার কাজ কৃষকদের কাজে লাগে"।

কর্মজীবন ও প্রাথমিক গবেষণা

১৯৩১ সালে দেশে ফিরে তিনি নাগপুরের তৈলবীজ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে ১৯৪২ সাল থেকে বিহারের সাবুরের কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন দীর্ঘ ১৭ বছর। ওই সময় তিনি তিসির তন্তু নিষ্কাষণের সঠিক পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন। তিসির তন্তুই এখনকার দিনের মহার্ঘ লিনেন তন্তু। তখনও গরমকালে আরামদায়ক বস্ত্র হিসেবে লিনেন চালু ছিল।

গান্ধীজি লিনেন তন্তুর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বিহার চরকা সংঘকে ওই কাজ করতে বলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি কটকের সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সি আর আর আই) অধিকর্তা পদে আসীন হন। সেখানে তিনি জাপানি বেঁটে জাতের ধান তাইচুং নেটিভ ওয়ান-এর থেকে কিছু জাত নির্বাচিত করেছিলেন যেগুলো রোগ এবং পোকা সহনশীল। সেই সাথে দেশজ ধানের গবেষণাও শুরু করেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন মধ্যপ্রদেশ কৃষি ধান গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ও মধ্যপ্রদেশের কৃষি উপদেষ্টা।

ধানের ক্লোনাল বংশবৃদ্ধি:

১৯৪২ সালে তিনি ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ থেকে একবারে চারা না করে ধানের পাশকাঠি ভেঙে নিয়ে (ক্লোনাল বংশবৃদ্ধি) চারা রোপণের কাজ করেন। একে বলা যেতে পারে অঙ্গজ জনন। ধানের চারা লাগানোর ২০-২৫ দিন পর পাশকাঠি ছাড়তে শুরু করে। একটা বীজের চারা থেকে কম করে ৩/৪টি পাশকাঠি হয়। ওই পাশকাঠি ভেঙে নিয়ে একটা করে পাশকাঠি আবার জমিতে লাগানো হল এবং ২৫ দিন পর সেখান থেকে পাশকাঠি ভেঙে নিয়ে মূল জমিতে লাগানো হল এবং সঠিক সময়েই ধান লাগানো হল। ধান লাগানোর অন্তত ২ মাস আগে থেকে শুরু করতে হবে চারা তৈরির কাজটা। একটু অসুবিধা হলেও আখেরে লাভ বেশি। এর ফলে জমির ধানের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে, বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং কোন ক্ষেত্রে অন্তত ৭ দিন আগে ধান পাকে। ১০০ গ্রাম ধানের বীজ নিয়ে চারা তৈরির করার পর সেখান থেকে পাশকাঠি ভেঙে নিয়ে ধাপে ধাপে কয়েকবারে এক বিঘা (৩৩ শতক) জমি রোপণ করা সম্ভব হয়। মোটামুটি ভাবে ৪০০০টি মোটা ধানের ওজন ১০০ গ্রাম। ছোট সুগন্ধী ধান হলে ২ বিঘায় হবে। প্রথমে ২/৩টি টবে চারা রোপণ করা হল। এর পর ১৫ দিন পর একটি করে চারা ছোট একটি বীজ তলায় সঠিক ভাবে রোপন করা হল। ২০ দিন পর প্রত্যেকটির তিনটি করে পাশকাঠি হল এবং একটি করে পাশকাঠি চারা নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগানো হল। মোট চারা হল ১২০০০। আবার লাগানোর ২০ দিন পর মোট পাশকাঠি হল (১২০০০ x ৩) ৩৬,০০০টি। আবার ৩৬,০০০ চারা থেকে লাগিয়ে পাশকাঠি পাব ১,০৮,০০০টি। এক বিঘা জমি ১৪,৪০০ বর্গ ফুট। প্রতি বর্গ ফুটে ৪টি করে চারা লাগালে ৫৭,০০০টি চারা লাগবে। চারা বেশি রাখা ভালো। কোন কারণে জমিতে চারা নষ্ট হলে কাজে লাগবে। অন্যদিকে ওই জমিতে চারা লাগানোর পর ৫১,০০০ চারা বাড়তি হবে সেটা দিয়েও এক বিঘার কাছাকাছি জমিতে ধান রোয়া যাবে। ১৯৬২ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা নেচারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র (ইরি) ওই বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পাশকাঠি চারা (ক্লোন) বেশি জল সহ্য করতে পারে। সেই কারণে সুন্দরবনে হঠাৎ বন্যায় ধান নষ্ট হয়ে গেলে বীজ তলার ৪০ দিনের পাশকাঠি ওয়ালা বয়স্ক দেড় ফুট দৈর্ঘ্যের পাশকাঠি চারা আলাদা করে নিয়ে গভীর জলে লাগানো হয় বেশি দূরত্বে। এক কালি চারা রোপণ করা হয় গভীর জলে। একে বলা হয় গুছি ভাঙা বা বোলন (কোচবিহার ও উত্তর ২৪ পরগনা) বা চার আট (হুগলি)। মেঘালয়ে একে বলা হয় চাংগ্নিনি গে অনি। ইংরেজিতে ডাবল ট্রান্সপ্লান্টিং।

ওরাইজা পেরেনিস জংলি প্রজাতির ধানে পাশকাঠির দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয়। জলে, নীচে ধানের কান্ড থাকার কারণে পাশকাঠির গাঁটে আরশিদান স্তর তৈরি হয়। পাতা বা ফুল ঝরার সময় হলে স্বাভাবিক ভাবে এই স্তর তৈরি হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে পাতা বা ফুল ঝরে যায়। এখানেও ধানের পাশকাঠি খসে যায় এবং জলে ভাসতে ভাসতে অন্যত্র উপযুক্ত জায়গায় মাটিতে গজায়। এই ভাবে আমাজন নদীর তীরে অনেক ভাসমান জংলি ধানের দেখা মেলে। দেখা গিয়েছে যত বেশি খসে যাওয়া পাশকাঠি তৈরি করার ক্ষমতা তত বেশি বন্ধা পরাগ তৈরি হয়। বন্ধা পরাগ থাকার কারণে বেশি ইতর পরাগ যোগ হয়। ১৯৫০ সালে ড. রিচারিয়া সাবুরে অবস্থিত বিহার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মুড়ি ধান চিহ্নিত করেছিলেন; অন্ধ্রপ্রদেশের কাসপিচুড়ি ধান কাটার ২ মাস পর মুড়ি ধান থেকে ১ টন প্রতি হেক্টরে ফলন পেয়েছিলেন। ধানের শীষ কেটে নেওয়ার পর আবার গোড়া থেকে পাশকাঠি বের হয়। একে বলা হয় মুড়ি ধান বা রেটুনিং। আখ কেটে নেওয়ার পর আবার গোড়া থেকে মুড়ি আখ বের হয়। বীজ ছাড়া এই রকম বংশবৃদ্ধিকে অঙ্গজ জনন বলা হয়। কটকে ১৯৬২-৬৩ সালে কিচলি সাম্বা ধানে ওই ভাবে ২য় বার ফলন পেয়েছিলেন ১.৮৫ টন প্রতি হেক্টরে। কেরালায় ওরিকোলে ধান কেটে নেওয়ার পর মুড়ি ধান থেকে ৩ বার ফলন পাওয়া যেত, এবং ভাইজাভাতাম ধান ১২ বছর এক জায়গায় এই ভাবে ধান উৎপাদন করতে সক্ষম।

সারা বছর জল থাকে এমন জলাভূমিতে এক জংলি ধান ওরাইজা রুফিপোগনের বীজ তৈরি হয় খুব কম তাই অঙ্গজ জনন বেশি হয়। আবার সারা বছর জল থাকেনা এমন জলাভূমি মানে গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে যায় সেখানে ভালো পরিমাণ বীজ তৈরি হয়, ফুল আগে আসে এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে সহজেই। বহুকাল আগে চিনের জিয়াংক্সিতে শীতের শেষে গ্রীষ্মকালে অগভীর জলা জায়গায় বুনো ধানের পাশকাঠি লাগিয়ে দিয়ে সেখানে ধান ও মাছ উৎপাদিত হত। ধানের ফলন বেশি হত মানে বীজ বেশি হত। পরবর্তী কালে এর থেকেই ধানের চারা রোয়া করার পদ্ধতির জন্ম হয়।

তিনি সতর্ক করেছিলেন রোগ পোকা বাছাই (প্ল্যান্ট কোয়ারেনটাইন) না করে বেঁটে জাপোনিকা ধানের জাত বেশি পরিমাণ এদেশে প্রবেশ করলে জাপোনিকা ধানের বিভিন্ন রোগপোকা এখানকার দেশি ধানে ছড়িয়ে পড়বে। যেমন টুঙ্গরো ভাইরাস। আজকে কিন্তু এমন অনেক রোগ পোকা ধানে এসেছে যেটা আজ থেকে ৬০ বছর আগে ছিল না।

ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও বিজ্ঞান রাজনীতির স্বীকার

তিনি বিশ্বাস করতেন কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্রই পৃথিবীর সব

থেকে বড় এবং সেরা ধান গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সার, বিষ কোম্পানি, ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও কিছু দেশের মিলিত আর্থিক উদ্যোগে ফিলিপাইন্সের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র (আই আর আর আই বা সংক্ষেপে ইরি) স্থাপিত হল। যারা অর্থ বিনিয়োগ করছেন তাঁরা সবাই নিদিষ্ট মুনাফার উদ্দেশ্য নিয়েই করছেন। দানছত্র নয়, কৃষক কল্যাণেও নয়। আমেরিকার নির্দেশ ছিল ভারত সরকার যেন কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে রক ফেলার ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট নামক একটি ব্যক্তিগত সংস্থাকে সহযোগিতা করে যাতে ফিলিপাইন্সে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হয়। ১৯৬০ সালে ফিলিপাইন্সে ইরি তৈরি হওয়ার পর কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্রকে বলা হল সমস্ত কিছু তথ্য ও সংগৃহিত ধান তাদেরকে অর্পণ করতে। আগে থেকেই বলা হচ্ছিল ভারত যেন বেঁটে জাপোনিকা জাতের ধানের সংকরায়নে বেশি কাজ করে, দেশী জাতের নয়। কিন্তু অনেক আগেই কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্র দেশজ উচ্চ ফলনশীল ধান তৈরির কাজে নেমে পড়েছে। সেই গবেষণাকে আন্তর্জাতিক চক্র মানতে রাজি ছিল না। ইতিমধ্যে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্র (স্বাধীন সত্তার) চলে গেল ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের (দিল্লি) আওতায়। তিনি এই ব্যবস্থাতে রাজি ছিলেন না। অন্যদিকে কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ক্রম অনুযায়ী তিনিই ছিলেন সেই সময় সব থেকে বেশি বয়োজ্যেষ্ঠ আধিকারিক (৫৭) এবং হিসেব অনুযায়ী তিনি ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের মহানির্দেশক পদে আসীন হতে সক্ষম। কিন্তু তাঁকে কটকের ওই পদ থেকে অবসর নিতে বলা হয়। যদি তিনি অসময়ে অবসর নিয়ে নেন তাহলে ড. স্বামীনাথন মহাশয় ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ডিরেক্টর জেনারেল পদটি সহজে পেয়ে যাবেন। আর তাঁকে যদি চাকরি থেকে পদচ্যুত করা হয় তাহলে যে কোন ধরনের তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল জাত এখানে তারা চালু করতে পারবে। তিনি ওড়িশা হাইকোর্টে মামলা করেন। কিন্তু মার্কিন প্রভুদের কথায় চালিত কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। তিনি ধীরে ধীরে কপর্দক শূন্য হয়ে পড়েন। তীব্র অর্থ কষ্ট শুরু হল। নানা ধরনের মানসিক নির্যাতন চলে। তাঁর কোয়ার্টারের জলের সংযোগ ও বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে ১৯৬৭ সালে তিনি কটক ছেড়ে চলে যান নিজের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে। কর্তৃপক্ষ ওনাকে বলেছিলেন যদি তিনি এই মামলা তুলে নেন তাহলে তাঁকে ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাজেশনে পাঠানো হবে। তিনি রাজি হন নি। পরবর্তীকালে মামলাতে সরকার পক্ষ বললেন যে তাঁরা ডক্টর রিচারিয়াকে একজন বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন না এই জন্য তাঁরা তাঁকে অবসর নিতে বলেছেন। তিনি অনৈতিক এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও মামলা করে জিতেছিলেন কিন্তু স্বার্থান্বেষী চক্রের জন্য বাস্তবায়ন হয়নি। ভূপালে তাঁর বাসভবনে কাগজপত্র সই করানো হয় এবং তিনি চার্জ হ্যান্ডওভার করেন ড. পদ্মনাভনকে। তিনি বলেছিলেন তিনি একমাস পরে আবার কটকে যোগ দেবেন। কিন্তু ফিরে গিয়ে দেখলেন তাঁর কক্ষ বাইরে থেকে দুটো তালা দেওয়া রয়েছে এবং জানতে পারলেন তাঁর সমস্ত গবেষণার কাগজপত্র কর্তৃপক্ষ হাতিয়ে নিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মানসিক, শারীরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালে তিনি রায়পুরে মধ্যপ্রদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রে (এম পি আর আর ই) অধিকর্তা ও মধ্যপ্রদেশের কৃষি পরামর্শদাতা হিসেবে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে ইরির বড় কর্মকর্তা হয়েছেন ড.স্বামীনাথন মহাশয় এবং তিনি ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, ভারতের বিভিন্ন কৃষি

ড. আর. এইচ. রিচারিয়া

গবেষণা কেন্দ্র, রাজ্যের কৃষি দপ্তর এবং কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রচুর দেশী ধান ফিলিপাইন্সের ধান গবেষণা কেন্দ্রে পাচার করতে সক্ষম হন। পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩৫০০ ধানের জাত ফিলিপাইন্সে পাঠানো হয়েছিল। ইরি থেকেও তাঁর কাছে অনুরোধ আসে তিনি যেন মধ্যপ্রদেশের সমস্ত দেশি ধানের সংগ্রহ দিয়ে দেন। কিন্তু তিনি সেটা করতে রাজি হননি নীতিগত ভাবে। কারণ ইরি, মধ্যপ্রদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র এবং ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদকে কোন অর্থ সাহায্য করেনি। ভারতের এই অমূল্য ধান সম্পদকে তিনি দেশের বাইরে পাঠাতে রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হয়েছিলেন তাঁর নিজের সংকরায়ণ করা কিছু বেঁটে জাতের ধানের বীজ দিতে। বলেছিলেন যদি এই ধানগুলো কৃষকদের কাজে লাগে তাহলে ভালোই হবে এবং গবেষণার ফলাফল যেন ড. রিচারিয়াকে জানানো হয়। সেটা অবশ্য জানানোর প্রয়োজন বোধ করেইনি। ইরির আশংকা ছিল যদি এম পি আর আর ই চালু থাকে তাহলে তিনি দেশজ উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রচার প্রসার করবেন। যাতে রাসায়নিক সার কীটনাশকের ব্যবহার হবে না বললেই চলে। কিন্তু সেটা তথাকথিত আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ এবং ভারতেরও একশ্রেণির চাটুকার কর্মকর্তার পছন্দ ছিল না।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের থেকে বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থ সাহায্যের শর্ত ছিল এম পি আর আর আইকে জব্বলপুরের জহরলাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ওই কেন্দ্রটিও ১৯৭৬ সালে বন্ধ হয়ে গেল। উল্লেখ্য ২০১৮ সালে ইরির এক লিফলেটে দেখা যাচ্ছে তারা এখন দেশি ধানের উপর জোর দিচ্ছেন সেখানে ভারতীয় দেশি ধানের সংগ্রহ হল মাত্র ২৮২৬। অথচ ভারত থেকে অফিসিয়ালি ধান পাঠানোর সংখ্যা ছিল ১৬,০০০।

মধ্যপ্রদেশের গবেষণা

১৯৭১-৭৬ সালের মধ্যে তিনি ছত্তিশগড় থেকে ১৭০০০ দেশী জাত সংগ্রহ করেছিলেন। বারোন্ডা (বিডি) শ্রেণির ৯৬৭টি আধারীয় বীজ ১৭টি জেলায় পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য, প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ছিল ৩.৯৮ টন। সেই সময় মধ্যপ্রদেশে হেক্টর প্রতি ৩.৫ টনের বেশি ফলন হলে উচ্চফলনশীল ধরা হত। সেই হিসেবে ১২১টি জাত গৃহীত হয়েছিল। দেশি ধানের ৯% ছিল উচ্চ ফলনশীল, এছাড়া খরা, স্বল্প মেয়াদী ধান, সুগন্ধী ধান (২৩৭টি), মোটা ধান, সরু ধানও চিহ্নিত করা হয়েছিল। তখন ছত্তিশগড়ে আধুনিক বেঁটে জাতগুলি বিয়াশী পদ্ধতির উপযোগী ছিল না। ওই পদ্ধতিতে আউশের বোনার পর লাঙ্গল চালিয়ে আলুর মত নালা ও ভেলী করা হয়, প্রাক বর্ষার বৃষ্টি নালায় জমা হত। ধানের বৃদ্ধিও ভালো হত। ওই পদ্ধতিতে ধানের ফলন তথাকথিত রাসায়নিক নির্ভর উচ্চ ফলনশীল ধানের থেকে বেশি হত।

১৯৭১ সালে ১৬৪ টি চিহ্নিত জাতের ফলন ছিল প্রতি হেক্টরে ৪ টন। চিনোর এবং ডুবরাজ ধানকে (৪.৯ টন/হেক্টর) বেশি ফলনের ধান হিসেবে মিনিকিট হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল। বেঁটে জাতের কয়েকটি ধান হল বাদলফুল, লালু (৭টন/ হেক্টর), ধউর (৬.১ টন/ হেক্টর), কোয়ালরি (৭.৩ টন/ হেক্টর), রামকারোনি এবং চিকট, কনকচূড়ি ও বাঁশগতি হল খরা সহনশীল ধানা। গাদুর সেলা (বিডি ১১০) ধানের সর্বাধিক ফলন ছিল ৯ টন প্রতি হেক্টরে। পিল্লি লোচাই ৭.৫ টন প্রতি হেক্টরে। ১৯৮৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি পরিকল্পনা করতে বলেছিলেন। ১৯৮৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তা আর বাস্তবায়িত হয় নি। বহু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশের প্রায় ২০০০০ দেশী ধান নিয়ে তিনি একটি এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। স্থানীয় স্তরে কৃষকদের দিয়ে বীজ পরীক্ষা ও উৎপাদনের কথা বলেছিলেন। তিনি ১৫০০ জাত নিয়ে কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন। এখন ইন্দিরা গান্ধী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সংরক্ষণাগারে) তাঁর সংগ্রহের ১২০০০ ধান আছে। গোপনে সেই ধানগুলির পেটেন্ট নিতে চেয়েছিল সিনজেন্টা কোম্পানি। আন্দোলনের চাপে বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রচার চালানো হয়েছিল দেশী ধান মানেই পাকতে সময় বেশি নেয়, ফলন কম এবং নুয়ে পড়ে। মধ্যপ্রদেশে কর্মরত থাকাকালীন ১০০০-এর বেশি ধান নির্বাচিত করে দিয়েছিলেন যে সব ধান পাকবে ৯০ থেকে ১১০ দিনের মধ্যে। প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রায় ১০টি দেশী ধানের জাত নির্বাচিত করেছিলেন যাদের ফলন হেক্টরে ৪ টন থেকে ৭ টন। বহুজাতিকের চাপে সেই সব ধানের বিভিন্ন রাজ্য ভিত্তিক ট্রায়াল হল না। এর থেকে কৃষকদের চাষের খরচ কমুক, পরিবেশ ও মাটি ভালো থাকুক সেটা বোধহয় নীতি নির্ধারকদের পছন্দ নয়। তিনি বলেছিলেন শুধু ধানের ফলনের কথা বললে চলবে না, অন্য চরিত্রের কথা- আঞ্চলিক আবহাওয়াকে মনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, সুগন্ধ ও ভাতের গুণমানের কথাও ভাবতে হবে।

ড. রিচারিয়ার নির্বাচিত কিছু উচ্চ ফলনশীল দেশী ধান ও ফলন (এক কালি চারা রোপণ পদ্ধতি)

ক্রমিক সংখ্যা	ধানের জাত	অঞ্চল	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	ক্রমিক সংখ্যা	ধানের জাত	অঞ্চল	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)
১	খাইরা নুঙ্গা	ডামোহ্	৪.৮৩	২০	লালু (মাঝারি সরু)	ছত্তিশগড়	৭.০২
২	পিলু লোচাই	মধ্যপ্রদেশ	৭.৫	২১	কাল মোচ	ছত্তিশগড়	৪.৮৩
৩	খেরোসাল	ঝাবুয়া	৪.৯৩	২২	বাওয়ার	রাইপুর	৪.৮৯

৪	কোসাবারো	দুর্গ	৪.০৭	২৩	বর	ডামোহ	৪.৮৩
৫	লাজ্জি	বিলাসপুর	৪.৪৭	২৪	দিলবাকসা	রেওয়া	৪.৮৩
৬	লাঞ্জী	জব্বলপুর	৫.১৯	২৫	দুধকাদার	সারুইয়া	৪.৮৩
৭	লখরিপুজ	শাদল	৪.২৮	২৬	ডুমুরফুল	বাস্তার	৪.৪৪
৮	নাইনা কাজল	ঝাবুয়া	৪.৯৪	২৭	গালরা	সিদ্ধি	৪.৯৪
৯	পায়াগায়া	রাইপুর	৫.১৯	২৮	হেমা	বালাঘাট	৫.৪
১০	রণজিতি	বিলাসপুর	৪.৯৪	২৯	হুনডা	রাইপুর	৪.৪৫
১১	রাধাকৃষ্ণা	বিলাসপুর	৪.৬৩	৩০	যমুনা	সেউনি	৫.৫৫
১২	রুই	ভিন্ড	৬.৪৯	৩১	ঝিলি	সরগুজা	৪.৮৩
১৩	সাদসিদা	সরগুজা	৪.৬৩	৩২	জিলেওয়ার	সরগুজা	৪.৮৩
১৪	সাক্কর চিনি	সরগুজা	৫.৫৫	৩৩	কাবরি	বাস্তার	৪.৮৩
১৫	তিলসান	জব্বলপুর	৪.৪৫	৩৪	কাকরিসার	রাজনন্দাগাও	৪.৮৩
১৬	তুলসিফুল	সরগুজা	৪.৬৩	৩৫	কাচি	ভিণ্ড	৪.০৭
১৭	বংশী	ভিন্ড	৫.৫৭	৩৬	কালচার	সরগুজা	৭.৪
১৮	নারকেল ছড়ি	বাস্তার	৭.৯৬	৩৭	পাণ্ডরি লোচাই	জব্বলপুর	৭.৪১
১৯	নাগপুর গুড়মাটিয়া	বাস্তার	৭.০৪	৩৮	কামোদ	ঝাবুয়া	৭.৫৯

তাঁর লেখা বইগুলি হল:-

১) Rices in India (1963); ২) DHAN SAMPADA (Hindi); ৩) HAMARI DHAN SAMPADA (1976, Hindi); 8) STHANIO DHAN KI BONI KISME (Hindi); ৫) Early Maturing Varieties of Madhya Pradesh (1978); ৬) Disease and Pest resistant-High Yielding Rice varieties in Madhya Pradesh (1974); ৭) A Strategy of Rice Production to Ensure sustained Growth in Madhya Pradesh(1977); ৮) Plant Breeding and Genetics of India (1945); ৯) Plant Breeding Techniques in Recent Years, (1959); ১০) Applications of Sciences in Agriculture, ১১) Our Strategy on the Rice Production Front in Madhya Pradesh (1974); ১২) Improved Rice Cultivars (New Versions) Evolved in Madhya Pradesh (1978); ১৩) Wealth from Waste, the Indian Linseed Plant from Fibre point of view—a new source of textile fibre (1950); ১৪) Rice in abundance for all times through rice clones - a possible one।

আমরা এহেন বৈজ্ঞানিককে ভুলে গিয়েছি। প্রচার মাধ্যম ও কর্তৃপক্ষ এই রকম একজন কৃষক দরদী বৈজ্ঞানিকের কথা জনসমক্ষে আসতেই দেয় নি। তাঁর মৃত্য হয় ১৯৯৬ সালে ৮৭ বছর বয়েসে।

দেশী ধানের কি ফলন কম?

১৭৬২ সাল থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার থমাস বার্নার্ড এখনকার তামিলনাড়ু জেলার সেলাম এবং থাঞ্জাভুর জেলায় ধান নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর করেন। তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৩০ টা গ্রামের দেশি ধানের গড় ফলন ছিল প্রতি হেক্টরে ৮ টনের বেশি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৬৬ সাল নাগাদ তথাকথিত তৈরি করা আই আর ৮ উচ্চ ফলনশীল ধানের ফলন ছিল প্রতি হেক্টরে ৬ টনের বেশি। অবশ্য সেই ধান এখন আর চাষ হয় না। আবার ভারত সরকার বেশি ধান উৎপাদন করার জন্য ১৯৫২ সালে কর্নাটকের এক কৃষককে কৃষি পণ্ডিত পুরস্কার প্রদান করেন। ধানের ফলন ছিল প্রতি হেক্টরে ৯ টন। তাহলে আই আর ৮ ধানকে কি করে উচ্চ ফলনশীল ধান বলা হলো সেইটা বোধগম্য নয়। আই আর ৮ ধানকে কিন্তু রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিতে হবে এবং বীজ কিনতে হবে প্রায় প্রতিবছর। তা না হলে কিন্তু বেশি ফলন দিতে পারবে না। অথচ ওই দেশি ধানগুলোতে কোন রাসায়নিক সারের প্রশ্নও ছিল না এবং বীজ বছরের পর বছর কৃষকরা ব্যবহার করতে পারবেন। ভারতের প্রায় ৮২০০০ দেশী ধান ছিল, অতি সরলীকরণ করে বলা হল সবার ফলন কম। সেই ভাবে কি বলা যায় সব ভারতীয়দের গায়ের রং কালো বা উচ্চতা ৪ ফুট?

খাদ্য রাজনীতি

দুর্ভিক্ষের জুজু দেখিয়ে সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষি রাসায়নিকের ব্যবসা ও খাদ্য রাজনীতির ব্যাপারটাই হলো এইরকম যে যদি দেশী উচ্চফলনশীল ধানগুলো কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং বীজ বিক্রির যে বড় একটা সুযোগ

সেটা কিন্তু হাতছাড়া হয়ে যাবে। প্রচারের দৌলতে কৃষকদের কাছেও আস্তে আস্তে এমন বার্তা গেল যে সব দেশি ধান মানেই কম ফলনের। ভুলিয়ে দেওয়া হল অর্থনৈতিক ভাবে ও বাস্তুতান্ত্রিক দিক থেকে লাভবান ধান ও মাছ চাষ ব্যবস্থা। ধানের জমিতে সহজ লভ্য প্রোটিনের উৎস হিসেবে ৪০ রকমের বেশি জলজ প্রাণি মাছ, গেঁড়ি গুগলি, কাছিম ইত্যাদি পাওয়া যেত। মানে শালি জমিতে হওয়া মাছ এমনিতেই পাওয়া যেত, ৩/৪ মাস মাছ কিনতে হত না অনেক জায়গায়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষের জন্য এখন আর ধান জমিতে মাছ জন্মানোর মত পরিস্থিতি নেই। গভীর জলের ধান, লবণ জলের ধান, খরা ও বন্যা প্রবণ এলাকার ধান, খরা প্রবণ এলাকার ধান, ডাঙা জমির ছিটিয়ে বোনার আউশ ধানের মত কোন আধুনিক জাত নেই। ওই ম্যাজিক বীজের সঙ্গে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে বেশ ভালো ফলন পাওয়া গেল। সুতরাং কে আর তখন সাবেক দেশী ধান চাষ করে। ধীরে ধীরে দেশি ধান মাঠ থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু খরচের কথাটা উহ্য থেকে গেল। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, দুই বাংলায় প্রায় দশ হাজারের মতো বেশি ধানের জাত ছিল। আধুনিক ধান আগের মতো ফলন দিতে পারছে না যদিও রাসায়নিক সার আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মানুষকে শেখানো হল প্রকারান্তরে খাবারে বিষ মেশাতে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা খাবারে বিষ মেশায়, ভেজাল দেয়। প্রশ্ন হল বিষযুক্ত খাবারকে আমরা খাবার বলছি কি করে? চাষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কিছু পোকা মাকড়, পাখি জমিতে থাকবেই তাদের জীবনধারণের জন্য। এটাই প্রাকৃতিক সম্পর্ক। যদি মনে করা হয় পৃথিবীটা শুধুই মানুষের জন্য তাহলেই গণ্ডগোল, অনেক সমস্যা তৈরি হবে। ধানের জমিতে প্রায় ২২ রকমের সহযোগী উদ্ভিদ জন্মায়। প্রচার করা হল ওই সব আগাছা ধানের জমিতে দেওয়া রাসায়নিক সারে ভাগ বসাবে, ধানের ফলন কমবে। তাই আগাছানাশক দিয়ে ওই সব উদ্ভিদকে নিধন করা হল। জমি পরিষ্কার দেখাবে। প্রকৃতি কিন্তু এই পরিস্কার চায় না। অনেক পোকার আবাসস্থল থাকল না। অনেক পাখির বাসা করার নিরিবিলি জায়গাও থাকল না। শ্যামা ঘাসের দানা পাখির খাবার, সেটাও থাকল না। নিড়ানীর সময় ওই সব গাছ মাটিতে পুঁতে দিয়ে জৈব সার হত, গরুর খাবার হিসেবে অনেক উদ্ভিদ সংগ্রহ করা হত। জমিতে জন্মানো শোলা গাছের শিকড় ধান জমিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করত। আবার শোলা গাছ কুটির শিল্পেও ব্যবহার হত। ধানের জমিতে জন্মানো হিঞ্চে, শুষনি, আমরুল ইত্যাদি মানুষ শাক হিসেবে খায়। এই সহজ লভ্য শাক জমিতে কিছু জন্মালেও মানুষ জেনেশুনে বিষাক্ত শাক খাবেন না। ধানের খড় থেকে ফিলিপাইন্সে উত্তরীয় তৈরি হত। খড় ঘর ছাওয়া, গোখাদ্য ও প্যাকিং দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হত। এখন বলা হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ। মেশিনে ধান কেটে মাঠে থাকা খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাড়াতাড়ি পরবর্তী ফসলে যাওয়ার জন্য।

আশার কথা

এখনো অনেক দেশী ধান রয়েছে যে ধানের ফলন রাসায়নিক সার কীটনাশক না দিয়েই হেক্টারে ৬ টন যেমন কেরালা সুন্দরী (পুরুলিয়ার নির্বাচিত ধান), বহুরূপী, তালমুলি, কেশবশাল, বাংলা পাটনাই ইত্যাদি। এতে সার ও কোন বিষ লাগে না, একই বীজে বছরের পর বছর চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের অধীনস্থ ফুলিয়ার কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিগত কুড়ি বছর-এর বেশি সময় ধরে এটা প্রমাণ করেছে। কৃষকদের মধ্যে দেশী ধানের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছে। বহু কৃষকই এখন শুধুমাত্র উচ্চ ফলনশীল দেশী ধান ও বিভিন্ন ধরনের দেশি সরুচাল, লাল চাল, সুগন্ধি ধান চাষ করতে উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্য কৃষি দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের উৎসাহিত করছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক পরিমাণে দেশি ধান চাষের এলাকা রয়েছে এবং উৎপাদনও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম। অন্য রাজ্যের ধান যেমন পৃথিবীর সব থেকে পুষ্টিকর কালো চাল-কালাভাত (আদতে মহারাষ্ট্রের), আদান শিল্পা, জয়প্রকাশ ইত্যাদি ভ্যারাইটি কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বিভিন্ন সরুচাল যেমন দুধেরসর, বাঁশফুল, লালসরু, ঝিঙেশাল, সীতাশাল, লাল দুধেরসর, জয়প্রকাশ, চমৎকার (ধান সংরক্ষক অভ্র চক্রবর্তীর নির্বাচিত ধান) ইত্যাদি জাতের চাষ বেড়েছে। গোবিন্দভোগের পাশাপাশি রাধাতিলক পরিচিতি লাভ করেছে। তবে হ্যাঁ বাজারে সুন্দর বস্তা করে দেশী চাল বিক্রি হচ্ছে না; তবে অনলাইনে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ব্লকে এই জাতগুলোর চাষ হচ্ছে, অনেক জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জৈব সার দিয়ে কম খরচে কিছু দেশী ধানের ফলন রাসায়নিক সার দিয়ে আধুনিক জাতের ফলনের সমান। দুধেরসর চাল কিন্তু খুব সরু ছোট চাল। কিন্তু ভাত হলে এটা লম্বায় অনেক বাড়ে, যেটা আর কোন চালই এই পরিমাণ বাড়ে না। মানে ভাতে আয় দেয় এবং সুস্বাদু ভাত। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিপণন দপ্তরের সুফল বাংলা তাদের বিভিন্ন বিপণনীর মাধ্যমে এই চালগুলো ক্রেতাদের সামনে নিয়ে আসছেন। অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এই দুধেরসরের সাথে অন্য চাল মিশিয়ে বিক্রি করছেন। মিল মালিকরা বাজারীকরণের সুবিধার্থে চালের বিভিন্ন নামকরণ করেছেন যেমন লক্ষ্মীভোগ, জিরাভোগ, সোনার বাংলা, জিরাকাঠি (বাস্তবে দেশী জিরাকাঠি ধান খুব সামান্য জায়গায় চাষ হয়), ঝাটিদানা, মিনিকেট ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র:

১। বহুব্রীহি কথা পুস্তিকা, ২০১৮, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ, ফুলিয়া, নদীয়া।

২। Seeds of Tradition and Seeds of Future, Debal Deb, 2005, RFSTE, New Delhi

৩। Organic Rice Production Manual, Anupam Paul, 2022, Sahaja Media, Mysore

৪। কৃষি ভাবনা ও দুর্ভাবনা, ২০২৪, অনুপম পাল, কলাবতী মুদ্রা, কলকাতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কিছু কথা

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

'ইলেকট্রিক ব্রেইন' শব্দটা কতজন শুনেছেন? ২০২০ সাল নাগাদ ডগলাস ফিল্ড নামে এক নিউরোসার্জেন এই শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন। মস্তিষ্ক কী করে মনের অবস্থা বুঝতে পারে, কী করে আমরা শিখি, আবার উন্নতির জন্য কীভাবে আমরা নিজেদের বদলে নেবো আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী সেসব বিষয় ওই বইতে বলা আছে। অবশ্য শুধু মস্তিষ্ক কেন দেহের অধিকাংশ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াই তো আদতে ইলেকট্রিক সিগন্যাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ইলেকট্রিক ব্রেইন এই শব্দবন্ধটি সংবাদ সংস্থার লোকেরা ব্যবহার করতেন আশির দশক নাগাদ, যখন আমেরিকা সহ পশ্চিমী দুনিয়ায় কম্পিউটারের প্রচলন শুরু হচ্ছে। আরও চার দশক পিছিয়ে গেলে আমরা পেয়ে যাবো অ্যালেন ট্যুরিং-কে, যিনি ১৯৪১ সাল নাগাদ মেশিন ইন্টিলিজেন্সি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; সম্ভবত কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে লেখা প্রথম পেপার, যদিও আজ সেটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। ট্যুরিং একাধারে ছিলেন গণিতবিদ, দার্শনিক ও কোড ব্রেকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর তৈরি 'এনিগমা মেশিন' জার্মান কোড ব্রেকিং-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। গণিতের বিমূর্ত সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করতে গিয়েই 'কম্পিউটিং মেশিনারি ও ইন্টেলিজেন্স' নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন তিনি। যন্ত্রকে ইনটেলিজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য তিনি যে পরীক্ষার প্রচলন শুরু করেছিলেন তা 'ট্যুরিং টেস্ট' নামে পরিচিত। ইন্টারনেটে আজকাল যেমন 'ক্যাপচা' টেস্টের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারী একজন মানুষ না যন্ত্র বোঝা যায়, অনেকটা তেমনই ছিল এই ট্যুরিং টেস্ট। তারপর ১৯৫০ সাল নাগাদ 'Computing Machinery and Intelligence' শিরোনামে লেখা একটি জরুরি গবেষণা-প্রবন্ধে ট্যুরিং প্রশ্ন তুলেছিলেন "মেশিন কি চিন্তা করতে পারে?"। ১৯৫৪ সালে ট্যুরিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবহৃত 'মেশিন ইন্টালিজেন্স' (যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা) কবে যেন পরিবর্তিত হয়ে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স'(কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) হয়ে গেছে।

অ্যালেন ট্যুরিং

ট্যুরিং যে প্রশ্নটি তুলেছিলেন আজ সাত দশক আগে সেটাই ডালপালা, শিকড়-বাকড় ছড়িয়ে প্রত্যাশা ও আশংকা মিশ্রিত আস্ত একখানা বটবৃক্ষ হয়ে উঠেছে। চ্যাট জিপিটি এবং এ আই আর্টের মতো ক্রিয়েটিভ টুল ছাড়াও ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিন (যেমন গুগল) থেকে শুরু করে ইউটিউব, অ্যামাজন বা নেটফ্লিক্সের রেকোমেন্ডেশন সিস্টেম অথবা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্স, অ্যালেক্সা, সিরি-র ভয়েজ সার্চ সিস্টেম, সেলফ ড্রাইভিং কার, ইত্যাদি সব জায়গাতেই প্রয়োগ হচ্ছে যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা। ২০১৮ সালে ইউরোপিয়ান কমিশন অনুযায়ী আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স (AI)-এর সংজ্ঞা অনেকটা এইরকম-

এআই বলতে এমন সিস্টেম গুলিকে বোঝায় যেগুলো তাদের পরিবেশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুদ্ধিমান আচরণ প্রদর্শন করে এবং কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেই পদক্ষেপ নেয়।

অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ তথ্য ঘেঁটে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে উন্নততর মেশিন লার্নিং ব্যবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে একরকম বিপ্লব এনে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স। কিন্তু এত কথা বলার পরও আমার মতো মধ্য মেধার মানুষের পক্ষে AI সম্পর্কে খুব আলাদা কিছু বুঝে নেওয়া কঠিন। বরং একটি টাটকা উদাহরণ দেওয়া যাক। কম্পিউটারের নির্দিষ্ট উইন্ডোতে চ্যাট জিপিটি-কে যখন লিখলাম 'শেষের কবিতা', কম্পিউটার স্ক্রিনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল চার অনুচ্ছেদের একটি কবিতা—

শূন্যে মিশে গেল ছায়ারা সূর্য,
মেঘে ঢাকা দেয় অবাক আকাশ।
মৃত্যুর মায়াজালে আবৃত সজীব,
সৃষ্টির স্রষ্টা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

মৃদুল হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে
সময়ের অদৃষ্ট দিয়ে চুপিচুপি।
চেতনা ভাঙতে বাধা দিয়ে ক্ষণিক,
অমৃতের স্রোতে অবিস্মরণীয় পথে।

সৃষ্টির প্রাচীরে এক সন্ধ্যার কাঁটা,
প্রতিধ্বনি ধরে রেখেছে নির্জন মেঘে।
আকাশে চুরি হয়ে গেছে তার মুখে
মিষ্টির শব্দ, মৃদুল গোধূলির স্রোতে।

একেকটা পাতার ছায়ায় ভোরের বাতাস,
মিশে গিয়েছে ভিন্ন আকাশের সাথে।
সকল রঙের ছোঁয়ায় আছে বৃষ্টির গান,
শেষ কবিতা কতো সুন্দর, অমর রবীন্দ্রনাথে।

লেখাটাতে আধুনিক কবিদের মতো দিব্যি একটা মানুষ-মানুষ গন্ধ আছে না? দু'বার রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হয়েছে। এবার আমি নতুন করে জানতে চাইলাম 'শেষের কবিতা' কার লেখা? উত্তর এলো- '"শেষের কবিতা" হলো কবিতা রচনা কারো নয়, তার বরং এটি একটি কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম হতে পারে। "শেষের কবিতা" বা "The Last Poem" অনুবাদের সাহিত্যিক কারো নাম থাকতে

পারে, এটি বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে।...'

শুনতে আজগুবি লাগলেও যন্ত্র কিন্তু রীতিমতো মাথা খাঁটিয়ে এই উত্তর দিয়েছে। গুগলের মতো ইন্টারনেটের সার্চ ইঞ্জিনগুলোর সঙ্গে এখানেই এর তফাত। কিন্তু ঠিক যেভাবে কবিতাটা লিখে ফেলেছে সেভাবেই অন্তর্জালের তথ্য ঘেঁটে এই ঝাপসা তথ্য ছেঁকে নিয়েছে চ্যাট জিপিটি। আসলে সাধারণ সার্চ ইঞ্জিনের (যেমন গুগল) মতো বিপুল পরিমাণ তথ্য চ্যাটজিপিটি নামক বুদ্ধিমান চ্যাট-বট ঘাটতে যায় না, বরং সংক্ষিপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই গুছিয়ে উত্তর দেয়। অনেকটা যেন মানুষের মতোই, আমরাও তো পরীক্ষার আগের দিন আস্ত বই ঘেঁটে কোনো উত্তর খুঁজি না। তাই ওর দোষ দিয়ে লাভ নেই; আসল কথা হল ইংরেজির মতো বাংলা সাহিত্যের বিপুল তথ্য যে অন্তর্জালে ঢোকানো নেই! শেক্সপিয়ার বা জেমস জয়েস-এর কোনো লেখা নিয়ে জানতে চাইলে নিশ্চিতভাবেই এমন অবস্থা হতো না।

এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিবর্তনের দিকে চট করে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ২০১৯ সাল নাগাদ একদল গবেষক (ওপেন এআই) এমন এক সফটওয়্যার তৈরি করলেন, যেটা অর্থবহ টেক্সট সমন্বিত মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারতো এবং সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ ছাড়াই একটা লেখা পড়ে মোটামুটি বুঝে তা বিশ্লেষণ করতে পারতো। ওপেন এআই তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাঁদের এই সফটওয়্যার (যেটার নাম তাঁরা রেখেছিলেন চ্যাট জিপিটি-২) সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না। আসলে আশংকা ছিল খারাপ উদ্দেশ্যেই লোকে একে বেশি ব্যবহার করবে। তাই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ওরা নিজেরাই এই সফটওয়্যারকে 'খুব বিপজ্জনক' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু চ্যাট জিপিটি-৩ আসার পর বিষয়টি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। আজকের দিনে এর সাহায্য নিয়ে চোখের পলকে এমন এমন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলা যাচ্ছে যা দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাওয়ার যোগাড়। শিশুকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বুঝিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে কবিতা লেখা, গবেষণা প্রবন্ধ লেখা এমনকি কোনো বিষয়ে নিখুঁত ছবি এঁকে দেওয়ার কাজটি পর্যন্ত করে ফেলা যাচ্ছে। তাহলে কি মেশিনও সৃজনশীল হয়ে উঠেছে? অন্তত খালি চোখে তো তাই মনে হয়!

যন্ত্র ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে যন্ত্র নিজে, বৃদ্ধি পায় কর্মক্ষমতা। আর সব মিলিয়ে মানুষের চেয়ে আগে নিখুঁতভাবে কোনো কিছু ভেবেও ফেলতে পারে; যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'ডিপ লার্নিং'। অ্যালগোরিদম-কে কাজে লাগিয়ে এই ডিপ লার্নিং-এর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। তারপর যেসমস্ত তথ্য ইতিমধ্যে মজুত আছে সেসব ঘেঁটে, তার থেকে শিখে সমধর্মী তথ্য বা প্যাটার্ন তৈরি করে ফেলে—সব মিলিয়ে এমন অসাধ্য সাধনের কাজটি নিরন্তরভাবে করে চলতে পারে AI।

সম্প্রতি নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে (N. Engl. J. Med. 2024; 390:293-295) উঠে আসা তথ্য দেখলে চমকে উঠে হয়। হঠাৎ পেটব্যথা শুরু হয়েছে এমন কয়েক হাজার রোগীর তথ্য সংগ্রহ করেছেন গবেষকরা। ঠিক কোথায় ব্যথা হচ্ছে, ব্যথার তীব্রতা বা চরিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল উপসর্গের ভিত্তিতে তথ্য জমা করা হয়, আর এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয় নাড়ির স্পন্দনের দ্রুততা, পেট শক্ত হয়ে যাওয়া, রোগীর এই ধরনের লক্ষণগুলিকে। তারপর কম্পিউটারের সাহায্যে চলে তথ্য বিশ্লেষণের কাজটি। বোঝার চেষ্টা করা হয় ঠিক কোন ধরনের রোগীর কোন উপসর্গ থাকার সম্ভাবনা বেশি। দেখা গেল কম্পিউটারের অ্যালগোরিদম প্রায় ৩০০ জন রোগীর (যারা ১৯৭১ সালে পেট ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল) তথ্য বিশ্লেষণ করে ৯১.৮% ক্ষেত্রেই নির্ভুল রোগ নির্ণয় করতে পেরেছে। আর এও লক্ষ্য করা গেল যে, এসবের সঙ্গে আঞ্চলিক প্রভেদ, জাতিগত বিভিন্নতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারলে যন্ত্র আরও নির্ভুল হয়ে ওঠে। এমনকি বিপুল তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে AI একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের চেয়ে বেশি নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয়ে সক্ষম।

তবে অন্যরকম সমস্যাও আছে। এই তো এবছর ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক জার্নাল 'সারফেসেস অ্যান্ড ইন্টারফেসেস'-এ প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধের প্রথম লাইনটি শুরু হচ্ছে এভাবে—"Certainly, here is a possible introduction for your topic..." লিখিয়াম মেটাল অ্যানোড ব্যাটারির পারফরমেন্স নিয়ে লেখা এই গবেষণা প্রবন্ধের লেখক মোট পাঁচজন, তাঁরা সবাই চিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় চ্যাট জিপিটির সাহায্য নিতে গিয়েই এই সর্বনেশে কাণ্ডটি ঘটে গেছে, যার দায় লেখকরা তো বটেই জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী এবং রেফারি কেউ এড়াতে পারেন না। তাছাড়া AI-এর শিক্ষা এবং প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত রয়েছে বাণিজ্যিক প্রশ্নটিও। এসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারটি অতি কম সময়ে অত্যন্ত দ্রুত ঘটে চলেছে। বিপুল অর্থের বিনিয়োগ ছাড়া এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়। ফলে নিম্ন বা মধ্য আয় সম্পন্ন দেশের নাগরিকরা এর সুফল ততটা নিতে পারছে কই? আর সেই কারণেই আফ্রিকার দেশগুলিতে ইবোলা মহামারী মোকাবিলায় উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব ভীষণরকম দেখা গিয়েছিল।

তবে উন্নত সমাজের সমস্যা আবার অন্যরকম। AI-এর প্রযুক্তিগত উন্নতি সেখানে কর্মক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলতে চলেছে, এর ফলে হয়তো বদলে যাবে কর্মীদের কাজের ধরনও। কিন্তু যন্ত্র যতই উন্নত হোক না কেন, মেশিন লার্নিং শিখুক না কেন, আজও এর চেতনা নেই কোনো, নেই কল্পনা শক্তি, কিংবা স্বতন্ত্র কোনো অনুভব। শুধুমাত্র নিজের তথ্য ভাণ্ডারে থাকা প্যাটার্ন ঘেঁটে কাজ করে চলা এহেন যন্ত্রকে এখনই মানুষের মডেল বলার সময় তাই আসে নি। চেতনা, অনুভব ও কল্পনার মিশেলে কোনো কার্যকরি গাণিতিক বা রাসায়নিক মডেল না মেলা পর্যন্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সৃজনশীল মানুষের মধ্যে মৌলিক বিভেদ থাকবেই। যদিও কালের দাবি মেনে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের চেনা পরিসরে যন্ত্র ও মানুষের সহাবস্থান হয়ত বেড়েই চলবে, তা সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শিল্পের বা রোবটের সঙ্গে মানবকর্মীর যাই হোক না কেন!

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার প্রাপকগণ

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

কাতালিন কারিকো ও ড্রু ওয়েসম্যান

এই তো কিছুদিন আগেই সারা বিশ্ব এক বিশাল দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল। মৃত্যু, গৃহবন্দি হয়ে থাকা, লকডাউন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্ধ হয়ে যাওয়া কত কিছুই না আমরা দেখলাম। একটি ভাইরাস কিভাবে তথাকথিত উন্নত মানব সভ্যতাকে বুঝিয়ে দিল যে প্রকৃতির কাছে আমরা কত অসহায়। অথচ এটাও ঠিক যে প্রকৃতির এক অভিনব সৃষ্টি এই মানুষ লড়াই করেছে। অপেক্ষা করেছে নিদানের। অবশেষে তৈরি হয়েছে প্রতিষেধক টিকা। যদিও সাম্প্রতিক কোভিড অতিমারি নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু রাষ্ট্র ও বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা নিয়ে এবং টিকার মান, টিকা নিয়ে ব্যবসা ও টিকা বন্টনের বৈষম্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে গেছে। কিন্তু এটি ঘটনা ১৯১৮-'২০-র স্প্যানিশ ফ্লুর অতিমারির চাইতে ২০১৯-'২১ এর কোভিড-১৯ অতিমারিতে মৃত্যুর সংখ্যা দশ ভাগের একভাগে নামিয়ে আনা গেছে এবং দ্রুতগতিতে টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। সর্বপ্রথম কোভিড টিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকা গবেষণা বিভাগের (Vaccinology) অধ্যাপিকা এবং জেনার ইনস্টিটিউটের মুখ্য গবেষিকা সারা গিলবার্টের (Dame Sarah Catherine Gilbert) যিনি কোভিড ১৯-এর recombinant Vaccine (ChAdOx 1-S) তৈরি করেছিলেন। এটিকে বাজারে এনেছিল AstraZeneca সংস্থা। টিকা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর ধারণা আছে। সাধারণত টিকা বা ভ্যাক্সিনে রোগের দুর্বল বা মৃত জীবাণু থাকে যা শরীরে প্রবেশ করানো হয়। ফলে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অ্যান্টিবডি তৈরি করে। শরীর মনে রাখে এই রোগের সাথে কিভাবে লড়তে হবে। এর পর যদি শরীরে ওই রোগের সংক্রামক জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে শরীর তার প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

কাতালিন কারিকো

২০২৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় কাতালিন কারিকো (Katalin Karikó) ও ড্রু ওয়েসম্যানকে (Drew Weissman)। কারণ ''for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enable the development of effective mRNA vaccines against COVID-19'' কাতালিন কারিকো'র জন্ম ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৫-এ হাঙ্গেরিতে। পিতা ছিলেন মাংস বিক্রেতা। University of Szeged থেকে কাতালিন যথাক্রমে ১৯৭৮ সালে বায়োলজিতে B.Sc. এবং ১৯৮২ বায়োকেমিস্ট্রিতে PhD অর্জন করেন। এরপর পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ শুরু করেন হাঙ্গেরির Biological Research Centre (BRC)-এ। কিন্তু BRC-এর আর্থিক দুরবস্থার কারণে ১৯৮৫ সালে তিনি স্বামী সন্তানসহ ইউনাইটেড স্টেটসে চলে আসেন এবং পোস্টডক্টরাল ফেলো হিসেবে ফিলাডেলফিয়ার Temple University-তে যোগদান করেন। ১৯৮৮ সালে কাজ শুরু করেন ম্যারিল্যান্ডের Uniformed Services University of the Health Sciences-এ। ১৯৮৯ সালে যুক্ত হন University of Pennsylvania-র সাথে। mRNA ছিল তার গবেষণার মুখ্য বিষয়। কিন্তু তিনি অনুদান পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ইউনিভার্সিটি তাকে দুটি বিকল্প পথ বাতলে দেয়। হয় তাঁকে mRNA নিয়ে গবেষণা ছাড়তে হবে অথবা পদাবনতি গ্রহণ করতে হবে। কাতালিন দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর বেতনও কাটা হয়।

১৯৯৭ সালে তাঁর দেখা হয় ড্রু ওয়েসমান-এর। তিনি ছিলেন Immunology-র অধ্যাপক। তাঁর জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সালে। তিনি Brandeis University স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৮১ সালে। ১৯৮৭ সালে Boston University থেকে M.D ও PhD করেন। এরপর তিনি যুক্ত হন Beth Israel Deaconess Medical Center-এর সাথে এবং National Institutes of Health-এ ফেলোশিপ পান। এরপর তিনি যোগদান করেন University of Pennsylvania-এ।

তাঁরা দু'জনে একসাথে কাজ করা শুরু করেন। পূর্বে টিকা তৈরির জন্য প্রচলিত সেল কালচার পদ্ধতিতে একাট অসুবিধা ছিল। আপৎকালীন পরিস্থিতি যেমন মহামারির সময়ে টিকার দ্রুত উৎপাদন প্রয়োজন, কিন্তু সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৯৮০-এর দশকে সেল কালচারের বদলে in vitro transcription পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটে। যদিও in vitro transcribed mRNA স্থিতিশীল ছিল না, উপরন্তু প্রদাহের সমস্যাও দেখা দিচ্ছিল। কাতালান ও ড্রু mRNA-এর বিভিন্ন variant তৈরি করেন যেগুলির বেসের রাসায়নিক গঠন ছিল আলাদা আলাদা। এগুলি ডেনড্রাইটিক কোষে প্রবেশ করানো হয়। দেখা যায় প্রদাহজনিত সমস্যা প্রায় নেই।

২০০৫ সালে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এরপর ২০০৮ ও ২০১০ সালে আরও পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে অসংশোধিত mRNA-এর তুলনায় যেসব mRNA-এর বেস মডিফিকেশান হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত বেশি প্রোটিন উৎপাদন করতে সক্ষম।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে টিকা প্রস্তুত করে Pfizer ও Moderna। তবে শুধু কোভিড-১৯ নয় ২০২৩ সালের চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ীদের এই অবদান অন্যান্য রোগের টিকা প্রস্তুত করতে, এমনকি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়তেও ভূমিকা নেবে এই আশা করা হচ্ছে।

অ্যানি ল' হুইলিয়ার, পিয়ের আগোস্থিনি ও ফেরেঙ্ক ক্রাউজ

বড়ই বিস্ময়কর এই প্রকৃতি। একদিকে ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্রতর,

অন্যদিকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর-উভয় ক্ষেত্রে বিস্তৃত তাঁর সৃষ্টির মায়াজাল। তেমনই বিস্ময়কর এই সৃষ্টিকে দেখার জন্য, জানার জন্য মানুষের অদম্য ইচ্ছা। হাবল টেলিস্কোপ, কেপলার টেলিস্কোপ, জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ, চন্দ্র এক্স রে অবসার্ভেটরি প্রভৃতি মহাকাশের দূর অজানাকে আনে মানুষের পর্যবেক্ষণের আওতায়। গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, গ্রহাণু, ধূমকেতু থেকে কৃষ্ণগহ্বর কত কিছুই না ধরা পড়ছে তার নাগালের মধ্যে। অন্যদিকে অপ্টিক্যাল মাইক্রোস্কোপ, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, স্ক্যানিং প্রোব মাইক্রোস্কোপ, এক্স রে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি প্রভৃতি দিচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সন্ধান।

ছোটবেলায় বিদ্যালয়ে শেখা কিছু কথা মনে করা যাক। যে সকল পদার্থকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজন করা হলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না তাদের মৌলিক পদার্থ বলে। মৌলিক পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণার মধ্যে মৌলটির ধর্ম উপস্থিত থাকে এবং যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে মৌলিক পদার্থটির পরমাণু বলে। পদার্থের ক্ষুদ্রতম স্বাধীন একক যার মধ্যে ওই পদার্থের সমস্ত রাসায়নিক ধর্ম বিদ্যমান তাকে ওই পদার্থের অণু বলে। এক অথবা বিভিন্ন পদার্থের দুই বা ততোধিক পরমাণু রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অণু গঠন করে। অবশ্য এক পরমাণুবিশিষ্ট অণুও হয়। পরমাণু তিনটি মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত। ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন ও আধানহীন নিউট্রন একত্রিত হয়ে গঠন করে পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন।

এই অণু পরমাণুর জগতে পরিবর্তন হয় খুব কম সময়ের মধ্যে, ফেমটোসেকেন্ড স্তরে, যেখানে ১ ফেমটোসেকেন্ড = $১০^{-১৫}$ সেকেন্ড। ফেমটোসেকেন্ড আলোর স্পন্দন অর্থাৎ যে আলোর স্পন্দনের স্থায়িত্ব ফেমটোসেকেন্ড তার সাহায্যে এইসব পরিবর্তন দেখা সম্ভব। কিন্তু অণু পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন এত দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে যে ফেমটোসেকেন্ড আলোর স্পন্দন দ্বারা তার পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার আরও ক্ষুদ্র আলোর স্পন্দন, অ্যাটোসেকেন্ড আলোর স্পন্দন, যেখানে ১ অ্যাটোসেকেন্ড $১০^{-১৮}$ সেকেন্ড।

অ্যানি ল' হুইলিয়ার (Anne L'Huillier) ১৯৫৮ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় পি এইচ ডি করেন Pierre and Marie Curie University থেকে। পোস্ট ডক্টরাল করেন সুইডেনের Chalmers Institute of Technology এবং আমেরিকার University of Southern California থেকে। ১৯৯৫ সালে উনি যোগদান করেন Lund University-তে।

এবার আসা যাক শব্দের কথায়। শব্দ হল একপ্রকার তরঙ্গ যা পদার্থের কম্পনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। একক সময়ে কম্পনের সংখ্যাকে শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বলে। একটিমাত্র কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে সুর বলে এবং একাধিক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে স্বর বলে। স্বরের মধ্যে যে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের সুর থাকে তার মধ্যে সবথেকে কম কম্পাঙ্কের সুরকে মূল সুর বলা হয় এবং মূল সুরের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের সুরকে ওভারটোন বলে।

আলোও একপ্রকার তরঙ্গ। ১৯৯০ এর দিকে অ্যানি ল' হুইলিয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে অবলোহিত আলোর লেজার চালনা করে ওভারটোন উৎপন্ন করতে সফল হন। লেসার তড়িৎ চৌম্বকীয় কম্পন সৃষ্টি করে যার ফলে গ্যাসের পরমাণুর ইলেকট্রন শক্তি সঞ্চয় করে পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কম্পনের দিক পরিবর্তন হলে ইলেকট্রন শক্তি বর্জন করে পরমাণুতে ফিরে আসে। এই অতিরিক্ত শক্তি বর্জিত হয় আলোর স্পন্দন রূপে যা কিনা তৈরি করে ওভারটোন। অনুকূল পরিস্থিতিতে ওভারটোনগুলি মিলিত হয়ে অতিবেগুনী আলোর স্পন্দন তৈরি করে যে স্পন্দন হয় মাত্র কয়েকশো অ্যাটোসেকেন্ডের। বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব বুঝলেও তরঙ্গগুলিকে কিভাবে একত্রিত করা যায় সেই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না।২০০১ সালে পিয়ের অ্যাগোস্টিনি (Pierre Agostini) ও তার দল ধারাবাহিকভাবে আলোক স্পন্দনের সারি উৎপন্ন করতে সক্ষম হন যেখানে স্পন্দনগুলির স্থায়িত্বকাল মাত্র ২৫০ অ্যাটোসেকেন্ড।

পিয়ের অ্যাগোস্টিনির জন্ম ২৩ জুলাই ১৯৪১ সালে তিউনিসে (Tunis)। Aix-Marseille University-তে তিনি পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৬৯ সালে তিনি CEA Saclay-এর সাথে যুক্ত হন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। এরপর যুক্ত হন Brookhaven National Laboratory এর সাথে। ২০০৫ সালে তিনি অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন Ohio State University-তে। তিনি বর্তমানে Ohio State University-র Emeritus professor ।

অপর একজন হলেন ফেরেন্স ক্রাউজ (Ferenc Krausz) যিনি ১৭ মে ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন হাঙ্গেরিতে। পরবর্তীকালে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে Eötvös Loránd University- তে এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে Technical University of Budapest -এ পড়াশোনা করেন। ১৯৯১ সালে তিনি Technical University of Vienna থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ওখানে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০৩ সালে তিনি Max Planck Institute for Quantum Optics-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত হন ও ২০০৪-এ Ludwig Maximilian University of Munich -এর অধ্যাপক হন।

২০০১ সালে ফেরেন্স ক্রাউজ ও তাঁর গবেষক দল একক স্পন্দন বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন যার স্থায়িত্বকাল ছিল ৬৫০ অ্যাটোসেকেন্ড।

অ্যাটোসেকেন্ড জগতে প্রবেশ করার চাবিকাঠি আসে হাতের মুঠোয়। যেখানে আগে কেবলমাত্র গড় অবস্থান পরিমাপ করা যেত সেখানে রাস্তা বেরোল ইলেকট্রনের গতিবিধির পর্যবেক্ষণের। ২০২৩ সালে এই তিন বৈজ্ঞানিক পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় **"For experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter."**

পরবর্তীতে সম্ভব হয়েছে কয়েক ডজন অ্যাটোসেকেন্ডের স্পন্দন তৈরি এবং এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক্স, পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে যার সুফল মানব সভ্যতার উন্নতিকে ত্বরান্বিত করবে।

ডিপ ফেক–আশীর্বাদ না আতঙ্ক

তপন দাস

সিনেমা প্রিয় বন্ধু ঋজু, তা সে বাংলা, হিন্দি অথবা ইংরেজি যে ভাষাতেই হোক না কেন। সিনেমার গল্প শুরু হলে অনেক সময় তাকে বলতে শোনা যায়, এটাতো ওই হিন্দি সিনেমার বাংলা ডাবিং করা। আবার অনেক সময় কার্টুন চরিত্র দেখে বলে এটাতো, অমুক অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গলার স্বর। আবার কখনো এটাও হতে পারে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলে অন্য কারো মুখ মণ্ডল বসানো। এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা বলা, এতো নতুন কিছু নয়। ঋজুর কাছে কিছুটা হলেও নতুন মনে হয়েছে সেটাকে, যখন শুনল এক ব্যক্তির স্বরে একই বক্তব্য বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হয়। ছবি ও গলার স্বর আপনাকে বোঝাতে বাধ্য করছে সবই আসল। ঋজু বলল আসলে কিন্তু তা নয়। সেই ব্যক্তি হয়তো একটির বেশি ভাষাই জানেন না। তাহলে কি করে সম্ভব হল এটা। এই সবটাই সম্ভব হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। সংক্ষেপে এই প্রযুক্তি বোঝাতে ডিপ ফেক শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এটি একটি কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত মাধ্যম। একদিকে বুদ্ধিমত্তা অন্যদিকে যান্ত্রিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ডিপ ফেকের উৎপত্তি। একজন মানুষের একটি ছবি থাকলেই বিভিন্ন কথা বসিয়ে ভিডিও তৈরি করা খুব সাধারণ বিষয়। একজন মানুষ তার চোখে দেখে, নিজের কানে শুনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, এটাই সত্যি অমুকের কণ্ঠ, অভিনয় অথবা মুখমণ্ডল। কী সেই ডিপ ফেক প্রযুক্তি? উত্তরে ঋজু জানিয়েছিল, বলতে গেলে ডিপ ফেক একটি সুনির্দিষ্ট ডিপ লার্নিং প্রযুক্তির অপব্যবহার করে বিষয়গুলি হেরফের (Manipulate) আসল বস্তুটিকে বিকৃত (Temper) বা পরিবর্তন (Change) করার পদ্ধতি, যার সাহায্যে, ছবি, ভিডিও, অডিও যেমন তৈরি করা বা সংশ্লেষ করা যায় ঠিক তেমনি কোন কিছু পুনরুদ্ধার করা, কিছুটা পরিমার্জন করা সম্ভব হয়।

কিছু মানুষ ভীষণ অবুঝ। কিন্তু বুদ্ধিমানরা তাদেরও বিভিন্ন কৌশলে বুদ্ধিমান করে তুলতে পারে। একটা সময় বিজ্ঞানীরা খুঁজতে শুরু করেছিল মানুষের মস্তিস্ক কীভাবে কাজ করে? স্নায়ুবিজ্ঞান চর্চায় তারা সেটার কুল কিনারাও খুঁজে পান। ১৮০০ শতকের শেষের দিকে সেই চিন্তা থেকেই নিউরাল নেটওয়ার্ক ধারণার জন্ম হয়। ঠিক তেমনি কম্পিউটারের বিভিন্ন ভাষাও বেশ অবুঝ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কম্পিউটারের ভাষাগুলোর পরিবর্তন সম্ভব করেছেন বিজ্ঞানীরা। একসময় যেভাবে প্রোগ্রাম করা হতো কম্পিউটার সেভাবেই কাজ করত। নিজ থেকে কিছুই করতে পারত না। কিন্তু কম্পিউটার যদি নিজে থেকেই কিছু শিখতে পারে তাহলে অনেক প্রোগ্রামই বেশ সহজ হয়ে উঠবে। এই ধারণা থেকেই বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদেরা কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্ম দেন। একজন মানুষ তার জন্ম লাভের পর থেকেই বিভিন্ন প্রচেষ্টায় অনেক কিছুই শেখে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন মানুষ যেভাবে শেখে, কাজ করে, কম্পিউটারও সেইভাবে শিখতে পারবে কিনা? মানুষের মস্তিষ্ক জটিল একটি অঙ্গ। আবেগ, স্পর্শ, দৃষ্টি, শ্রবণ, ক্ষুধার অনুভুতি সবই নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। ছোটবেলার সেই মস্তিষ্ককে শান দিয়ে অনেক কিছুই শেখানো সম্ভব হয়। আর মস্তিস্কের বিভিন্ন স্নায়ু সম্মিলিত ভাবে এই কাজে সহায়তা করে। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক সংকেত গুলো মস্তিষ্কের মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়। সেই ভাবনা থেকেই কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক শাখাটির জন্ম। প্রথাগতভাবে বলতে গেলে জৈবিক নিউরনের সার্কিটকে নিউরাল নেটওয়ার্ক বলা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্কও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। প্রকৃত জৈবিক নিউরন নেটওয়ার্কে স্নায়ুতন্ত্র একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। স্নায়ুবিজ্ঞানে এরাই নিউরনের দল নামে পরিচিত। এই দলে একটি নিউরন অপর একটি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। কৃত্রিম নিউরন হল প্রোগ্রামিং দ্বারা তৈরি জৈবিক নিউরনের সংযোগের অনুরুপ একটি মাধ্যম।

কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক (এএনএন) বা সংযোগকারী ব্যবস্থা হল গণনাকারি ব্যবস্থা যা প্রাণী- মস্তিষ্ক গঠনকারি জৈবিক স্নায়ু নেটওয়ার্ক দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি মাধ্যম। মজার কথা হল, এ ধরনের ব্যবস্থাগুলি সাধারণত কোনো কাজ-নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা প্রোগ্রাম ছাড়াই শুধু উদাহরণ বিবেচনা করে কাজগুলি সম্পাদন করতে শেখে। মনে করা যাক, একটি ছবি শনাক্ত করতে হবে, তারা কোনো ছবিতে একটি গৃহপালিত পশু আছে কি না তা চিহ্নিত করা শিখতে পারে। এক্ষেত্রে তারা 'পশু' বা 'পশু নয়' হিসাবে পূর্বে লেবেলকৃত প্রাণীর ছবি বিশ্লেষণ করে লেবেল ছাড়া অন্যান্য চিত্রগুলিতে প্রাণীটিকে শনাক্ত করতে পারে। তারা সেই সম্পর্কে কোন পূর্বের জ্ঞান ছাড়াই এটি করে। তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখার উপাদান প্রক্রিয়া করে তা থেকে শনাক্তকরণের পথ খুঁজে নেয়।

একটি এএনএন একদল সংযুক্ত ইউনিট বা নোডের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় যা কৃত্রিম নিউরন নামে পরিচিত এবং যা জৈবিক মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রায় মডেল করে। প্রতিটি সংযোগ, জৈবিক মস্তিষ্কের দুটো নিউরনের সংযোগস্থলের (সাইন্যাপসের) মত একটি কৃত্রিম নিউরন থেকে অন্য একটিতে সংকেত প্রেরণ করতে পারে। একটি কৃত্রিম নিউরন সংকেত গ্রহণ করে তা প্রক্রিয়া করতে পারে এবং তারপরে এটি এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য কৃত্রিম নিউরনগুলিকে সংকেত দিতে পারে। এখানে কৃত্রিম নিউরনগুলির মধ্যে সংযোগের সংকেত একটি বাস্তব সংখ্যা এবং প্রতিটি কৃত্রিম নিউরনের আউটপুট তার ইনপুটগুলির সমষ্টির কিছু অ-রৈখিক ফাংশন দ্বারা গণনা করা হয়। কৃত্রিম নিউরনের মধ্যে সংযোগগুলিকে 'প্রান্ত' বলা হয়। কৃত্রিম নিউরন এবং প্রান্তগুলির সাধারণত একটি গুরুত্ব থাকে যা শেখার অগ্রগতির সাথে সমন্বিত হয়। কৃত্রিম নিউরনের একটি সুচনা মান

থাকতে পারে, যা সংকেত শুধুমাত্র পাঠানো হয় যখন সমষ্টিগত সংকেত সেই সুচনা মান অতিক্রম করে। সাধারণত, কৃত্রিম নিউরনগুলো স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। বিভিন্ন স্তর তাদের ইনপুটকে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করতে পারে। সংকেতগুলি প্রথম স্তরের (ইনপুট লেয়ার) থেকে শেষ স্তর (আউটপুট লেয়ার) থেকে ভ্রমণ করে, এবং তা স্তরগুলিকে একাধিকবার অতিক্রম করার পরে সম্ভব হয়ে থাকে।

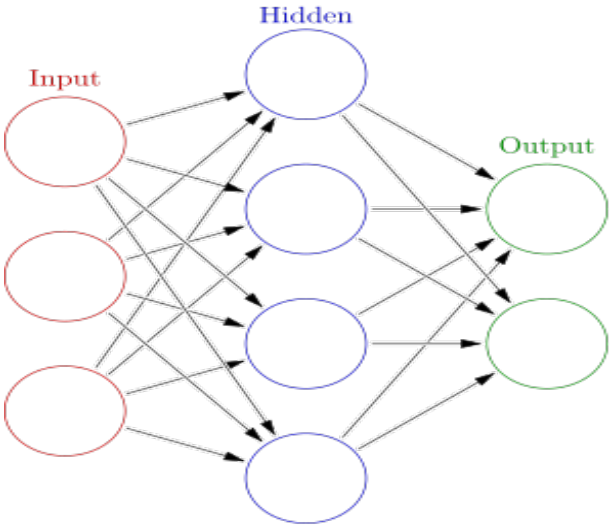

ডিপ ফেক প্রযুক্তির কৌশল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেক সমস্যার সমাধানে এই কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক সহায়ক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণে সৃষ্ট এই নব্য প্রযুক্তি, একজন মানুষ ও তার নামাঙ্কিত একটি রাস্তাকে সনাক্ত করতে জানে। শুধু নাম বললে সে ব্যক্তিকেই বোঝে কিন্তু নামের সাথে রাস্তা যুক্ত থাকলে সেটা যে একটি জায়গাকে বোঝান হয়, তা বুঝতে ভুল হয় না। যেখানে জৈবিক স্নায়ুতন্ত্র অসম্ভব জটিল সেই তুলনায় বিজ্ঞানীদের কাছে কৃত্রিম নিউরনের দল অনেকটাই সহজ সরল। তাদের কাজকে সহজ করে তুলবার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্ত হয়েছে বোধ ভিত্তিক মডেল। এই দুইয়ের মিশ্রণে কম্পিউটার সফটওয়্যার জগত পেয়েছে এক স্বশাসিত অঞ্চল। ওয়ারেন ম্যাককালোক এবং ওয়াল্টার পিটস (১৯৪৩)গণিত এবং থ্রেশহোল্ড লজিক নামক অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্য একটি কম্পিউটেশনাল মডেল তৈরি করেছেন। এই মডেল নার্ভ নেটওয়ার্ক এবং সীমাবদ্ধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার পথ প্রসারিত করে। মোটামুটি ভাবে গত শতাব্দীর ৯০ এর দশকে ডিপ ফেক ভূমিষ্ঠ হয়ে বিশেষ জায়গা দখল করেছে অচিরেই। শিক্ষা থেকে সিনেমা তৈরি এর প্রভাব ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। বাজার তো আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। অ্যামাজন, ফ্লিপ কার্টের মতন সংস্থাগুলো সদা জাগ্রত। নেপথ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিপ ফেক প্রযুক্তির কৌশল। ক্রেতা সনাক্তকরণে যেমন সহায়ক ঠিক তেমনি ক্রেতার পছন্দের জিনিস সংগ্রহ করা সহজ হয়েছে। আজকের দিনে দাড়িয়ে ঔষধ শিল্পে ডিপ ফেক প্রযুক্তি এক বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করে চলেছে। ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের সময় নেওয়া থেকে রোগের সনাক্তকরণে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে। রোগীর প্রতিনিয়ত যত্ন নিতে, বিশেষ রোগে আক্রান্ত কোন রোগীর দেখভাল করতে, ঔষধের মাত্রা নির্ধারণে এমন কি ঔষধ দেহে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তি সহায়ক। ডিপ ফেক প্রযুক্তির মাধ্যমে এক্স-রে, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (MRI), কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি স্ক্যান (CT SCAN) এর বিভিন্ন ছবি গুলোকে সঠিক ভাবে তুলে আনতে এবং তাদের পুরোপুরি বিশ্লেষণ করতে ডিপ ফেক প্রযুক্তির জুড়ি নেই। এই কাজে সহায়ক অন্যতম দুটি যন্ত্র (টুল) GAN (Generative Adversarial Networks) এবং VAE (Variational Autoncoder)। সাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক সময় কিছু রোগ বিশেষ করে ক্যান্সার আক্রান্ত স্থান সনাক্ত করা যায় না। সেখানেই ডাক পড়ে ডিপ ফেকের মত প্রযুক্তি। অন্যতম দুটি সহায়ক যন্ত্র (টুল) GAN এবং VAE প্রদত্ত তথ্যের চুল চেরা বিশ্লেষণে সঠিক তথ্য তুলে আনে।

ভালো একটি মানুষের সারাজীবন ভালো থাকা পুরোটাই সেই মানুষটির উপর নির্ভর করে না। কিছুটা তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে হয়। প্রযুক্তির স্রষ্টারাও সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কিছু উদ্ভাবন করে থাকেন। কিন্তু কিছু অসাধু মানুষের কবলে পড়ে সে দিকভ্রান্ত হয়। ডিপ ফেক প্রযুক্তির স্রষ্টারাও মানব কল্যাণের কথাই চিন্তা করেছিলেন। পূর্ব পুরুষের পুরনো ছবি অথবা কোন ভিডিও পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে এই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্ভব। কোন বক্তব্যের ডাবিং করতে এই ব্যবহার বহুল প্রচলিত। শিক্ষাক্ষেত্রেও ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে এর বেশ কিছু প্রয়োগ সম্ভব। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগের অনুসন্ধিৎসা করতে প্রয়োগ হচ্ছে ডিপ ফেক প্রযুক্তি। কিন্তু সংশ্লেষিত স্বর এমনকি ভিডিও পর্ণগ্রাফিতে প্রয়োগের বেশ কিছু রাস্তা খোলা রয়েছে। অসাধু ব্যাক্তিকে সনাক্ত করা যেমন সহজ ঠিক তেমনি অসাধু ব্যক্তির কার্যসিদ্ধি করাও সহজ হয়েছে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি থেকে বাঁচতে যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ আছে আবার জালিয়াতি করার জন্যও ডিপ ফেক প্রয়োগের রাস্তা রয়েছে। এই প্রযুক্তিকে অসাধু উপায়ে কাজে লাগিয়ে হোয়াটস অ্যাপে মিথ্যা কথোপকথন বা ভিডিও তৈরি করে। বিশেষ উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালে এটাও শোনা যায়, গবেষণা পত্রও তৈরি হয়ে যাচ্ছে আসাধু উপায়ে এই নব্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে সাধারণ মানুষ কিছু সময় মায়াজালে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ভালো মন্দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও বাড়তে শুরু করল প্রযুক্তির অকল্যাণে। প্রযুক্তি থেকে তো বেরিয়ে আসলে চলবে না। আবার মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কাছে হেরে গেলেও চলবে না। প্রযুক্তির অভিশাপ মুছে ফেলে আশীর্বাদকে গ্রহণ করব নির্বিঘ্নে। আমরা আশাবাদী প্রযুক্তিই দেখাবে নতুন আশার আলো।

Source:
(1) Deepfake - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake.
(2) What Is Deepfake? | PCMag. https://www.pcmag.com/news/what-is-a-deepfake.
(3) Deepfake Definition & Meaning - Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/deepfake.
(4) Deepfakes, explained | MIT Sloan. https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained.
(5) An Overview of Deepfake Methods in Medical Image Processing for Health Care Applications Dhanya LAKSHMI and D Jude HEMANTH1 Department of ECE Karunya Institute of technology and science, Coimbatore, India.doi:10.3233/FAIA231448

রবীন মজুমদার—জন বিজ্ঞান আন্দোলনের অসামান্য এক সেনানী

নিত্যানন্দ ঘোষ

একে একে নিভিছে দেউলটি। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম সেনানী রবীনদা (রবীন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৯৪৬-২০২৪) ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াত। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' এবং রবীনদা সমার্থক ছিলেন। একটা সময় তাঁকে সাহায্য করত বন্ধু সত্য (পদবিটা আজ আর মনে নেই) কিন্তু বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে তার অকাল প্রয়াণের পর রবীনদা একাই পত্রিকা বের করা থেকে বিতরণ সব করতেন। মনে পড়ে যাচ্ছে শেষ দিকে রবীনদা সভা সমাবেশে দেখা হলে ব্যাগ থেকে পত্রিকা বের করে জনে জনে দিতেন গ্রাহক বা পত্রিকা প্রেমীদের। বিনা পয়সাতেও পত্রিকা বিলি করতেন জন বিজ্ঞান প্রসারের দায় থেকে। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী। আজকের এই নেট দুনিয়ায় তাঁর মতো মানুষ বিরল থেকে বিরলতম।

পশ্চিমবঙ্গে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাটি গড়ে ছিল রবীনদাদের মত কয়েকজন একরোখা মানুষের জন্য যাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় মনোযোগী ছিলেন। যদিও এই বঙ্গে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী পৃথিবীখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ বোস (এস. এন. বোস) বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপুরুষ ছিলেন। ছিলেন অগ্রণী—ইংরেজিতে বলা হয় পাইওনিয়ার। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদও তিনি গড়েছিলেন।—বের করতেন 'জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকাও যা আজও প্রকাশ হয়ে চলেছে।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের ভাটার সময়ে দেশে জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পরে বেশ কয়েকজন কৃতী ব্যক্তি বা বামপন্থী, বিপ্লবী দলে যুক্ত থাকা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী গণবিজ্ঞান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রবীনদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, অন্যদের মধ্যে ছিলেন সমর বাগচি, পবন মুখোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজয় বসু, সিদ্ধার্থ ঘোষ, ভবানীপ্রসাদ সাহু, প্রবীর ঘোষ, স্বপন শীল, প্রদীপ দত্ত প্রমুখ। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রয়াত।

কুসংস্কারবিরোধী, যুক্তিবাদী গণবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের দায়বোধ থেকেই এঁরা গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে নিরলস শ্রমের মাধ্যমে হয় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করেছেন কিংবা হাতে কলমে বিজ্ঞান শেখার পাঠ দান করেছেন। রবীনদা বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৭৭-র জুলাই মাসে। পবন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 'উৎস মানুষ' প্রকাশ শুরু করেন তারও পরে ১৯৮০ নাগাদ। পবনদা তখন বিড়লা সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যেখানে আকাশবাণীতে চাকরিরত অশোকদা যেতেন পবনদার ডাকে। সমরদাও তখন সেখানে অধিকর্তা ছিলেন প্রতিষ্ঠানের। সে অর্থে রবীনদার 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পবনদার অশোকদাদের 'উৎস মানুষ' প্রকাশের আগে থেকেই গণবিজ্ঞান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' প্রকাশ হচ্ছে ১৯৭৭ থেকে। 'উৎস মানুষ' শুরু ১৯৮০ 'মানুষ' নামে এবং রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর ১৯৮১ সাল থেকে 'উৎস মানুষ' নামে। 'উৎস মানুষ' পরে একটা গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিল, প্রতি বছর তারা বিভিন্ন স্থানে পত্রিকার বাৎসরিক একটা আড্ডাও সংগঠিত করত। মনে পড়ে 'উৎস মানুষে'র শুরুর লগ্নে বন্ধু চন্দন ঘোষ (প্রয়াত) কলকাতা বইমেলায় চিৎকার করে করে পত্রিকা বিক্রি করত। এই প্রতিবেদকও চন্দনদার উদ্যোগে সামিল হতো। আসলে কথা শিল্পে (অবনীদার বই প্রকাশনী সংস্থা ও বই বিক্রির দোকান) সেই সময় আশীষদা (লাহিড়ী), সলিলদা (বিশ্বাস-প্রয়াত), অশোকদা, প্রবীরদা (মুখার্জী-হাওড়ার), পুলকদা, বন্ধু চন্দন-দাদের একটা আড্ডার আসর হতো বই প্রকাশকে কেন্দ্র করে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি জনবিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসার ও প্রচারকে কেন্দ্র করেই আড্ডাটা জমত। সে অর্থে রবীনদার রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ কেন্দ্রীক আড্ডা, আলোচনা আলাপ ইত্যাদি হতো। বন্ধু সত্যই (ডালহৌসিতে পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বা ক্যালকাটা টেলিফোনে কাজ করত) রবীনদার একমাত্র সহযোগী যে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'-র সঙ্গে যুক্ত ছিল। এছাড়া যুক্ত ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

রবীনদা প্রথম পর্বে দ্বিমাসিক পত্রিকাটি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত নিয়ম করে বের করেছেন। পরে কখনও একক বা যুগ্মসংখ্যা

হয়ে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', বেরিয়েছে। পত্রিকাটি কিছুটা অনিয়মিত হয়ে প্রকাশ হতে থাকে এবং ১৯৯৩-এ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় নতুন ফরম্যাটে ১৯৯৪ থেকে পত্রিকাটি দ্বিমাসিক থেকে ত্রৈমাসিক হয়ে উঠে। শেষ ত্রৈমাসিক যুগ্ম সংখ্যা ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেরিয়েছে পরে পত্রিকাটি বছরে একটি করে সংখ্যা বেরিয়েছে ২০২২ সাল পর্যন্ত। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী সরকারি উদ্যোগের 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সরাসরি বিরোধিতা করে প্রবন্ধ ছেপেছে। ধরা যাক সুন্দরবনে রাসায়নিক সার কারখানা গড়ে ওঠার বিরুদ্ধেই হোক বা এই রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই হোক। পোখরান বিস্ফোরণের (১৯৯৮) পর 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকায় রবিনদা ৪১ টি নিবন্ধ ও রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। পত্রিকাটির চরিত্র বোঝাতে ২০১৩-র জানুয়ারি-ডিসেম্বর সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলির শিরোনাম তুলে ধরা যাক— 'ঈশ্বর কণা ও নোবেল পুরস্কার', 'মার্কসবাদ বনাম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা', 'সবুজ অর্থব্যবস্থার রাজনীতি ও বিজ্ঞান', 'স্বাস্থ্য চিকিৎসা এখন তখন যুগে যুগে', 'সবার স্বাস্থ্য রক্তের আকাল', 'অন্ধ সংস্কার নির্মূল আন্দোলনের শহীদ দাভোলকর', 'বাংলার নবজাগরণ, বিজ্ঞান ও বাঙালী সংস্কৃতি', 'ঝিঁঝির ছন্দ অঙ্কে আনন্দ স্বাস্থ্যে হাসি', 'স্মরণ: অভি দত্ত মজুমদার, শুভাশিস মাইতি'। বিজ্ঞান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবেও রবীনদা মিছিলে মিটিং সর্বত্র পা মিলিয়েছেন। হিরোসিমা দিবস পালনই হোক কিংবা ভোপালের গ্যাস পীড়িত সমর্থনেই হোক। এরকম বহু গণবিজ্ঞান আন্দোলনে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে সামিল করিয়েছেন নিজেও সক্রিয়ভাবে জনবিজ্ঞান আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকাটি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণই নয় বিজ্ঞানকে ভালবেসে একগুচ্ছ কর্মীও তৈরি করার প্রয়াস রেখেছে। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' হোমিওপ্যাথি এবং আকুপাংচার চিকিৎসার পদ্ধতি হিসাবে কতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখে, সেই বিষয়ে মূল্যায়ন করেছে। একই সঙ্গে প্রথম বিশ্বের দেশ ড্রাগ ট্রায়ালে তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের যেভাবে গিনিপিগ করে তারও সমালোচনা করেছে। এই দেশেও যাঁরা সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত তাঁদের অভাব অভিযোগ পত্রিকার পাতায় তুলে ধরেছেন রবীনদা। পশ্চিম বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অবৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকগুলিতে যেভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছিল 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সেগুলিও মূল্যায়ন করেছে। একই সঙ্গে অচিরাচরিত বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষ করে পরীক্ষামূলক যাকে বলা হয় হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা-মধ্যপ্রদেশের বিজ্ঞানসংগঠন 'একলব্য' যা করে থাকে, রবীনদাও তাঁর পত্রিকার মধ্য দিয়ে এ রাজ্যে করার চেষ্টা করেছেন। 'একলব্য'-এর মতো অন্যান্য জন আন্দোলন যেমন ছত্তিশগড়ের শহিদ হাসপাতাল কিংবা ল্যাতিন আমেরিকার জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের মতো আন্দোলনগুলিতে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' যুক্ত থেকেছে। এসবের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলায় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাকে পোক্ত ও পুষ্ট করার কাজ করেছেন রবীনদা।

বর্ধমান জেলার মেমারি অঞ্চলের এক গ্রামে ১৯৪৬ সালের ২৪ নভেম্বর রবীনদার জন্ম। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে রসায়ন শাস্ত্রে সাম্মানিক স্নাতকে ভর্তি হন এবং প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি-টেক ও এম. টেক ডিগ্রি লাভ এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে পিএইচডি এবং ১৯৭৪ সালে কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগে শিক্ষক পদে বৃত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংলন্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৪-৮৫ সালে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপে যোগ দেন। ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন একই বিভাগে এবং ১৯৯৩-৯৫ পর্যন্ত কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর পড়াশোনা ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেমন ছিল না গবেষণাও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে নিবদ্ধ ছিল না।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' এবং রবীনদাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না— যেতও না। এইরকম একজন কৃতীমানুষকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। যে কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনে কিংবা গণ আন্দোলনের কর্মসূচিতে দেখা হলে সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন এবং পত্রিকা যাঁরা পাননি তাঁদের দিতেন ঝুলি থেকে বের করে। শেষের দিকে পত্রিকা প্রকাশ যখন বন্ধ করে দিয়েছেন দেখা হলে বিনা পয়সাতেই শেষ সংখ্যাটি বিতরণ করতেন। 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র বহু সংখ্যার বিষয়বস্তু ছোট পুস্তিকাকারেও বের করে বিলি করেছেন। সেরকমই একটি পুস্তিকা ছিল ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান শিক্ষা ও মাধ্যমিক হালচাল'। পরিবেশ দূষণের উপর ১৯৯৮ সালে বই লিখেছিলেন 'পরিবেশ দূষণ পরিচিতি ও পরিমাপ।' মণিদার (মণীন্দ্র মজুমদার) সঙ্গে পরিবেশের উপর পরিবেশবিদ্যা সংক্রান্ত বই 'পরিবেশ বিদ্যা পরিচয়' লিখেছেন ২০০২ সালে। এই বই পশ্চিমবাংলায় স্নাতকস্তরে পরিবেশ বিদ্যা হিসাবে অবশ্য পাঠ্য ছিল। অন্যান্য পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'বিজ্ঞান আন্দোলনের সন্ধানে' (১৯৭৯) এবং ২০১৬ সালে লেখা 'ভারতের আম আদমির জনবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' এবং 'বিজ্ঞান আন্দোলন অথবা কূপমণ্ডুকতার চর্চা' উল্লেখযোগ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এর অবদান ও স্বপ্ন নিয়ে একটি দৈনিকে বেশ কয়েকটি উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। আচার্য যেমন বিজ্ঞান, সমাজ ও মানব এই ত্রিফলার উপর জোর দিতেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রবীনদা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে 'বিজ্ঞান সমাজ মানুষ' শিরোনামে ২০০৬ সালে বেশ কিছু লেখা ছেপেছিলেন।

রবীনদা'র মৃত্যুর পর খুব বেশি চর্চা হয় নি। 'ফ্রন্টিয়ার' (সমর সেন প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক, বর্তমানে তিমির বসু সম্পাদক) পত্রিকায় সব্যসাচী চ্যাটার্জী একটি প্রতিবেদন লিখেছেন। মানুষের জন্য যাঁরা নীরবে নিঃশব্দে কাজ করে যান তাঁদের কথা কে-ই বা ভাবে? শুধু বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী' পরিবারেই নয়, রবিনদার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী সমর্থকদের মধ্যেও।

নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম অধরা ছায়া:অথবা মোহিনীমায়া

সুমনা সেনগুপ্ত

OFFICE OF
THE DISTRICT MAGISTRATE
& COLLECTOR,
MURSHIDABAD
(P&RD Section)

New Administrative Building
Berhampore, Dist: Murshidabad
Phone: (03482) 251069
E-mail: dprdomsd@gmail.com

Memo No: 132(26)/P&RD/MSD Date: 24-1-24

To
1-26: The Block Development Officer (All)
Murshidabad

Sub: **Various Training Programme under revamped RGSA of Murshidabad District will be held at Zilla Parishad Auditorium (Hizal), Panchanantala, Berhampore, Murshidabad.**

Ref: Vide letter memo no. 1012(22) PRD-45011/8/2021-STARPARD SEC (PRD)- Dept. Dt. 21.12.2023 received from the Special Commissioner, P&RD Department, Government of West Bengal

I am directed to inform you that, in reference to the above noted subject, **Various Training Programme under revamped RGSA of Murshidabad District will be held at Zilla Parishad Auditorium (Hizal), Panchanantala, Berhampore, Murshidabad as follows:**

Sl No	Name of Training	Category of Participants	Total Participants	Date of Training	Venue of Training
1.	Training on E-Tender for Gram Panchayats	1. Pradhan of Gram Panchayats (All) 2. Sanchalak of Shilpo O Parikathamo Upa Samiti (All) 3. Nirman Sahayak of Gram Panchayat (All)	750	30.01.24 & 31.01.24	Zilla Parishad Auditorium (Hizal), Panchanantala, Berhampore, Murshidabad
2.	Training on Augmentation of Own Sourse Revenue (OSR) in Gram Panchayats	1. Pradhan of Gram Panchayats (All) 2. One Employee of GP	500	01.02.24	
3.	Training on Sishu Sabha & Mahila Sabha	1. Sanchalak of Nari Sishu Unnayan O Samaj Kalyan Upa Samiti (All) 2. One Employee of GP 3. One Frontline worker of GP	750	02.02.24	
4.	Special Training for newly elected Women Pradhan & their Husband and one GP Employee	1. Women Pradhan (All) & 2. Their Husband (All) 3. One concerned GP employee (Total women Pradhan-172)	516	05.02.24 & 06.02.24	

Therefore, you are requested to inform the participants to attend training programme in scheduled date at Zilla Parishad Auditorium (Hizal), Panchanantala, Berhampore with out fail & training will start at 11.00 am sharp.

Thanking you

24/1/24.
District Panchayats & Rural Development Officer
Murshidabad

Memo No: 132/1(4)/P&RD/MSD Date: 24-1-24

Copy forwarded for information and necessary action:

1. The District Coordinator, ISGPP-II, Murshidabad
2. The Pradhan of Gram Panchayat (All), Murshidabad
3. PA to the District Magistrate, Murshidabad.
4. CA to the Additional District Magistrate (Zilla Parishad), Murshidabad.

24/1/24
District Panchayats & Rural Development Officer
Murshidabad

উপরের সরকারি নোটিশের ৪ নং কলমটা একটু লক্ষ করুন, আমাদের দেশে সংবিধানে ৭২ তম সংশোধনীতে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল এই প্রতিনিধিত্বের ফলে মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, অর্দ্ধেক আকাশে আলো জ্বলে উঠবে। সামগ্রিকভাবে আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নত হবে। কিন্তু আজ ২০২৪-এ দাঁড়িয়ে সরকারকে রীতিমতো নোটিশ জারি করে বলতে হচ্ছে, প্রত্যেক মহিলা প্রধানদের সঙ্গে যেন অবশ্যই তাদের স্বামীরা মিটিং-এ আসেন।

গীতা মুখোপাধ্যায়

অথচ এই হতাশাজনক পুতুল প্রতিনিধিত্বের চিত্র আমাদের দেখার কথা ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষেও বহু সংখ্যক নারীর স্বাধীন আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও উজ্জ্বল আত্মত্যাগের বিবরণ আমরা ইতিহাসে পড়েছি। বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় কিভাবে সাধারণ খেটে খাওয়া মহিলারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সে দৃষ্টান্তও কম নয়। তাহলে কেন এ দুরবস্থা হল? এমনতো হওয়ার কথা ছিল না। এর উত্তর খুঁজতে গেলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের সংবিধান তখন লেখা হচ্ছে, খসড়া কমিটির সভাপতি ড. বি. আর. আম্বেদকর । নারী ও দলিতদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আম্বেদকর বিরোধী দলে থাকা সত্ত্বেও নেহেরু মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি সংবিধানের খসড়া রচনার দায়িত্ব পান। ভারতের পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ কাঠামোয় বর্ণ, জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে সহস্রাব্দ প্রাচীন বৈষম্যের অবসানের জন্য তিনি বিলে বেশকিছু প্রস্তাব যুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা কিছু ধারার কথা উল্লেখ করতে পারি। 14 নং ধারায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে সম অধিকার ও সম সুযোগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। 15 নং ধারায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্য আইনত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 15(3) নং ধারায় নারীদের জন্য 'aestivative discrimination' এর কথা বলা হয়েছে। 39 নং ধারায় সমকাজে সমমজুরি, 42 নং ধারায় কাজের জায়গায় মানবিক পরিস্থিতি তৈরি ও নারীদের মাতৃত্বকালীন অবসরের কথা বলা হয়েছিল। আম্বেদকরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল 243D(3), 243T(3) এবং 243R(4) এই ধারাগুলি। এখানে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। এছাড়াও মহিলাদের পক্ষে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সদর্থক চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

যদিও ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেহেরু মন্ত্রীসভা হিন্দু কোড বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে এটি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সংসদের পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। এর পরবর্তী সময়ে বিলের বিরুদ্ধে মারাত্মক বিরোধিতা তৈরি হয়। যার পুরোভাগে ছিলেন সংসদের উচ্চবর্ণ মনুবাদী সদস্যগণ। জনসংঘ নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিলের বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য বিবৃতি জারি করে বলেন, 'হিন্দু কোড বিল, হিন্দু সংস্কৃতির একটি গতিশীল ও মহৎ কাঠামোকে নষ্ট করবে, যা বহু শতাব্দী ধরে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।''

১৯৫১-র ২৭ সেপ্টেম্বর আম্বেদকর নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ পত্রে আম্বেদকর লেখেন, 'For a long time I have been thinking of resigning my seat from cabinet. The only thing that had held me back from giving effect to my intention was the hope that it would be possible to give effect to the Hindu Code Bill before the life of present parliament came to an end. I even agreed to break up the bill and restricted it to marriage and divorce in the fond hope that at least this much of our labour bear fruit. But even that part of the bill had been killed. I see no purpose in my continuing to be a member of your cabinet.'

আমার আজকের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৩-এর সংবিধান সংশোধন বিল যার পোষাকী নাম নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম। কিন্তু মূল প্রসঙ্গে আসার আগে প্রেক্ষাপটটি বলে নিতে হল তিনটি কারণে প্রথমতঃ আম্বেদকরের হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ করেছিলেন আরএসএস-এর সদস্যরা। আজ তারা কি তাদের চরিত্র পাল্টে ফেলে রাতারাতি মহিলা প্রগতির ধ্বজাধারী হয়ে উঠলেন? দ্বিতীয়তঃ হিন্দু কোড বিল ওই সময় পাশ হলে এই ৭০ বছরে তাঁরা কি তাঁদের কথা নিজের মুখে বলতে পারতেন না? না কি স্বামীদের হাতের পুতুল হয়েই থেকে যেতেন? তৃতীয়তঃ এই আইন আমাদের দেশের লোকসভা ও বিধানসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার এবং তাদের নিজস্ব decision making process কে কতটা প্রভাবিত করবে? প্রসঙ্গতঃ ভারতে এখন লোকসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব ১৫ শতাংশ, রাজ্যসভায় ১১ শতাংশ আর ১৯টি রাজ্যের বিধানসভায় ১০ শতাংশ -এরও কম। সারা বিশ্বের নিরিখে ভারতের স্থান ১৪৪ তম ।

২০২৩-এ নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম নামক এই বিলটি পাশ হলেও এর পিছনের লড়াইটি প্রায় দীর্ঘদিনের তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে ও স্থানীয় স্তরে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল প্রথম পেশ করেন রাজীব গান্ধী কিন্তু তা পাশ হয় ১৯৯২ সালে নরসিমা রাওয়ের আমলে এবং চালু হয় ১৯৯৩ সালে সংবিধানের ৭২ ও ৭৩ তম সংশোধনীতে। এই সংশোধনীতে লোকসভা ও বিধানসভায় জনসংখ্যার অনুপাতে তপসিল জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষদের জন্যও আসন সংরক্ষিত রাখা হয়, কিন্তু মহিলাদের জন্য

কোনো সংরক্ষণ এই সংশোধনীতে ছিল না।

পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের সংরক্ষণ এবং প্রায় ১০ লক্ষ মহিলাদের নির্বাচন মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এক উদ্দীপনা তৈরি করে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়-ঝাড়খণ্ড ও কেরালা রাজ্যে স্থানীয় স্তরে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের আইন করে। এরপরই লোকসভা, রাজ্যসভা ও রাজ্যবিধানসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে।

প্রথম নারী সংরক্ষণ বিলের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয় ১৯৯৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, ৮১ তম সংবিধান সংশোধনীতে। এখানে সংসদে ও বিধানসভায় ১/৩ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মহিলাদের জন্য কোনো পৃথক সংরক্ষণ ছিল না, তাই বিশেষ করে ওবিসি সাংসদরা এই বিলের জোরালো প্রতিবাদ করেন। সংরক্ষণ বিরোধীরাও সংরক্ষণ বাতিল করতে বলেন। এরপর সাংসদ গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি সিলেক্ট কমিটিতে বিলটিকে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। এই কমিটিতে লোকসভার ২১ জন সদস্য এবং রাজসভা থেকে ২০ জন সদস্য ছিলেন।

নানা দলের মহিলারাই আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন এই বিল যেন আইনে পরিণত হয়। তাই তাঁরা সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন নারী সংগঠন ও দলের কাছ থেকে স্মারকলিপি সংগ্রহ করেন। বিল তৈরিতে সাহায্য করার জন্য বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেওয়া হয়। প্রচন্ড পরিশ্রম করে ১৯৯৬ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে একাদশ লোকসভায় এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। এখানে গৃহীত সুপারিশগুলো ছিল

১। রাজ্যসভা ও বিধানপরিষদে সংরক্ষণ।

২। মহিলা সংরক্ষণের ১৫ বছর পর রিভিউ।

৩। সংবিধান সংশোধন হয়ে ওবিসি সংরক্ষণ চালু হওয়ার পর মহিলাদের মধ্যের ওবিসি সংরক্ষণ চালু হবে।

৪। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ হবে।

৫। কোনো রাজ্যে তিনটের কম আসন অথবা এস.সি / এস. টিদের জন্য আসন থাকলে সেখানে পৃথক ব্যবস্থা।

৬। দিল্লি বিধানসভাতেও এই বিল প্রযোজ্য।

৭। সংরক্ষণ এক তৃতীয়াংশের যত কাছাকাছি সম্ভব হতে হবে।

আবার ওবিসি প্রশ্নে তুমুল বিরোধিতা দেখা যায়। মুলায়াম সিং, শরদ যাদব প্রমুখ নেতারা আত্মহত্যারও হুমকি দেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৯৭ সালে গুজরালের মন্ত্রীসভায় বাদল অধিবেশনের বিলটি ওঠে। কিন্তু কোনোমতেই গীতা মুখার্জী ও তাঁর দল বিলটি পেশই করতে পারেন না। গীতা পাঁচ জন বাম-কংগ্রেস মহিলা সাংসদের সঙ্গে হাউস থেকে ওয়াক আউট করেন। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে নারীরা বিক্ষোভ দেখান। পুলিশি নির্যাতন চলে। আবারও বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে বিলটি পেশ হয়। যথারীতি আবারও বিল পাশ হয় না। ২০১০ সালে রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হয় কিন্তু লোকসভায় আবার বাতিল হয়ে যায়।

এই বিলের ধারাবাহিক ব্যর্থতার পিছনে ছিল সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, আরজেডি'র মতো ওবিসি প্রধান দলগুলি। ওবিসি মহিলাদের জন্য পৃথক সংরক্ষণের প্রশ্নে তাঁর বার বার সংসদের ভিতরে বাইরে তুমুল বিরোধিতা করেছেন।

এবার দেখা যাক ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে যে বিল শেষপর্যন্ত পাশ হল সেখানে আমরা কি পেলাম ?

১। 330A ধারায় বলা হল লোকসভায় মহিলাদের জন্য ১/৩ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

২। 332A ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হয়েছে।

৩। 239AA ধারা অনুযায়ী এই সংরক্ষণ দিল্লির NCT অঞ্চলেও প্রযোজ্য।

এই তিনটে ধারায় আমরা নতুন কিছু পেলাম কী? বরং আগের বিলগুলোয় রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদে যে আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব ছিল তাও বাতিল করা হল। অন্যান্য অনগ্রসর প্রার্থীদের প্রশ্নেও কোনো উচ্চবাচ্চ করা হল না। অথচ এ যাবৎ এই ওবিসি প্রশ্নেই মূলত বিলটি পাশ হতে পারেনি।

এবারে আমরা দেখি মোদীর master stroke। বিলের 334A ধারায় বলা হল, এই বিল কার্যকরি হবে জনগণনা হওয়ার পর আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে। শেষ জনগণনা হয়েছিল ২০২১ সালে। অতএব অদূর ভবিষ্যতেও জনগণনা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তারপরেও আসনের পুনর্বিন্যাস এবং সেই সংক্রান্ত নানা বিতর্ক পেরিয়ে এই আইন কার্যকরি হওয়া (যদি আদৌ হয়) সুদূরপ্রসারী কল্পনা।

তাহলে প্রশ্ন এত তড়িঘড়ি কেন এই বিল পাশ করা হল? এবং ওবিসি প্রশ্নে অন্যান্য দলগুলি প্রায় নিশ্চুপ থাকলো কেন? যে কোনো খেলাতেই টাইমটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কারণ সামনে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন ছিল। শুধু পাকিস্তান আর হিন্দু-মুসলিম দিয়ে এবং যদি মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে রাজ্যপাট ধরে রাখা যাবে কিনা বিজেপি'র অন্দরমহলেই এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিচ্ছিল। কাজেই নারীদের উদ্ধার কর্তা হিসেবে প্রগতিশীল সাজার একটা প্রচেষ্টা হল। উল্টোদিকে শুধুমাত্র কংগ্রেস ছাড়া (তাও খুবই সামান্য) আর কোনো দল কোনো প্রতিবাদ করল না কারণ এই ভোটের বাজারে কে আর নারী সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করার ঝুঁকি নেবে? এই আইন মোদীর ভোটের ঝুলি আদৌ ভরাতে না পারলেও আপাতত যে মহিলাদের জন্য এই আইন চালু হল, তাদের হাতে রইল শুধুই পেনসিল।

সূত্র :

১। মহিলা সংরক্ষণ বিল কি একটি পোষ্ট ডেটেড চেক? শতাব্দী দাস সহমন ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

2। Disparities Com Women Reservation Bill-2023.

৩। The wire.in - Ambedkar : Architect of Constitution and women's empowerment.

মেক্সিকোর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট

বাপ্পাদিত্য রায়

মেক্সিকোর বিশিষ্ট শিক্ষা ও পরিবেশবিদ এবং বামপন্থী **'ন্যাশনাল রেজেনারেশন মুভমেন্ট' (MORENA)'** দলের নেত্রী ক্লডিয়া শেনবাম পার্দো (জন্ম: ১৯৬২) প্রতিপক্ষকে ৩০% এর বেশি ভোট পার্থক্যে পরাজিত করে আগামী ছয় বছরের জন্য মেক্সিকোর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বচিত হলেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং এ উচ্চ ডিগ্রি ধারী এবং ১০০ এর বেশি গবেষণা পত্র, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকের রচয়িতা বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা এই বিদুষী জননেত্রী প্রশাসক হিসাবেও দক্ষ।

'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি)' এর সাথে কাজ করেছেন। মেক্সিকো সিটি সরকারের পরিবেশ সেক্রেটারি ছিলেন (২০০০-২০০৬)। ছিলেন তালপান (Tlalpan) ঐতিহ্যবাহী অঞ্চলের মেয়র (২০১৫ - '১৭) এবং মেক্সিকো সিটি সরকারের প্রধান (২০১৮-'২৩)। তাঁর কর্মজীবনে মেক্সিকোর বিখ্যাত গণপরিবহন ব্যবস্থা (Bus Rapid Transport) METROBUS, মেক্সিকো সিটি কে ঘিরে রিং রোড (Anille Periferice) নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ১ কোটি ২০ লক্ষ প্রি স্কুল থেকে সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান, ইনস্টিটিউট অফ হায়ার স্টাডিজ ও ইউনিভার্সিটি অফ হেল্থ নির্মাণ, প্রান্তিক অঞ্চলে কমিউনিটি সেন্টার (Pilares) নির্মাণ করে বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি, নানা পদ্ধতি নিয়ে ৩০% দূষণ কমানো, দেড় কোটি বৃক্ষ রোপন ও তাদের বড় করা, সিঙ্গেল ইউজ প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ করা, বর্জ্য পৃথকীকরণ সংস্থাপন ও পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা চালু করা, বিভিন্ন স্থানে সোলার প্যানেল বসিয়ে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন, ২০০ কিমি বাইসাইকেল রোড বানিয়ে ও বাইসাইকেল বণ্টন করে দূষণহীন স্বাস্থ্যকর পরিবহনের ব্যবস্থা, দূষণহীন কেবল বাস চালু ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য পদক্ষেপ। তাঁর সময় আমেরিকায় ঔপনিবেশিকতার প্রতীক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের বিশাল মূর্তি সরানো এবং একটি গির্জার দখল করা জমিতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙ্গা হয়। আইন শৃংখলার উন্নতি ঘটে। কোভিড পরিস্থিতি ভালোভাবে সামলানোর জন্য তাঁর নাম World Mayor Prize ২০২১ এর জন্য মনোনীত হয়।

প্রেসিডেন্ট শেনবাম মেক্সিকোর প্রথম ইহুদি বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই বিজ্ঞানী। ভাই পদার্থবিদ। বর্তমান স্বামী অর্থনীতিবিদ। দুই সন্তানের জননী প্রেসিডেন্ট তাঁর পূর্বসুরী ও নেতা আন্দ্রে ম্যানুয়াল লোপেজ ওব্রাডর (AMLO) এর মত দেশের চতুর্থ রূপান্তরের **(4th Transformation)** প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

তাঁদের চতুর্থ রূপান্তরের পথ: এতদিনকার কতিপয় ধনীদের কথা ভেবে নীতিমালার বর্জন। জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও গণ পরিবহন সহ দেশের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতি, বিনামূল্যে সকলের জন্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, বয়স্কদের জন্য পেনশন, পড়ুয়া দের জন্য স্কলারশিপ, দুর্গম ও জনজাতি অঞ্চলে খাদ্য বণ্টন ও সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির ব্যবস্থা। ১৫০০ কিমি এর বেশি বিস্তৃত Mayan Rail (TREN MAYA) রেল ব্যবস্থাকে কার্যকর করা। গ্রাম এবং দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। দুর্নীতি রোধ ও গণতন্ত্র রক্ষা। নারী কল্যাণ। আইন শৃংখলার উন্নতি। ড্রাগ ঘটিত অপরাধ কমানো। বিভিন্ন জনমুখী দিশা ও প্রকল্প।

মেক্সিকোর বামপন্থীদের কাছে দেশের প্রথম তিনটি রূপান্তর: ঔপনিবেশিক স্পেনের থেকে স্বাধীনতা (১৮১০-'২১), গির্জা থেকে সরকারের পৃথকীকরণ সহ সংস্কার (১৮৫৮-'৬১) এবং বিপ্লব (১৯১০-'১৭)।

প্রসঙ্গত মেক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টি (Partido Communista Mexicana, PCM), প্রথমে ১৯১৭ তে সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (PSO), পরে ১৯১৯ তে পূর্ণাঙ্গ রূপে গড়ে ওঠে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায় (নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, ১৮৮৭-১৯৫৪) এবং তাঁর সমাজতন্ত্রী মার্কিন স্ত্রী শান্তি দেবীর (ইভলিন ট্রেন্ট রয়, ১৮৯২-১৯৭০) হাত ধরে। তাঁরা রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসা বিপ্লবী নেতা মিখাইল বোরোদিনকে সহযোগিতা করেন। এরপর লেনিন ও কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর আমন্ত্রণে মেক্সিকো সরকারের সহায়তায় ছদ্মনামে ইউরোপ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যান। আবার তাঁদের ও অবনী মুখার্জির হাত ধরে ১৯২০ তে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (Indian Communist Party) জন্ম।

মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি (PCM) তারপর বহু চড়াই উতরাই, দমন নিষেধাজ্ঞা, আন্দোলন পশ্চাদপসরণ, ভাঙ্গা গড়া র মধ্যে দিয়ে ১৯৮১ তে সমমনস্ক কয়েকটি বাম দলের সাথে মিলিত হয়ে তৈরি হয় ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ মেক্সিকো (PSUM)। ১৯৮৯ তে পার্টি অফ ডেমোক্র্যাটিক রিভলিউশন (PRD) এর সাথে যুক্ত হয়। শেনবাম ছিলেন ছাত্র ফ্রন্টে PRD এর নেত্রী। পরে আরও কিছু ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে মেক্সিকান সোশ্যালিস্ট পার্টি (PMS), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (FDN) প্রভৃতির সাথে যৌথ কার্যকলাপের পর ১৯৯৪ তে তৈরি হয় কমিউনিস্ট পার্টি অফ মেক্সিকো (PCM)। অন্যদিকে রেভলিউশনারি ইনস্টিটিউট পার্টি (PRI) ও PRD থেকে বড় অংশ AMLO র নেতৃত্বে বেরিয়ে গিয়ে MORENA গঠন করে। এটি বর্তমানে মেক্সিকোর সর্ববৃহৎ বাম দল এবং ২০১৮ থেকে দেশের ক্ষমতায়।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ

বরুণ দাস

গাছের গোড়া কেটে জল ঢালার কাজে আমরা বেশ ওস্তাদ। এই ওস্তাদি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণের দিকে আমাদের নজর অপেক্ষাকৃত বেশি। অথচ এখানে যাঁরা আসবেন, তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে বাধা সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। কিভাবে? আসলে রাজ্যের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিই সরকারের অবহেলার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পা রাখার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এই সুচিন্তিত সরকারি পদক্ষেপের মানে কি? সমালোচকেরা প্রশ্ন তুলেছেন, রাজ্যের প্রান্তিক মানুষ যাতে সরকারি উদ্যোগের সুফল গ্রহণ করতে না পারেন, সেজন্য ঘুরপথেই কি এমন কাজ করা হচ্ছে? এই প্রশ্নের পিছনে সরকারপক্ষ যতোই কুৎসা কিংবা ষড়যন্ত্রের আভাস পান না কেন, বাস্তবের সম্পৃক্ততা বড়ো বেশি চোখে পড়ে। কেননা শিক্ষার অধিকার বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে জেলার গরিব তথা প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ। যাদের আর্থিক সক্ষমতা কম। বেসরকারি বিদ্যালয়ে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের পড়ানোর ক্ষমতাই যাদের নেই।

সরকারি পক্ষ হয়তো নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে সাফাই গাইতে পারেন। কি সেই সাফাই? প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী না থাকলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা দিনের পর দিন খুলে রেখে কি লাভ? মাসে মাসে শিক্ষকদের বেতন গুনে সরকারি কোষাগার শূন্য করার অর্থই বা কি? তার চেয়ে তাদেরকে অন্য কোনও কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। তাতে সরকার তথা সমাজেরই বরং লাভ। সরকারেরও সাশ্রয়। আপাতদৃষ্টিতে কথাগুলো আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হবে। সত্যিই তো বিনাকাজে বেতন দিয়ে লাভ কি? জনগণের প্রদেয় কর-এর টাকা তো বাঁচবে।

কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী না আসার মূল কারণ কি? এজন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। প্রশ্ন, তাহলে কি এরাজ্যে জনসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে? যারফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীও কমে যাচ্ছে? কিন্তু জনসংখ্যার পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলছে না। বিদ্যালয়ের চাহিদাও কিন্তু কম নয়। বরং ক্রমবর্ধমান। পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য অভিভাবকেরা হন্যে হয়ে ছুটছেন। সাধারণ মানের বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে মোটা টাকা ঘুষ দিয়েও ভর্তি করাতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ অভিভাবকেরা।

তাহলে রাজ্য সরকারের দেওয়া যুক্তি তো কোনও ভাবেই ধোপে টেকে না। বাস্তবের সঙ্গে একেবারেই অমিল। প্রশ্ন হল, কেন ছাত্রছাত্রীরা সরকারি বিদ্যালয়ে আসছে না? আমাদের পাল্টা প্রশ্ন, কেন ছাত্রছাত্রীরা আসবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে? যদি সেখানে পড়াশুনোর ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকুই না থাকে। দিনের পর দিন সরকারি বিদ্যালয়ে গিয়ে যদি পড়াশুনোটাই না হয়, তাহলে তারা যাবে কেন? কেনই বা তাদের অভাবী ঘরের অভিভাবকেরা যেতে দেবেন তাদের সন্তান-সন্ততিদের। বরং ক্ষেতে-খামারে রোজগারের বাবা-মায়েদের সহযোগিতা করবে।

একথা ঠিক, বামফ্রন্ট সরকারের সৌজন্যে স্কুল-শিক্ষকেরা সম্মানজনক বেতন পেয়েছেন। সরকার তাঁদের বেতনের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে নিয়েছেন। শিক্ষকতার চাকরিতে যাঁদের আয়ের কোনও স্থিরতা ছিল না, তাঁদেরকে আয়ের স্থিরতা দিয়েছিলেন ওই সরকার। এজন্য অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কারণ মানুষ গড়ার কারিগরদের অসম্মানজনক ও অভুক্ত রেখে কোনও সমাজ বা দেশই গৌরব অর্জন করতে পারে না। বিশেষ করে শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। মোদ্দা কথা হল, পেট খালি রেখে তারা পড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে উৎসাহ পাবেন কি করে?

তাই বেশ বাহবাও কুড়িয়েছিলেন 'জনদরদি' বাম সরকার। কিন্তু ওই ভালো কাজের পাশাপাশি তাঁরা একটি অত্যন্ত খারাপ কাজও করেছিলেন। শিক্ষকদের কব্জা করে তাঁরা তাঁদের দলে টেনেছিলেন। দলীয় বাম রাজনীতিতে তাদের সংস্কার হয়েছিল সেদিন। ফলে তাঁরা নতুন সম্মানজনক বেতন কাঠামোর অধিকারি হয়ে শাসকদলের পদানত হয়ে যান। এরফলে তাঁদের সময়মত বিদ্যালয়ে না আসলেও চলত। পড়ানো তো অনেক পরের কথা। কেউ বলার ছিল না। পরিচালন সমিতিও ছিল তাঁদের কবজায়। 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' পরিস্থিতির জন্ম দেন তারা।

অনেকেই কমবেশি জানেন, গত শতকের '৯৭-র আগে স্কুল সার্ভিস কমিশন [এসএসসি] তৈরি হয়নি। অভিযোগ, শাসকদলের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিই নিজেদের লোকদের শিক্ষক হিসবে নিয়োগ করতেন। ফলে রাজনীতির আখড়া হয়ে উঠল প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারি বিদ্যালয়গুলি। প্রায় সবাই দলীয় রাজনীতির ধারক-বাহক হয়ে উঠলেন। বিদ্যালয় নয়, শুধু দলীয় কার্যালয়ে হাজিরা আর দলীয় কাজে অংশ নিলেই হল। ক্রমে তা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংক্রামিত হল। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হাজিরা হ্রাস পেল।

সপ্তাহে কিংবা মাসে একদিন নিজের বিদ্যালয়ে গিয়ে হাজিরা খাতায় [অ্যাটেনডেন্স রেজিস্ট্রার-এ] পর পর সাক্ষর করে এলেই হল। জেলাপার্টির দায়িত্ব পাওয়া কেউ কেউ আবার তাও করতেন না। বেতন ঢুকে যেত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এভাবেই সরকারি প্রাথমিক

ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সর্বনাশের পথ দেখিয়ে দিলেন ওই সময়ের বাম সরকার। শিক্ষকদের সিংহভাগই তখন বাম সমর্থক। কারণ নেতাদের ধরে- কয়ে বাড়ির কাছে বদলি হয়ে আসাটাও তখন সুবিধে। কে আর এই সুবিধে হারাতে চায়?

২০১১-র পর রাজ্যে রাজনৈতিক 'পরিবর্তন' এসেছে। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে 'সর্বহারার নয়নের মণি' 'উন্নততর' বাম আমলের চালু করা 'অলিখিত অনিয়ম' বা কু-পরিস্থিতির কোনওরকম পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু নিজেদের সাবেকি সুযোগ-সুবিধেগুলো বজায় রাখার জন্য অনেকে রাজনৈতিক শিবির পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি বদলায় নি। বরং দিনে দিনে তা আরও খারাপ হয়েছে। কতোটা খারাপ তা সাম্প্রতিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ-দুর্নীতি নিয়ে মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে সিবিআই-ইডি তদন্তেই আমাদের সামনে এসেছে।

সম্প্রতি কলকাতা উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতি রাজ্যের ৮২০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের এই নির্দেশ লুফে নিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর। যে দপ্তর প্রায় 'কোমায় চলে গেছে' বলে বিরোধীদের জোরালো অভিযোগ। বছর খানেক ধরে চলা চূড়ান্ত অচলাবস্থা দেখে সাধারণ মানুষও তাই বিশ্বাস করেন। কারণ দলবেঁধে জেলভ্রমণে গেছেন শিক্ষা পর্ষদের রাঘব-বোয়ালেরা। খোদ মন্ত্রী মহোদয় থেকে শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি-উপদেষ্টা সবাই। চাকরিও গেছে অনেকের। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এ এক বিরল পরিস্থিতি বটে।

স্বাধীনতার পর এমন দুরবস্থার কবলে পড়েনি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। অদক্ষতা, ব্যর্থতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের নানাবিধ অভিযোগ কমবেশি উঠলেও এমন নজিরবিহীন লজ্জাজনক পরিস্থিতির কখনও সম্মুখিন হয়নি সংশ্লিষ্ট দপ্তর। পর্ষদ সভাপতি থেকে পর্ষদ উপদেষ্টা, শিক্ষামন্ত্রী থেকে উপাচার্য, এমন কি, শিক্ষাসচিবও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত- এমনটা আগে কেউ কখনও শোনেননি। পরিবর্তনের আমলে এমন নজর-কাড়া পরিস্থিতি দেখা গেছে। যাকে এক কথায় অভূতপূর্ব বলাটাও বুঝি-বা কম বলা হয়। এ কোন্ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা?

এবার আসা যাক কেন কলকাতা উচ্চ আদালতের এই নির্বিকল্প নির্দেশ প্রদান সে বিষয়ে। সংবাদে প্রকাশ, যেসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩০ জনের কম- সেসব বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন মহামান্য আদালত। আদালতের এই নির্দেশ পেয়ে জরুরি ভিত্তিতে ওইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাও প্রকাশ করছে রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর। একেবারে 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।' কেন তাদের এই 'যুদ্ধকালীন তৎপরতা?' কেনই বা তা রাতারাতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া? এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্যই বা কি?

কেউ কেউ অবশ্য এমন 'কূট-প্রশ্ন'ও তুলছেন। তারা এও বলছেন, আসলে বছরভর মেলা-খেলা-উৎসব-অনুষ্ঠানে উৎসাহী রাজ্য সরকার আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের দায় বহন করতে চাইছেন না। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে কি লাভ? তাতে ভোট বেশি আসবে কি? শিক্ষা পেলে মানুষ বরং সচেতন হয়ে উঠবে। ভালো-মন্দ বুঝতে শিখবে। বিচার-বিবেচনা করতে আগ্রহ দেখাবে। তা কি কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে সুফল দিতে পারে? বোধহয় না। তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই।

এখানে উল্লেখ্য, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যানই বলছে, গত দশবছরে রাজ্যে ৭,০১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই সরকারি পরিসংখ্যান আরও জানাচ্ছে, ২০১২-তে রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৪,৭১৩টি। ২০২২-এ এসে দাঁড়িয়েছে ৬৯,৬৯৯টি। সাম্প্রতিক তালিকাটি যোগ করলে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়ে তালিকা দাঁড়াবে ১৫,২২৫টি। শতকরা হিসেবে ২০ শতাংশ। তাহলে প্রশ্ন জাগে, গত দশবছরে এরাজ্যের জনসংখ্যা কি দ্রুত কমে যাচ্ছে? কিন্তু তেমন কোনও আশাজনক পরিস্থিতি তো এখনও তৈরি হয়নি। তাহলে?

একবার দেখা যাক, রাজ্যের ঠিক কোন কোন অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই কালো তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার ১৩টি ব্লকের ১১৯২টি বিদ্যালয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী প্রধান ১০৪৭টি বিদ্যালয়। পূর্ব মেদিনীপুরের ৮৬৮টি বিদ্যালয়। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়ের কারা পড়াশুনো করত। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরাই ওইসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেত।

এদের অভিজাত বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশের কোনও সুযোগ নেই। পাঠকের অবগতির জন্য এবার নজর দেওয়া যাক মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে শিক্ষা দপ্তর জেলাওয়ারি বন্ধ করে দেওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তার দিকে। ৩০ জনের কম ছাত্রছাত্রী আছে আলিপুরদুয়ারে ১৬২টি, বাঁকুড়ায় ৮৮৬টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ৫৫০টি, বীরভূমে ৩২১টি, কোচবিহারে ১৪৮টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২২৩টি, দার্জিলিংয়ে ৫১৯টি, হুগলিতে ৪১৪টি, হাওড়ায় ২৭৮টি, জলপাইগুড়িতে ২১৮টি, ঝাড়গ্রামে ৪৭৯টি, কালিম্পংয়ে ২১৫টি, মালদহে ১৩৭টি, মুর্শিদাবাদে ২২৭টি, নদিয়াতে ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এছাড়া আছে পূর্ব বর্ধমানে ৩৩৮টি। অনেকে হয়তো বলবেন, শিক্ষার সমস্যাটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমস্যাটা জাতীয় স্তরের। সরকারি বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের বেসরকারি বিদ্যালয়ে চলে যাওয়াটা ঘটে চলেছে গোটা দেশ জুড়েই। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের পরিসংখ্যানই বলছে, ২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০-তে দেশে ৫১,১০৮টি সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। ওই একই সময়ে বেসরকারি বিদ্যালয় বেড়েছে ১১,৭৩৯টি। ২০১৬-র পর থেকেই নীতি আয়োগের পরামর্শ হল, কম ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়গুলিকে অন্য

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্তকরণ।

কিন্তু আমাদের 'এগিয়ে থাকা' রাজ্য কেন জাতীয় স্তরের দোহাই দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা লুকোবে? এর কি কোনও যথার্থ উত্তর আছে আমাদের বর্তমান নাট্যকার-নির্দেশক শিক্ষামন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীসভার প্রধান মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে?

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র আকাশচুম্বি দুর্নীতি থেকে কী মুক্ত হবে?

সনাতন মুর্মু

পশ্চিম বাংলায় অষ্টাদশ সংসদীয় নির্বাচনে বিরোধীদের এবং বর্তমান সরকারের কাছে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতি ছিল অন্যতম প্রধান বিষয় (ইসু)। দীর্ঘদিন ধরে মামলার জেরে (যা কলকাতা হাইকোর্টে হচ্ছিল) ২২ এপ্রিল ২০১৪ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২৫,৭৫৩ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন ও চাকরি হারানো শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সুপ্রিম কোর্টে (সর্বোচ্চ আদালত) আবেদন করলে প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে আপাতত কারও চাকরি যাচ্ছে না। এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে ১৬ জুলাই। স্বভাবতই সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ে চাকরি হারানোরা যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, রাজ্য সরকারও খুশি হয়েছে।

উল্লেখ্য ২০১৬ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলার রায়-এ সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়ে জানিয়েছে সাময়িক ভাবে কারও চাকরি যাচ্ছে না এবং চূড়ান্ত শুনানির (যা ১৬ জুলাই হওয়ার কথা) আগে পর্যন্ত কাউকে বেতন ফেরত দিতে হচ্ছে না, বেআইনি ভাবে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের থেকে যোগ্যদের আলাদা করা যায় কিনা এবং করা গেলেও কিভাবে করা যাবে, তা শীর্ষ আদালত খতিয়ে দেখবে। সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায়ে বলা হয়েছে শেষ বিচারে যাঁরা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের চাকরি খারিজ হবে এবং বেতনও ফেরৎ দিতে হবে। রাজ্য সরকার যে অতিরিক্ত পদ বা 'সুপার নিউমেরারি পোস্ট' তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই ক্যাবিনেটকে হেফাজতে নিয়ে তদন্তের হাইকোর্টের নির্দেশের উপরও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যাবে বলেও রায়ে জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে জে বি পারডিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি যে হয়েছে রাজ্য সরকার বা তার স্বশাসিত সংস্থা এসএসসি অস্বীকার করতে পারছে না। কারণ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আগে তারা বলেছিল ২০১৬-তে এসএসসি-র চাকরি পাওয়া ৫২৫০ জনের বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। সিবিআইকে উদ্ধৃত করে ওই দিন (৭ মে ২০২৪) সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি জানায় ২০১৬ সালে ৮৮৬১ জনের বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। আশ্চর্যের হল সংখ্যা কিভাবে পাল্টে গেল। কলকাতা হাইকোর্ট দিনের পর দিন যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা চেয়েও না পেয়ে ২২ এপ্রিল (২০২৪) ২০১৬ সালে পুরো প্যানেলই বাতিল করে দিয়েছিল। যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকারা চাকরি বাতিলের পর থেকেই কলকাতার শহিদ মিনার চত্বরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ এসএসসি যদি যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা হাইকোর্টে জমা দিতে পারত তাহলে তাঁদের চাকরি খারিজ হতো না এবং সুপ্রিম কোর্টেও যেতে হতো না। এঁদের বেশ কয়েকজন ও এম আর শিট দেখিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। অথচ এসএসসি বলছে ও এম আর শিট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে, জান্তব উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু যোগ্য চাকরি প্রার্থী চাকরি হারিয়ে বিভিন্ন মহলে যে সহানুভূতি পাচ্ছিলেন তা রাজ্য সরকার কাজে লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচারে ঢেউ তুললে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী রাজ্যে প্রচারে এসে যোগ্য চাকরি হারাদের আইনি সহায়তা দেওয়ার কথা বলতেই রাজ্য বিজেপি তড়িঘড়ি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করে সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করে। আসলে রাজ্য বিজেপি বুঝতে না পারলেও তাঁদের দলের সর্বোচ্চ নেতা বুঝেছেন হাইকোর্টের রায় তাদের পক্ষে যাবে না এবং লোকসভা নির্বাচনে দল পশ্চিমবঙ্গে ফায়দা তুলতে পারবে না। সেই কারণেই আইনি সহায়তার কথা মোদিজির মুখে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষায় অরাজকতা চলছে প্রায় তিন দশক জুড়ে। তাসত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগে আকাশচুম্বি দুর্নীতি এই রাজ্যে গত এক দশকে যা ঘটল অতীতে কখনও তা দেখা যায় নি। গত ২২ এপ্রিল মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে কলকাতা হাইকোর্ট-এর দুই বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিসন বেঞ্চ ২০১৬ সালের রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় হওয়া ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে দেন। ওইদিনের রায়ে বিচারপতিদ্বয় জানিয়েছিলেন লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এস এস সি-কে (স্কুল সার্ভিস কমিশন)। বেআইনিভাবে নিযুক্তদের বেতনের টাকা ফেরত দিতে হবে চার সপ্তাহের মধ্যে, ১২ শতাংশ সুদ-সহ। অনাদায়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক। তদন্ত চলবে, সিবিআই যেমন চালাচ্ছে

কিন্তু তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট তাদের জমা দিতে হবে। কারা অতিরিক্ত পদ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে তদন্ত হবে। প্রয়োজনে তাঁদের হেফাজতে সিবিআই নেবে, প্রয়োজনে বেআইনিভাবে নিযুক্তদেরও হেফাজতে নেওয়া যাবে। এসএসসি-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে সমস্ত ওএমআর শিট। মানবিক কারণে সোমা দাসকে ছাড় (তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত)। সুতরাং আন্দোলনরত মেরিট লিস্টে নাম থাকা প্রত্যাশীদেরও চাকরির কোনও সুযোগ থাকল না।

এই বঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছিল তা জানা। দেখা যাক কোন কোন মন্ত্রী আমলা ও তৃণমূলের দলের

প্রভাবশালীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে জেলে আছেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হয়েছেন ২৩ জুলাই ২০২২ সালে, প্রায় দু'বছর জেলে কাটাচ্ছেন। প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দুটি ফ্ল্যাট থেকে। এত টাকা উদ্ধারের পর অর্পিতাও জেলে কাটাচ্ছেন। এসএসসি-র প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিংহ শিক্ষাকর্মী গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি মামলায় দুর্নীতির বিষয়টি সামনে এলে গ্রেফতার হয়ে জেলে বন্দি। রাজ্যের প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতার নিয়োগ বেআইনি। মেয়ে চাকরি খোয়ান এবং পরেশের মন্ত্রীত্বও চলে যায়। এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁরা জেলে কাটাচ্ছেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আপ্তসহায়ক সুকান্ত আচার্য ও প্রাক্তন শিক্ষা সচিবকে সিবিআই কয়েক ঘণ্টা যাবৎ জেরা করে দুর্নীতির হদিশ পাওয়ার চেষ্টা চালায়। এভাবে আমলা-মন্ত্রী-পদাধিকারীরা সিবিআই-এর জেরার মুখে পড়েছেন বা গ্রেফতার হয়ে জেলে বন্দি আছেন।

শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূল দলের কুচো নেতা মায় রাজ্য স্তরের নেতারা যে জড়িত ছিলেন তা কারোর অজানা নয়। প্রাক্তন এসএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (প্রাক্তন তৃণমূল শিক্ষাসেলের আহ্বায়ক বর্তমানে বিজেপি-তে) গণমাধ্যমে ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তা বলেওছেন। জেলায় জেলায় বেকার যুবকেরা প্রাথমিকে, উচ্চপ্রাথমিকে কিংবা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে চাকরি পাওয়ার জন্য স্থানীয় সরকারি দলের নেতানেত্রীদের টাকা দিয়েও চাকরি পান নি এমন অভিযোগও ভুরি ভুরি। টাকা নিয়ে টেট পরীক্ষা বা এস এস সি-তে অনুত্তীর্ণ হয়েও চাকরি পেয়েছেন সেই অভিযোগ তো আছেই। এসএসসিও তা অস্বীকার করছে ন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্যও গ্রেফতার হয়েছেন দুর্নীতির অভিযোগে। আমলা-নেতা-মন্ত্রী-শিক্ষাবিদ এই দুর্নীতির চক্রে সরাসরি যুক্ত। তাঁদের অনেককেই সিবিআই হেফাজতে নিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিংবা জেলে ভরেছে। বিগত দু'বছর ধরে এই রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি যেমন একের পর এক উন্মোচিত হয়েছে একইসঙ্গে শিক্ষায় নিয়োগের সব পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

এসএসসি-র সুপারিশ ছাপিয়েও যে নিয়োগ হয়েছিল তা এসএসসি-ই হাইকোর্টে জানিয়েছে। সাড়ে তিন মাস ধরে সওয়াল-জবাবের পর এসএসসি দুর্নীতি মামলার শুনানি শেষ হয়েছিল ২০ মার্চ ২০২৪-এ। সেই সময়ই আইনজীবীদের ব্যাখ্যা ছিল রায়দান না হলেও বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণে পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়া হয় বাতিল করতে হবে বা পুরো প্রক্রিয়ার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এ নিয়ে মামলার শুনানিতে নিজের পর্যবেক্ষণে উপরের বক্তব্য জানিয়েছিলেন। এই মন্তব্য করার পিছনে ছিল এসএসসি-র দেওয়া তালিকা। দেখা যাচ্ছে যা সুপারিশ করা হয়েছে নিয়োগপত্র তার চেয়ে বেশি হয়েছে। অর্থাৎ সুপারিশ ছাপিয়ে নিয়োগ হয়েছে। তালিকাটি উল্লেখ করলেই যে কেউ তা বুঝে নিতে পারবেন।

সুপারিশ ছাপিয়ে নিয়োগ

নবম-দশমের শিক্ষক	**গ্রুপ-সি শিক্ষা কর্মী**
সুপারিশ ১১,৪২৫	সুপারিশ ২,০৬৭
নিয়োগপত্র ১২,৯৬৪	নিয়োগপত্র ২,৪৮৩
অতিরিক্ত নিয়োগ ১,৫৩৯	অতিরিক্ত নিয়োগ ৪১৬
একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক	**গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মী**
সুপারিশ ৫,৫৫৭	সুপারিশ ৩,৮৮১
নিয়োগপত্র ৫,৭৫৬	নিয়োগপত্র ৪,৫৫০
অতিরিক্ত নিয়োগ ১৯৯	অতিরিক্ত নিয়োগ ৬৬৯
সুপারিশঃ এসএসসি-র নিয়োগপত্র পর্ষদের	তথ্যসূত্রঃ এস এস সি

এসএসসি-র এই রিপোর্টে জানা যাচ্ছে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক পদে ১৫৩৯ জন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকপদে ১৯৯৯

জন, গ্রুপ-সি পদে ৪১৬ জন এবং গ্রুপ-ডি পদে ৬৬৯ জনকে অতিরিক্ত নিয়োগ করা হয়েছে। বিচারপতি বসাক ও বিচারপতি রশিদি'র স্থগিত রায়দান (২০ মার্চ শুনানি শেষ হয়েছিল) শেষপর্যন্ত ২২ এপ্রিল ২০২৪-এ দেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি এই সরকারই একমাত্র করেছে বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে তৃণমূল সরকারের ১৩ বছর শাসনকালে যে পরিমাণ দুর্নীতি ঘটেছে তা আগের কোনও জমানার সঙ্গে তুলনায় আসে না, অতীতে অন্তত কংগ্রেস বা বাম জমানার দিকে আঙুল তুলে কেউ বলতে পারবে না শিক্ষাক্ষেত্রে এত বিশাল মাপের দুর্নীতি ঘটেছে। স্বজনপোষণ ও দলের কর্মীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বামেরা সমান দোষে দুষ্ট। যখন টেট বা এসএসসি ছিল না সেই সময় স্থানীয় কমিটি (লোকাল কমিটি) বা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ইন্টারভিউ-এ শীর্ষস্থান দখল করা প্রত্যাশীর কাছেও টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে। এমন অভিযোগ বাম জমানাতেও অপ্রতুল ছিল না। এমনও দেখা গিয়েছে ইন্টারভিউ-এ শীর্ষস্থান দখলকারী প্রত্যাশীকে টপকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে বেছে নেওয়া হয়েছে তিনি দলীয় নেতার আত্মজ হওয়ার কারণে বা শীর্ষস্থানাধিকারী টাকা দিতে না পারায়। তবে সেসব ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ ৫০ হাজার থেকে শুরু করে দেড় লক্ষ টাকায় ফায়সালা হয়ে যেত। এরকমও দেখা গিয়েছে একজন প্রত্যাশী—ধরা যাক লাইব্রেরি সায়েন্সে চাকরির জন্য তিন বা চার জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে টপার হয়েছেন। প্রতিক্ষেত্রে তাঁকে দেড় থেকে তিন লক্ষ টাকা ডোনেশন চাওয়া হয়েছে। সে দিতে না পারায় পরের জনকে (যে দিতে পেরেছে) বেছে নেওয়া হয়েছে। আর কংগ্রেস আমলে প্রত্যাশীদের কাছ থেকে সরাসরি টাকা ডোনেশন চেয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাম আমলে পার্টি ক্যাডার বা সমর্থক না হলে বা নেতার আত্মজ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি জুটত না। যে কারণে সেই সময় বলা হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়নের কথা। বাম জমানার শেষ-পর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ভাল মাত্রায় গেড়ে বসলেও তৃণমূল জমানায় দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এবং এর জন্য প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর শাকরেদরা সবচেয়ে বেশি দায়ী হলেও সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ধোয়া তুলসী পাতা, একথা কেউই বিশ্বাস করবে না। কারণ সমাজে অভিযোগ আছে সব দুর্নীতির টাকাই সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের কথাই বলা হচ্ছে।

দুর্নীতির পঙ্কে তৃণমূল দলটা যেভাবে নিমজ্জিত হয়েছে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় আছে বলে মনে হয় না। শুধু তাই নয় ধরা যাক তৃণমূলের ক্ষমতা থেকে অপসারণ ঘটল তারপরেও কি শিক্ষাক্ষেত্র দুর্নীতি মুক্ত হয়ে যাবে? যে অবশেষ থেকে যাবে তার রেশ তো থেকেই যাবে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকার সময় ১৯৯৮ সাল থেকে নিয়মিত এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে এবং শিক্ষিত বেকাররা নিয়মিত চাকরি পেয়েছেন। তৃণমূলের ১৩ বছরের রাজত্বে দু'বার এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। (তাও আবার প্রথমবার বাম জমানার শেষ লগ্নের বিজ্ঞপ্তিতে ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় এসে সেই পরীক্ষা নেয়, দ্বিতীয়বার ২০১৬ সালে) বামফ্রন্ট পারলে তৃণমূল পারবে না কেন? না—তৃণমূল পারে নি। শিক্ষিত যুবকরা এই জমানায় বঞ্চিতই থেকেছে। তাই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সংখ্যা কিন্তু কমছে। তাছাড়া গেরুয়া প্রভাবাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নয়া শিক্ষা নীতি ২০২২ সাল থেকে চালু করায় আমজনতার শিক্ষাঙ্গনে পৌঁছানোর রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। আম জনতা বলতে মেহনতী মানুষ, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তরা। তার উপর শিক্ষাক্ষেত্রে আকাশচুম্বি দুর্নীতিও সাধারণ মানুষকে শিক্ষা বিমুখ করে তুলছে এবং তুলবে। লেখাটি যখন প্রেসে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে। বহু মেহনত করে মেধার জোরে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে মেরিট লিস্টে নাম তুলে যাঁরা নিয়োগপত্র পেয়ে ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করছেন আশা করা যায় তাঁরা মানবিক কারণেই চাকরি ফিরে পেয়ে শিক্ষা নামক মহৎ পেশায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করবেন। আর যারা যোগ্যতা মানে না পৌঁছেও শুধু টাকার জোরে চাকরি পেয়েছেন তাঁরা বরখাস্ত হবেন এমনটাই চাইছেন সৎ ও স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী পশ্চিমবঙ্গবাসী। দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠুক এটিই চান আমজনতা।

০১.০৬.২০২৪

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত সম্পূর্ণ করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে এবং আন্দোলনকারী যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ করতে হবে।

ল্যাণ্ড মাইন সরিয়ে আঙুর বাগিচা

ক্যানসার সার্ভিক্স বিজয়িনী জার্মান-মার্কিন সমাজসেবী হেউডি কুন বা মাম্মা হেইডি 'রুটস অফ পিস' সংস্থার কর্ণধার। ১৯৯৭-তে এই সংস্থা কাজ শুরু করে কম্বোডিয়া থেকে আফগানিস্তান, ক্রোয়েশিয়া সহ বিভিন্ন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে এক লক্ষ মাইন সরিয়ে সেখানে জাফরানের ক্ষেত, আঙুর বাগিচা, ফলের বাগান, কৃষি ক্ষেত গড়ে ১০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। পেয়েছেন আন্তর্জাতিক খাদ্য পুরস্কার। তালিবান নেতৃত্বকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বহু আফগান নারীকে বাগিচা চাষে অন্তর্ভূক্ত ও পুনর্বাসিত করেছেন। তাঁর লক্ষ্য বিশ্বের ৬০টি দেশ থেকে ছ'কোটি মাইন সরিয়ে ফসল ফলানো। আত্মজীবনী লিখেছেন 'ব্রেকিং গ্রাউণ্ড'।

উন্নয়ন প্রসঙ্গে

জরুরি জাতীয়তাবাদের নতুন আখ্যান নির্মাণ

অনুপম কাঞ্জিলাল

দিকে দিকে এখন ‘বিকশিত ভারতে’র বিজ্ঞাপন। পরিসংখ্যান জানান দিচ্ছে এদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য ইংরেজ শাসনকালকেও টেক্কা দিয়েছে, গোটা দেশ জুড়ে অপুষ্টির মহাকাব্য রচিত হয়ে চলেছে, নিম্নবিত্তের একটা বড় অংশ ক্রমেই দারিদ্র্য-সীমার নিচে

চলে যাচ্ছে, ক্ষুধার সূচকে ভারত সামনের সারিতে, তবু ‘বিকশিত ভারতে’র বিজ্ঞাপনি বিকাশ থেমে থাকছে না। এমনটাই তো হওয়ার কথা, গোটা বিশ্ব জুড়েই তো এই বার্তা রটে গেছে, বিজ্ঞাপনের মোহই বাজারের নিয়ন্ত্রক। আর বাজার মানুষের জীবনযাপনের নিয়ন্ত্রক। জীবনযাপনের নিয়ন্ত্রক যখন বাজার তখন বাজারের পরিভাষাতেই তো চিনতে হবে জাতীয়তাবাদকে—দেশপ্রেমকে, এ আর বড় কথা কী। আর সেই জন্যই তো বিজেপি সরকারের সাফল্যের প্রচারে ‘বিকশিত ভারতে’র স্লোগান। খুব ভাবনা-চিন্তা করেই ‘বিকশিত ভারত’ শব্দ যুগল ব্যবহার করা হয়েছে। একটু ভাবলেই বোঝা যায় এই শব্দ-যুগলের অনুষঙ্গে অনায়াসেই ছোঁয়া যায় দেশপ্রেম-জাতীয়তাবাদকেও। অগণিত ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেবে, গত কয়েক বছরে জাতীয়তাবাদের নামেই দেশ জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে, এক ধরনের বিদ্বেষের প্রাচীর। দেশের মধ্যেই ‘অপর’ নির্মাণের প্রয়াস চলেছে পরিকল্পিতভাবে। ২০১৯-এর নির্বাচনী বৈতরণী যে বিজেপি জাতীয়তাবাদী ধ্বজা তুলেই পার হয়েছিল, তা এখন অনেকের কাছেই পরিষ্কার। পুলওয়ামার ঘটনার জাতীয়তাবাদী অভিমুখ যে কত ধূর্ত কৌশলে নির্মাণ করা হয়েছিল, তা তো জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপালের কথা থেকেই পরিষ্কার।

জাতীয়তাবাদকে আমরা যেভাবে চিনেছি, বুঝেছি, তাতে জাতীয়তাবাদের একটা ‘শত্রু’-সবসময় দরকার হয়। অপরের বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের ধারণা দৃঢ় হয়! চোখ-কান-খোলা রেখে আমরা যদি আমাদের চারপাশটাতে একটু পর্যালোচনা করি, বুঝতে অসুবিধা হবে না সর্বত্রই একধরনের বিরুদ্ধতাকে আশ্রয় করেই, নির্মাণ হয় জাতীয় নিজস্বতা। শুধুমাত্র দেশীয় জাতীয়তাবাদই নয়, দেশের মধ্যেকার বিবিধ খণ্ডিত জাতীয়তাবাদও এক একটা ‘অপর’ তৈরি করেই নিজস্ব দাবিকে স্বাভাবিক বলে চেনাতে চায়। এদেশের বাস্তবতা বলে, অসমে বাঙালি অপর, মহারাষ্ট্রে অ-মারাঠি অপর, আবার গোটা দক্ষিণ ভারত জুড়ে হিন্দিভাষীরা অপর। এই অপরের প্রতি বিরুদ্ধতার মানসিকতাই যখন খণ্ডিত জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক ভিত্ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তখন বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই বিরুদ্ধতার মানসিকতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়েই নির্মাণ করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে এদেশের জাতীয়তাবাদী ভাবনার নির্মাণ যে মুসলিম বিদ্বেষ ও পাকিস্তানকে নিকেশ করা অভিমুখ ধরেই এগিয়েছে, তা বুঝতে খুব বেশি পণ্ডিত হওয়ারও দরকার পড়ে না,

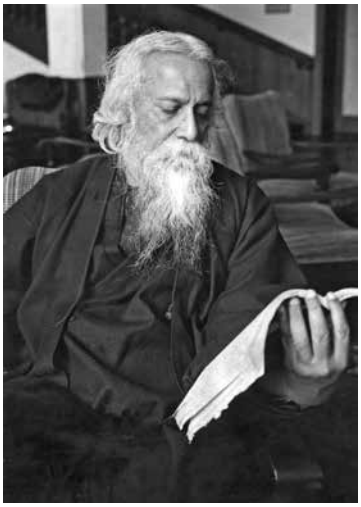

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান দিয়েই ধরা যায়। সেই কারণেই তো পুলওয়ামার ঘটনার পর পরই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গেছিল, মশলাদার হিন্দি ছবির-সংলাপের হুবহু অনুকরণ, ‘ঘর পর ঘুসকে মারুঙ্গা।’ অন্যদেশ ও জাতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া, নিকেশ করে দেওয়ার মধ্যেই জাতীয়তাবাদের নির্যাস খোঁজার উগ্র চাহিদা অতঃপর গোটা দেশেই ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস ক্লান্তিহীন ভাবেই জারি রেখেছেন এদেশের শাসক সম্প্রদায়। সেই প্রয়াসের ধারাবাহিকতার জেরেই রাম মন্দির নির্মাণের উত্তেজনা, জয় শ্রীরাম স্লোগানকে জাতীয়তাবাদের পরিপূরক বলে চেনানোর চেষ্টা।

সমস্যা হচ্ছে এই উগ্র (হিন্দুত্ববাদী) সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রতিহত করার ভাবনা, কারোর মধ্যেই নেই, এই উগ্র জাতীয়তাবাদের এগিয়ে চলার পথ তাই একেবারেই নিষ্কণ্টক, অথচ পড়শির সর্বনাশ চাওয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের ভাবনা এড়িয়ে, জাতীয়বাদের একটা অন্য আখ্যান তৈরির প্রয়োজন অনেকদিন আগেই কেউ-কেউ ভেবেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী দেবে বিদ্বেষ ছাড়া জাতীয়তাবাদের নির্মাণ সম্ভব কিনা, তা নিয়ে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সুভাষচন্দ্র বসু সহ অনেকেই। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা

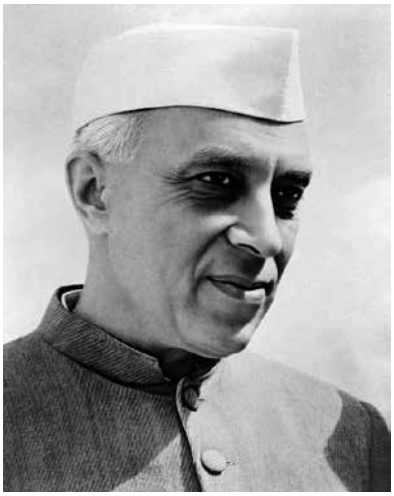

পর্যালোচনা করলে, বোঝা যায় ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী একটা ধারা যখন দ্বন্দ্বভিত্তিক পরিচিতি ধরে এগিয়ে চলতে চাইছিল, অপর একটি ধারা তখন সর্বজনীন জাতীয়তার এক ভিন্নমুখি আখ্যান নির্মাণের পরিসর তৈরিতে সচেষ্ট ছিল। স্বাধীন ভারতে যে ধারার উত্তরাধিকার বহন করতে সচেষ্ট ছিলেন জহরলাল নেহেরু। পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে থেকেও যিনি বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র নেতি-নির্ভর ধারণায় ভর করে দেশ চলতে পারে না। তিনি অনুধাবন করেছিলেন ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি সম্মিলিত বিদ্বেষ-ঘৃণা থেকে যে জাতীয়তাবাদী ভাবনার নির্মাণ, স্বাধীন দেশে সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রসূত জাতীয়তাবাদ সমান বৈধতা পেতে পারে না। এই ভাবনা থেকেই নেহেরু জাতীয়তাবাদের এক ভিন্ন মুখি নির্মাণ চেয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রনীতির রূপায়ণে তাই তিনি জোর দিয়েছিলেন উদারপন্থী ঐতিহ্যকে কেন্দ্রে রেখে উন্নয়ন ভিত্তিক জাতির পরিচিতি নির্মাণের উপর। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নয়, নেহেরুর জাতীয়তাবাদ দেশকে বাঁধতে চেয়েছিল উন্নয়নের সূত্রে। জাতীয়বাদকে এভাবে নির্মাণ করার চেষ্টা, পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে আনকোরা তা বলা যাবে না। কিন্তু এদেশের প্রেক্ষিতে বিদ্বেষ-ঘৃণা এড়িয়ে জাতীয়তাবাদ ও দেশের উন্নয়নকে সংশ্লিষ্ট করে ভাবতে পারার মধ্যে যে মস্ত বড় একটা রাজনৈতিক কল্পনা শক্তি ছিল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মনে রাখতে হবে, সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে তখন আরও অনেক পরিচিতির দ্বন্দ্ব ক্রমশ মাথাচাড়া দেওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল। হিন্দু-মুসলমানই শুধুমাত্র নয়, নানা জাতি ও ভাষার দ্বন্দ্বও রাষ্ট্র নেতাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে চাইছিল। এরকম একটা সময় উন্নয়ন মুখি জাতীয়তাবাদী ভাবনা, সেই সব দ্বন্দ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সহায়ক হয়েছিল। এখানেই নেহেরুর ভাবনার অভিনবত্বও বটে। এক কথায় বললে বলতে হয়, জহরলাল নেহেরুর জাতীয়তাবাদী ধারণা দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অস্ত্রে সব সমস্যার মোকাবিলা করার ভাবনার জমিতে। ইতিহাসকে সাক্ষী মানলে বলতেই হবে, শুধু মাত্র উন্নয়নের ভাষ্যে ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার পরিচিতির দ্বন্দ্ব ঢাকা পড়ে না, কিন্তু ইতিহাস আবার একই সঙ্গে এটাও দেখায় যে উন্নয়ন ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আখ্যানটিকে কথায় ও কাজে ঠিকঠাক প্রয়োগ করতে পারলে অন্য পরিচিতির দ্বন্দ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

আজ যখন পড়শি রাষ্ট্র পাকিস্তানের সর্বনাশ কামনাকেই জাতীয়তাবাদের একমাত্র ভিত্তি করে তোলার আয়োজন সম্পূর্ণ, যখন রাম মন্দির ও জয় শ্রীরাম শ্লোগানকে জাতীয়তাবাদের পরিপূরক বলে চেনানোর আয়োজন চলছে জোর কদমে, তখন বার বার মনে হয়, দেশ জুড়ে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, আর বিজ্ঞান গবেষণাগাগুলিকেই যদি উপাসনালয় বলে চেনানোর অভ্যাস তৈরি করা যেত, যদি দেশের দারিদ্র্য বৈষম্য বেকারত্বকেই দেশপ্রেমের উল্টোমুখের গল্প বলে চিনতে শিখতাম আমরা, তাহলেই এই সংকীর্ণ উগ্র (হিন্দু) জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করতে পারার একটা অবলম্বন পাওয়া যেত। নদী-বাঁধকেই আধুনিক ভারতের মন্দির বলে চেনানোর

অভ্যাস তৈরি করতে পারলে, রাম মন্দিরের দাবিকে হয়তো জাতীয় মঞ্চ থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হত।

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বলেই, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ডান-বাম নির্বিশেষে প্রগতিশীল উদার বিজ্ঞানমনস্ক মানুষজন সেই জাতীয়বাদী ভাবনার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন উন্নয়নমুখি

জাতীয়তাবাদ বিদ্বেষের জমি তৈরি করবে না, এই কারণেই স্বাধীনতার পরের কয়েক দশক তাঁদের ভারতীয়ত্বের পরিচিতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল এই উন্নয়ন ভিত্তিক জাতীয়তা। কিন্তু প্রশ্ন হল, তার পরে কী এমন ঘটল, যে এদেশে উন্নয়নমুখি জাতীয়তাবাদী ভাবনা, কমতে কমতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। এক সময়কার সেই প্রগতিবাদী উদার বিজ্ঞানমনস্ক উন্নয়নমুখি জাতীয়তাবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী মানুষজনরাই বা কেন উন্নয়নমুখি জাতীয়তাবাদী ভাবনায় ছেদ টেনে 'জাতিহীন রাষ্ট্রের পরিচিতির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে থাকলেন? আজ যখন 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান কেই জাতীয়তাবাদের নির্যাস বলে চেনানোর তুমুল আয়োজন, তখন উদারপন্থী প্রগতিশীল মানুষজনরা সেই আয়োজনের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করতে চাইবেনই, এটা জানা, কিন্তু যেটা জানতে হবে এই প্রেক্ষিতটা তৈরি হল কীভাবে? কীভাবে সেই ১৯৪৭ থেকে বহু মেহনতে অর্জিত এদেশের উন্নয়নভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে দেশ জুড়ে জাঁকিয়ে বসল হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ?

এর উত্তর কিছুটা হলেও মিলবে, উদার অর্থনীতির আবাহনে। এখনও অনেকেই হয়তো মনে করতে পারবেন, সময়টা ১৯৯১ জুলাই মাস, উদার অর্থনীতির আবাহনে, হাত-পা ছড়াতে শুরু করল বাজার আর বিপরীতে নাগরিকের প্রতি উন্নয়নী দায় থেকে হাত-পা গুটিয়ে নিতে শুরু করলো রাষ্ট্র। বাজার রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরিসর ছোট করে দেওয়ার আগে, দেশের সকল মানুষের উন্নয়নের সঙ্গে স্বীকৃত ছিল রাষ্ট্রীয় যোগ। আমাদের এটা মানতেই হবে রাষ্ট্রের কাছে গরিব ও বড়লোক, সাধারণ ও এলিট শ্রেণির প্রত্যাশা নিশ্চয়ই এক ছিল না, প্রাপ্তিও ভিন্নই ছিল, কিন্তু সকল পক্ষ তাকিয়ে থাকত রাষ্ট্রেরই দিকে, কারণ সকলেই নিজ নিজ উন্নয়ন রাষ্ট্রের কাছ থেকেই বুঝে নিত। বাজার এসে এই খেলাটাকেই একেবারে পাল্টে দেয়। শিক্ষিত শহুরে, আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয়রা বুঝে যায়, তাদের ভাল থাকাটা নিশ্চিত করতে বাজারই যথেষ্ট, রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কে বাঁধা থাকতে বাধ্য হল শুধুমাত্র গরিব-প্রান্তিক মানুষজন। এলিট ভারতীয়দের সঙ্গে রাষ্ট্রের উন্নয়নী সম্পর্ক কমতে কমতে এক সময় উধাও, আর এই অবকাশেই উন্নয়ন ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবনার পায়ের নীচের মাটি আলগা হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে গেল।

জহরলাল নেহেরুর আমলে যে হিন্দুত্ববাদ গা ঢাকা দিকে বাধ্য হয়েছিল, ভারতে আবার তার পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ উঠলেই অনেকে বলেন, ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী রামলালার দরজা খুলে দিয়েই, সেই কাজটা করেছেন। কেউ কেউ আবার ১৯৯২-তে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার উল্লেখ করেন, কিন্তু অনুক্ত থেকে যায় ১৯৯১-তে সেই মুক্ত বাজারের আবাহন প্রসঙ্গটি। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ মানবেন ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের পশ্চাতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ভূমিকা অসীম। এক ধাক্কায় না হলেও, বাজার একটু একটু করে একটা বড় অংশের ভারতীয় নাগরিককে সরিয়ে নিয়ে গেছে উন্নয়ন ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবনার আখ্যান থেকে আর উদার প্রগতিপন্থি অংশের ভারতীয়রা উন্নয়নভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবনা থেকে সরে গিয়ে বাজারের কোলে আশ্রয় নিতেই, সেই ফাঁক পূরণ করতে এগিয়ে এল ছাতি-চাপড়ানো নাগপুরি দর্শন তাদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাষ্য নিয়ে। জাতীয়তাবাদ বললে, এখন তাই সর্বজনীন উন্নয়নের কথা কারোর মনেও পড়ে না।

গৈরিকবাহিনীর এই উগ্র জাতীয়বাদের খপ্পর থেকে ভারতীয়দের উদ্ধার করতে চাইলে, ফিরতেই হবে জাতীয়তাবাদের উন্নয়নভিত্তিক ভাষ্যে, নির্মাণ করতেই হবে জাতীয়তাবাদের নতুন আখ্যান। শুরু করেছিলেন নেহেরু, তাকে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অনিবার্য ভাবেই এ প্রশ্ন আসবে বাজারের দিকে যাঁরা চলে গেছে, বাজার যাঁদের দখল নিয়েছে, তাঁদের কি আর ফেরানো যাবে, রাষ্ট্রের উন্নয়নমুখি জাতীয়তাবাদের বৃত্তে? উত্তর-না, কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থাকে অর্থনীতির নিজস্ব ব্যাকরণের সেই কথাটা হল এই যে বাজার সার্বিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারে না, কারণ বাজারকে লাভ-ক্ষতির অভিমুখ ধরে চলতে হয়। তাই পরিসংখ্যান নিয়ে একটু নাড়া-চড়া করলেই বোঝা যাবে, এদেশে বাজারের উন্নয়নমুখি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে দাঁড়ালে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বর ফিঁকে হতে বাধ্য। এঁদের বোধের জাগরণের মধ্যস্থতাতেই হতে পারে জাতীয়তাবাদের নতুন নির্মাণ। পরিসংখ্যান বলছে, গৈরিক বাহিনীর শাসনকালে অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে কর্মসংস্থান হীনতার পরিমান সর্বাধিক, আর্থিক বৈষম্য ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন জালকেও টেক্কা দিয়েছে, এগুলিকে নিছক পরিসংখ্যান না ভেবে যদি দেশের সঙ্গে শত্রুতা বলে ভাবা যায়, এবং সেই ভাবনাটকে যদি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া যায়, কৃষকের আয়বৃদ্ধি না হওয়া, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় চূড়ান্ত অবহেলাকেই যদি জাতীয়তাবাদ ও দেশ প্রেমের শত্রু বলে চেনানোর অভ্যাস শুরু করা যায়, তাহলেই একমাত্র কয়েক দশক আগে উন্নয়ন মুখি যে জাতীয়তাবাদী ভাবনা থেকে এদেশের মানুষ সরে এসেছিলেন তাঁরা আবার সেই উন্নয়ন ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবনার কাছে ফিরে যেতে প্রেরণা পেতে পারেন। তখনই হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ ভাবনার পায়ের নীচের মাটি আল্‌গা হতে পারে।

দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকেই যদি জাতীয় পরিচিতি হিসেবে তুলে ধরার অভ্যাস করা যায়, যদি সেই অভ্যাসের পরিসর বাড়িয়ে, বহুজনকে সেই অভ্যাসের বৃত্তে টেনে আনা যায়, তাহলেই একমাত্র হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ চাপে পড়বে। দেশকে ভাল রাখার মানে যে পড়শি দেশের সর্বনাশের ভাবনায় মগ্ন থাকা নয়, বরং দেশের আনাচে-কানাচে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া, শুধু কথার নয়, কাজেও দেশের মানুষকে ভাল রাখাটাই যে সত্যিকারের দেশপ্রেমের প্রতিফলন, এই অসময়ে সেই কথাটাই জোর গলায় বলাটা খুব জরুরি।

গত লোকসভা নির্বাচনে অযোধ্যার রামমন্দিরের কেন্দ্র ফয়জাবাদ এবং পারিপার্শ্বিক বস্তি, আম্বেদকরনগর ও বারাবাঁকিতে বিজেপি প্রার্থীরা পরাজিত হন।

বিহারের জাতিসমীক্ষা ২০২৩: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

কুমার রাণা

এক

জালিয়াতির জালিয়াতি যদি কিছু হয়, সেটা জাত নিয়ে। জাত আছে, জাতের নামে বজ্জাতি আছে, জাতে-জাতে বিয়ে আছে, জাত-ঘাঁটা ভোট আছে, জাত নিয়ে খোঁটা আছে। অথচ, জাত নিয়ে কথা বলা মানা, অন্তত সরকারি নথিতে জাতের প্রসঙ্গ আনা চলবে না, তাতে নাকি জাতপাতের ভেদ-বিভেদ তীব্র হবে। তাই, স্বাধীনতার পর, ১৯৫১ সালের জনগণনা থেকে সেই যে জাত-ভিত্তিক পরিচয় মুছে জাতপাতের বিভেদ "মুছে" দেওয়া হল, তারপর আর কিছুতেই তাকে জনগণনায় ফেরত আনা যাচ্ছে না। কিন্তু, মুছে দেওয়া কি অতই সহজ? জাতের নামতো কাগজে বা হৃদয়েই লেখা নেই, লেখা আছে ভারতীয় মস্তিষ্কের কোষে কোষে, সে কি আর ওঠে? অতএব, চলতে থাকল জাত ও নেই-জাতের জালিয়াতি।

বিভিন্ন সময় দাবি উঠেছে, জাতের এই রাখা-ঢাকা কিসসাটা সামনে আনার। বিশেষ, ১৯৮৯ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে জনতা দলের সরকার যখন মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণিগুলোর জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করে, তখন থেকে জনগণনায় জাত সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনটা অনেকের কাছেই খুব জোরালো মনে হতে থাকে। প্রসঙ্গত, ১৯৭৮ সালে মোরারজী দেশাইর প্রধানমন্ত্রীত্বে জনতা পার্টি সরকার বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের সভাপতিত্বে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণিগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তাঁদের বিকাশের পথনির্দেশের জন্য একটি কমিশন গঠন করে। মণ্ডল কমিশন নামে পরিচিত সেই কমিশন তার রিপোর্ট দেয় ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে। ততদিনে, ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭ সালে হারানো প্রধানমন্ত্রী পদটি পুনরুদ্ধার করেছেন। তাঁর সরকার এই রিপোর্ট নিয়ে কোনো রাজনৈতিক উত্তেজনা অনুভব করেনি। সেটা করলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ।

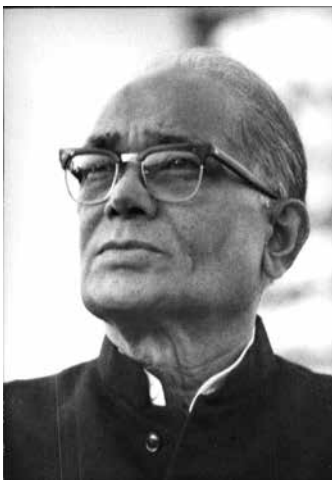

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ

যাই হোক, রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে মণ্ডল কমিশনকে সবচেয়ে বড় যে বাধার মুখোমুখি হতে হল, সেটা তথ্যের অভাব। কমিশনের কাছে জন-গণনার সাম্প্রতিকতম যে জাতভিত্তিক তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিল, সেটা ১৯৩১ সালের। ১৯৪১-এ যুদ্ধের কারণে বিস্তৃত জন-গণনা সম্ভব হয়নি। আর ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারত সরকারের মনে হল জাত-ভিত্তিক তথ্য সমাজে ভেদাভেদ বাড়িয়ে তুলবে! নিরুপায় হয়ে কমিশনকে ১৯৩১ সালের তথ্যের ভিত্তিতেই কাজ চালিয়ে যেতে হল: পঞ্চাশ বছর আগেকার তথ্যকে সংখ্যাগাণিতিক ভাবে হালনাগাদ করার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, ত্রুটিও থাকল প্রচুর, বিশেষত পঞ্জাব, বাংলা ও ত্রিপুরার মতো প্রদেশে যেখানে দেশভাগের কারণে জনবিন্যাসে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে (এ বিষয়ে বিশদ জানতে সন্তোষ রাণার প্রবন্ধ সংগ্রহ (কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৯; দ্রষ্টব্য))। সুতরাং, খুবই যুক্তিযুক্তভাবে অনেকে জাত-ভিত্তিক জনগণনার দাবি জানাতে লাগলেন, আবার, অনেকেই এ-দাবির প্রবল বিরোধিতাও করতে লাগলেন। যাই হোক, ১৯৯১ সালের জন-গণনাতেই জাতভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত বিহারের জাতভিত্তিক জনসমীক্ষার রিপোর্টের মুখবন্ধে বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার জানাচ্ছেন, মধু লিমায়ে, মধু দণ্ডবতে, এবং অন্যান্য অনেক নেতাই জাতভিত্তিক জনগণনার পক্ষপাতী ছিলেন। তা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে ১৯৯১-এর জন-গণনায় জাতভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কাজটি করা যায়নি। ২০০১-এর জনগণনায় এ দাবি গ্রাহ্য হওয়ার প্রশ্নই ছিল না – কেন্দ্রে তখন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি-র সরকার, এবং বিজেপি জাতভিত্তিক জনগণনার প্রবল বিরোধী। ২০১১-তে কাস্ট অ্যান্ড সোসিও-ইকনমিক সেন্সাসে জাতভিত্তিক তথ্য সংগৃহীত হল, কিন্তু কংগ্রেস সরকার সেই তথ্য প্রকাশ করার মতো ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই পুরোপুরি অর্জন করতে পারল না। ২০২১-এ তো জনগণনার কাজটাই স্থগিত করে দেওয়া হল। এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি প্রকাশিত বিহারের জাতভিত্তিক সমীক্ষা ও তা থেকে পাওয়া তথ্যগুলো শুধু বিহারেরই নয়, গোটা ভারতীয় সমাজের গড়ন সম্পর্কেই গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ করছে।

জননায়ক কপুরী ঠাকুর

দুই

বিহারে জাতভিত্তিক সমীক্ষার কাজটাও সহজ ছিল না। বস্তুত, বিহার সরকারকে অগত্যাই এই কাজটি হাতে নিতে হয়, যখন বারংবার দরবার করা সত্ত্বেও ভারত সরকার ২০২১-এর জনগণনায় (যে জনগণনা এখনো হয়নি) জাত-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করে। ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিহার বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারত সরকারের কাছে জাত-ভিত্তিক জনগণনার সুপারিশ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং ওই বছর এপ্রিলে তা ভারত সরকারের গৃহ-মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো হয়। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ২০২০-তে বিহার বিধানসভা ও বিধান পরিষদ পুনরায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেয় ও ভারত সরকারের কাছে পাঠায়, যা আবারও প্রত্যখ্যাত হয়। ২০২১ সালের আগস্টে একই প্রস্তাব নিয়ে বিহারের নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সেই সাক্ষাতকারও বিফল হওয়ায়, ২০২২-এর জুন মাসে বিহার বিধানসভায় প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহমতিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিহার রাজ্যে, দুই ধাপে জাত-ভিত্তিক সমীক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম ধাপে সমস্ত পরিবারের নথিভুক্তি ও দ্বিতীয় ধাপে লোকেদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা হয়। আর্থসামাজিক তথ্যগুলি হল, শিক্ষা, পেশা, আবাস, অস্থায়ী প্রবাস, ল্যাপটপ বা কম্প্যুটরের মালিকানা, মোটর-চালিত গাড়ির মালিকানা ও মাসিক আয়। এই কাজে তথ্য সংগ্রাহক ও তত্ত্বাবধায়ক মিলে প্রায় দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার লোককে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু বাধ সাধে মামলা। প্রথমে অখিলেশ কুমার নামে এক ব্যক্তি এই প্রক্রিয়াকে অবৈধ দাবি করে ২০২৩-এর গোড়ায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। পরে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনও মামলা করে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা আসে হাই কোর্টে, সেখান থেকে আবার সুপ্রিম কোর্টে। যাই হোক, শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট, ভারত সরকারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে, এই সমীক্ষার তথ্য প্রকাশ করার পক্ষে রায় দেয়, যদিও মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়া এখনো বাকি। (এ-সম্পর্কে বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য https://www.scobserver.in/cases/validity-of-the-bihar-caste-census/)

তিন

জাত-ভিত্তিক তথ্যসংগ্রহের বিরোধিতা কেন? এই বিরোধিতা সমাজের বিভিন্ন ক্ষমতাকেন্দ্রে উঁচু জাতের লোকেদের যে একাধিপত্য বজায় আছে তা বজায় রাখা। সেটা বজায় রাখতে গেলে প্রথম কাজটাই হচ্ছে তথ্য গোপন করা। সাধারণ মানুষকে, বিশেষত জাতের সোপানে নিচের দিকে থাকা মানুষদেরকে তাঁদের প্রকৃত অবস্থাটা জানতে না দেওয়া। তাঁরা যে সেটা জানেন না তা নয়, নিপীড়ন সহ্য করাতো তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, কিন্তু ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যখন সামূহিক তথ্যের রূপ পায়, তখন তা নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য সংগঠিত হতে উৎসাহ যোগাতে পারে। ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোতে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করার জন্য আন্দোলনের দিকে এগিয়ে দিতে পারে। বিপরীতে, উঁচু জাতের লোকেরা যে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোতে মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসে আছে, তারা সেটা লুকিয়ে রাখতে চায়। সম্প্রতি প্রকাশিত বিহারের সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য এই জাত-জালিয়াতির দিকটাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে দিয়েছে।

প্রথমত, সমীক্ষায় ২১৫ টি জাতের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই জাতগুলোকে বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচটি বৃহৎ বর্গে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল, পশ্চাৎপদ শ্রেণি, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ শ্রেণি, তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি, এবং সাধারণ। লোকসংখ্যায় এঁদের অংশ যথাক্রমে ২৭.১, ৩৬, ১৯.৭, ১.৭, ও ১৫.৫।

তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ বর্গের লোকেরা সমস্ত ধরনের ক্ষমতার উৎসের দিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। যেমন, বিহারে মোট দু' কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৯৪ লক্ষ (৩৪%) আর্থিক দারিদ্রের মধ্যে টিকে আছে (আর্থিক দারিদ্রের মাপকাঠি হল মাসে ৬,০০০ টাকার কম মাসিক আয়)। এবার, আর্থিক দারিদ্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় তফসিলি জাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীগুলি (উভয় ক্ষেত্রে ৪৩%), তার পরে পশ্চাৎপদ ও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীগুলি (যথাক্রমে ৩৩% ও ৩৪%), আর তারও পরে সাধারণদের অবস্থান (২৫%)। কিন্তু, সরকারি চাকরি বা সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির ব্যাপারে সাধারণ বর্গের অংশীদারি যথাক্রমে ৩.২% ও ৩.৫%, (সামগ্রিক জনসংখ্যার নিরিখে) কিন্তু পশ্চাৎপদ ও তফসিলিদের ভাগ যৎসামান্য। এই ভাগের মধ্যে আবার একটি সূক্ষ্ম কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আছে। যেমন, সাধারণের মধ্যে পড়ে চারটি হিন্দু জাতি (ব্রাহ্মণ, ভূমিহার, রাজপুত ও কায়স্থ), এবং তিনটি মুসলমান জাতি (শেখ, পাঠান ও সৈয়দ)। এবারে, আর্থিক দারিদ্রের বিচারে সাধারণ জাতিগুলোর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু, সরকারি চাকরি ও সংগঠিত ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে বিরাট ফারাক: ক্ষমতার এই কেন্দ্রটিতে মুসলমানদের দেখা প্রায় মেলেই না (এক শতাংশের কম, যেখানে হিন্দু উঁচু জাতিগুলোর ভাগ প্রায় পাঁচ শতাংশ)। উল্টোদিকে দৈহিক শ্রমের কাজে সাধারণ জাতিগুলোর ভাগ সব চেয়ে কম (১৩%)। আবার, এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ভূমিহার, রাজপুত ও কায়স্থদের মধ্যে এই শতাংশ যথাক্রমে ৯, ৭, ৮, ও ৮; কিন্তু শেখ ও পাঠানদের মধ্যে যথাক্রমে ১৯ ও ১৮। পশ্চাৎপদ ও অত্যন্ত পশ্চাৎপদদের মধ্যে দৈহিক শ্রমে নিযুক্তির শতাংশ যথাক্রমে ১৪ ও ১৯ শতাংশ; তফসিলি জাতি ও জনজাতিদেরে মধ্যে যথাক্রমে ১৯ ও ১৩।

একইরকম ভাবে, আমরা শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সাধারণ বর্গের মধ্যে সাক্ষরতার শতাংশ ৮২, সেখানে পশ্চাৎপদ, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, তফসিলি জাতি ও জনজাতির মধ্যে এই শতাংশ যথাক্রমে ৭২, ৬৮, ৫৯, ও ৬৬। আবার, এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ফারাকটি তাৎপর্যপূর্ণ: যেখানে ব্রাহ্মণ, ভূমিহার, রাজপুত, ও কায়স্থদের মধ্যে সাক্ষরতার শতাংশ যথাক্রমে ৮৭, ৮৮, ৮৭, ও ৯২, সেখানে শেখ, পাঠান ও সৈয়দদের মধ্যে এই শতাংশ ৬৭, ৭৪, ও ৮১। একইরকম বিপরীত চিত্র উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, যেখানে বিহারের চার হিন্দু উঁচু জাতির একাধিকার।

এই সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যগুলো খুব বিশদে কিছু জানাচ্ছে না, কিন্তু সমাজে জাতের ভিত্তিতে ক্ষমতার উচ্চাবচ নিয়ে অনুসন্ধান

ও তার সমাধানের দিকে এক পা এগোবার জন্য একটা দরজা খুলে দিয়েছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ইতিমধ্যে পশ্চাৎপদ ও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ শ্রেণিগুলোর জন্য ৪৪ শতাংশ, তফসিলি জাতি ও জনজাতির জন্য যথাক্রমে ১৯ ও ২ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করেছেন। এর সঙ্গে আর্থিকভাবে দুর্বলদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ যোগ করলে দাঁড়াবে ৭৫ শতাংশ। সে-ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর মতো ব্যবস্থা করে সংবিধানের নবম তফশিল অনুযায়ী পরিবর্তন আনতে হবে। জাত-পাতের বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এগোনোর পাশাপাশি, এই দাবি দেশে এককেন্দ্রিকতার প্রবল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে রক্ষা করার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে।

চার

রাজ্যের, বিশেষত বিহারের মতো প্রদেশের, আর্থিক, প্রশাসনিক, এবং প্রয়োগকুশলতার ক্ষমতা খুবই সীমিত। ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক যদি জনগণনার মধ্যে এই কাজটিকে অন্তর্ভুক্ত করত তাহলে, তার বহু দশকের অর্জিত দক্ষতায়, ব্যাপকতর ও গভীরতর তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারত, এবং তা সারা দেশের পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করত। যাই হোক, ভারত সরকারের অপদার্থতা, অথবা তথ্যবিভ্রান্তি সৃষ্টির দুরভিসন্ধি, কিম্বা প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গার নেশাচ্ছন্ন উৎপাতের মধ্যে বিহার সরকারের এই কাজ একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

অবশ্য, এই তারিফ করার পরও কিছু আক্ষেপের কথা না বললেই নয়। যেমন, এখানে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাতে নারী, পুরুষ ও রূপান্তরকামীদের আলাদা আলাদা হিসেব নেওয়া হয়েছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে, ২০১১ সালের তুলনায় নারী-পুরুষ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা) বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; ২০১১ সালে ছিল ৯১৯, আর ২০২৩-এ দাঁড়িয়েছে, ৯৫৩-তে। কিন্তু, সমস্যা হল, নারী-পুরুষ অনুপাতের জাতভিত্তিক হিসেবটা দেওয়া হয়নি। এই হিসেব পেলে উঁচু জাতির লোকেরা তাদের অন্দরমহলটাকেও পরিষ্কার দেখতে পেত। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৩১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, বাংলার জনসমষ্টিতে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর অনুপাত ছিল ৯২৪; কিন্তু ব্রাহ্মণদের এই অনুপাত ছিল মাত্র ৮৪৬, যা অতি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে ব্রাহ্মণ পরিবারগুলোতে মেয়েরা ছিল অবাঞ্ছিত। এর বিপরীতে নমঃশুদ্র ও সাঁওতালদের মধ্যে এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৯৬২ ও ৯৯৮ - যে ধারা এখনো মোটামুটি বহমান, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই ধারার কোনো বা কতটা পরিবর্তন হল, না কি তাঁদের মধ্যে এখনো এই সামাজিক পাপটি লালিত, তা তাঁরা নিজেরাও জানতে পারছে না, অন্যেরাও না।

এই হিসেবটা, এবং তার সঙ্গে শিক্ষা, কর্মনিয়োজন, ইত্যাদি সূচকগুলোর মধ্যে নারী ও পুরুষদের আলাদা আলাদা হিসেবগুলো, খুব সহজেই রাখা যেত। নানা প্রতিকূলতা এবং সময়ের অভাবের কথা মাথায় রেখেও এই খামতিটার উল্লেখ করতেই হয়। অবশ্য, এটাও আশা করা যায় যে, বিহার সরকার সংগৃহীত তথ্যগুলো আরো বিস্তারিত আকারে প্রকাশ করবে।

সবশেষে, এই বাংলার জন্য একটি বার্তা: বাংলায় বারবার দাবি করা হয়, এখানে জাতপাত নেই। ভাল কথা। কিন্তু জাতপাত যে নেই সেটা প্রমাণ করতেও তো প্রত্যক্ষ তথ্যের দরকার, যা কেবল সমীক্ষার মধ্য দিয়েই উঠে আসতে পারে। বিহারের মতো আর্থিক ও প্রয়োগকুশলতার দিক দিয়ে দুর্বল একটি রাজ্য যদি সমীক্ষার কাজটি করে ফেলতে পারে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে এমন একটা কাজ করে ওঠা কি আদৌ কঠিন? পাশাপাশি, ভারত সরকারের ওপর অবিলম্বে জনগণনা করার, এবং তাতে জাত-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখার জন্য চাপ দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়ে একই সঙ্গে সামাজিক ন্যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়তা –এই উভয়বিধ দিকে অবদান রাখতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে এ-দিকে মতি নেই, তার নীরবতা থেকে স্পষ্ট। তাই, তাকে সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জরুরি চাপ সৃষ্টি করার কাজটা লোকসমাজকেই হাতে নিতে হবে।

এক নজরে বিহার: ২০২৩-এর জাতভিত্তিক সমীক্ষা অনুযায়ী

মোট জাতি : ২১৫

মোট লোকসংখ্যা: ১৩,০৭,২৫,৩১০ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ১০,৩৮,০৪,৬৩৭)

নারী-পুরুষ অনুপাত: ৯৫৩ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ৯১৬)

সাক্ষরতার হার: ৭৯ শতাংশ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ৬৪ শতাংশ)

ধর্মীয় বিন্যাস

হিন্দু: ৮১.৯ শতাংশ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ৮২.৭ শতাংশ)

মুসলমান: ১৭.৭ শতাংশ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ১৬.৮ শতাংশ)

অন্যান্য: ০.৪ শতাংশ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ০.৫ শতাংশ)

জাতির সংখ্যা

পশ্চাৎপদ: ৩০

অত্যন্ত পশ্চাৎপদ: ১১২

তফসিলি জাতি: ২২

তফসিলি জনজাতি: ৩২

সাধারণ জাতি: ৭

অন্যান্য: ১২

জাতিগত বিন্যাস

পশ্চাৎপদ শ্রেণি: ২৭.১ শতাংশ

অত্যন্ত পশ্চাৎপদ শ্রেণি: ৩৬ শতাংশ

তফসিলি জাতি: ১৯.৭ শতাংশ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ১৬ শতাংশ)

তফসিলি জনজাতি ১.৭ শতাংশ (২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ১.৩ শতাংশ)

সাধারণ জাতি: ১৫.৫ শতাংশ
সাক্ষরতার হার (শতাংশ)
সাধারণ জাতি: ৮২
পশ্চাৎপদ: ৭২
অত্যন্ত পশ্চাৎপদ: ৬৮
তফসিলি জাতি: ৫৯
তফসিলি জনজাতি: ৬৬

আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের শতাংশ
সাধারণ জাতি: ২৫
পশ্চাৎপদ শ্রেণি: ৩৩
অত্যন্ত পশ্চাৎপদ শ্রেণি: ৩৪
তফসিলি জাতি: ৪৩
তফসিলি জনজাতি: ৪৩
সরকারি ক্ষেত্রে কর্মনিয়োজন (শতাংশ)
সাধারণ জাতি: ৩.২
পশ্চাৎপদ: ১.৮
অত্যন্ত পশ্চাৎপদ: ১.০
তফসিলি জাতি: ১.১
তফসিলি জনজাতি: ১.৪
দৈহিক শ্রমে নিয়োজন (শতাংশ)
সাধারণ জাতি: ১১
পশ্চাৎপদ: ১৪
অত্যন্ত পশ্চাৎপদ: ১৯
তফসিলি জাতি: ১৯
তফসিলি জনজাতি: ১৩

কৃতজ্ঞতা: 'অনীক'

জাতি উপজাতির কোলাজ মণিপুর

সোমনাথ গুহ

আজ উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্য মণিপুর যখন প্রবল জাতি-বিদ্বেষ ও জাতি-সংঘর্ষে নিমজ্জিত তখন প্রশ্ন জাগে মণিপুরি কারা? তাঁদের মধ্যেকার পারস্পরিক এই তীব্র বিদ্বেষের উৎস কোথায় যা তাঁদের এই হানাহানিতে লিপ্ত করেছে? এই লেখা সেই সন্ধানের একটি ছোট প্রয়াস।

মণিপুরে প্রধানত তিনটি সম্প্রদায়ের বাস—মেইতেই (৫৩%), নাগা (২৪%) ও কুকি (১৬%)। মেইতেইদের মধ্যে খ্রিশ্চান, মুসলিম (পাঙ্গাল) ও সানামাহি, তাঁদের আদি ধর্মের মানুষ আছেন। কুকি ও নাগারা মূলত খ্রিশ্চান, যদিও নাগাদের রংমেই গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু হিন্দু আছেন।

কুকি উপজাতি

কুকিদের মধ্যে নানা সাব-ট্রাইব আছে, পাইত, হমার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কুকি, চিন এবং মিজোরা স্বজাতীয় এবং জো নামক উপজাতি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। কুকি নামের উৎস ও তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে নানা মত আছে। বৌদ্ধ পন্ডিত তারানাথের মতে বাংলা ও বার্মার মধ্যে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁরা কো-কি নামে পরিচিত ছিলেন (১)। এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন। এঁদের এলাকার পূর্ব দিকের সীমানা ছিল রাখান, যা বর্তমানে মায়ানমারের রাখিন অঞ্চল বলে পরিচিত। মণিপুর রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত চেইথারোল অনুযায়ী ১৪৯৭ সালে কায়াং বা চিনরা এবং ১৫০৮ সালে খংসাইরা রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। দক্ষিণ মণিপুর পর্বতের নামও ছিল খংসাই হিলস্। এঁরা সবাই কুকি উপজাতির নানা সাব-ট্রাইব। চেইথারোল থেকে আরও জানা যায় যে ১৭৩৪, ১৭৮৬ এবং ১৭৮৯ সালে মণিপুরের রাজা এঁদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ছিলেন। ঔপনিবেশিক সময়ের লেখালেখিতে কুকি শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৭৭ সালে যখন তাঁরা চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের আক্রমণ করে। জেমস জনস্টোন, যিনি ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৬ মণিপুরের রাজনৈতিক এজেন্ট ছিলেন তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ এর মধ্যে মণিপুরে প্রথম কুকিদের কথা শোনা গেছে (২)। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাহেবদের মণিপুরে পদার্পণ ঘটে সুতরাং তার আগে কুকি শব্দটা তাদের শোনার কথাও নয়।

কুকিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ তাঁরা বহিরাগত, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাঁরা নাকি গত একশো বছরে মায়ানমার থেকে মণিপুর ও মিজোরামে প্রবেশ করেছেন। আমাদের দেশের বহু সমস্যার উৎস ব্রিটিশ যুগে নিহিত। কুকিরা নিজেদের দেশকে বলেন জালেঙ্গাম যা উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য, চট্টগ্রাম ও মায়ানমারের

মধ্যে বিস্তৃত। 'কুকি ন্যাশানাল অর্গানাইজেশন' এর নেতা পি এস হাওকিপের মতে ব্রিটিশরা কুকিদের সম্মতি না নিয়ে বলপূর্বক ভারত ও মায়ানমারের মধ্যেকার আন্তর্জাতিক সীমানা টেনে দেয়। পরে দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হয় যার ফলে কুকিরা নানা দেশ

ও রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ব্রিটিশরা কুকিদের ওল্ড কুকি ও নিউ কুকি নামে ভাগ করে (৩)। ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের (১৮২৪-১৮২৬) পরে যারা মণিপুরে এসেছে তাঁরা নিউ কুকি, তার আগে যারা ছিলেন তাঁরা ওল্ড কুকি। তাদের মতে ওল্ড কুকিরা নাগাদের সঙ্গে মিশে যায় এবং নিউ কুকিরা উপজতিদের আসল প্রতিনিধি। এই কারণেই মেইতেইরা দাবি করে কুকিরা রাজ্যের আদি বাসিন্দা নন, তাঁরা সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। মেইতেইরা আরও দাবি করে যে লাগাতার অনুপ্রবেশের ফলে কুকিদের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ১৯০১ এর সেন্সাস অনুযায়ী রাজ্যে কুকিদের সংখ্যা ছিল ৪১২৬২, মোট জনসংখ্যার ১৪.৫%, ২০১১-তে তা হয়ে দাঁড়ায় ১৬.২% (৪৪৮২১৪), মাত্র ১.৭% বৃদ্ধি (৪)! সংখ্যালঘু মানুষদের সম্পর্কে গোয়েবলসিয় কায়দায় এভাবে মিথ্যা ছড়ানোর কৌশল আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। এভাবেই তো রটানো হয় যে মুসলিমদের অনেক বিয়ে এবং অনেক সন্তান এবং তাঁদের সংখ্যা নাকি হু হু করে বাড়ছে!

নাগা উপজাতি

মণিপুরি নাগাদের মধ্যেও সাব-ট্রাইব আছে---জেলিয়াংরোং, তাংখুল, কাবুই, রংমেই ইত্যাদি। জেলিয়াংরোংরা মূলত তামেংলং জেলায় বসবাস করে। বলা হয়ে থাকে তাংখুল নাগাদের সঙ্গে মেইতেইদের রক্তের সম্পর্ক। কথিত আছে ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধের শুরুতে বর্মিদের আক্রমণে দিশাহারা হয়ে মেইতেইরা উপত্যকা ছেড়ে পর্বতে পালায়, তখন তাংখুলরা তাঁদের আশ্রয় দেন। এই কারণে মেইতেইরা তাংখুলদের তাঁদের বড় দাদা হিসাবে গণ্য করে। মণিপুরের রাজা অভিষেকে তাংখুল নাগাদের পোশাক পরেন। বিবাহের রাতে মেইতেই নববধূর শয্যা তাংখুলদের একটি পবিত্র শাল, লেইরাম ফি, দিয়ে ঢাকা থাকে (৫)। ব্রিটিশরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরে বর্মিরা পিছু হটে এবং মেইতেইরা সমতলে ফিরে আসে। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সেই বন্ধন এখনো অটুট রয়েছে। সম্প্রতি মেইতেইরা তাংখুল গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে মিলিত হয়। তাঁরা কুকিদের আলাদা শাসনব্যবস্থার দাবির বিরোধিতা করেন এবং শুধু তাই নয় কুকিদের রিফিউজি, অভিবাসী বলে চিহ্নিত করেন। তাংখুলদের নেতা বলেন ভুয়ো নথি দেখিয়ে নাগরিকত্বর দাবি করা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ। মেইতেইদের মতো মণিপুরি নাগাদের বৃহত্তর অংশ মনে করে তাঁরা রাজ্যের আদি বাসিন্দা, কুকিরা বহিরাগত। প্রসঙ্গত নাগাদের অন্যতম নেতা এবং এনএসসিএন (আই-এম) এর সেক্রেটারি টি মুইভা মণিপুরি নাগা। তাঁর বাড়ি রাজ্যের উখরুল জেলায়। মেইতেইদের সঙ্গে তাংখুলদের উষ্ণ সম্পর্ক আবার নাগাদের মধ্যেকার দ্বন্দকে খুঁচিয়ে তোলে। মুইভা গোষ্ঠীর বিরোধী খাপলাং গোষ্ঠী আওয়াজ তোলে যে মণিপুরে বসবাস করার কারণে সেখানকার নাগারা যথেষ্ট নাগা নয়! এসবই দেখিয়ে দেয় যে মণিপুরের জনবিন্যাস খুবই জটিল এবং জাতি উপজাতির মধ্যেকার সম্পর্ক ও তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক রীতিমতো বিভ্রান্তিকর।

কথিত আছে নাগারা মণিপুরের প্রথম বাসিন্দা। যে কোনো কারণেই হোক তাঁরা সমতল ছেড়ে পার্বত্য এলাকায় বসবাস শুরু করে। মেইতেইরা পরে আসে কিন্তু উপত্যকার ভৌগোলিক সুবিধার কারণে তাঁদের সভ্যতা দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নাগারা কোনও দিনও মণিপুরের রাজার প্রজা ছিলেন না। তাঁদের গ্রামগুলি স্বাধীন ও সার্বভৌম। মণিপুরের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল নানা দ্বন্দ্ব ও সংশয়ে ভরা। রাজারা শান্তির সময় নাগাদের কুলি হিসাবে কাজে লাগাত, ব্রিটিশদের প্ররোচনায় তাঁদের এলাকায় হামলা করতেন। আবার অন্য উপজাতিদের দমন করতে তাঁরা নাগাদের সাহায্য নিতেন।

১৯৯৭ থেকে নাগাদের আন্দোলনকারী গোষ্ঠিগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি চুক্তির সূত্রপাত হয়। ২০১৫ সালে সেই চুক্তি সই হয় কিন্তু তারপর থেকে দীর্ঘ স্থিতাবস্থা চলছে। চুক্তি কার্যকর করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাস্তবে চুক্তিতে কী আছে তাও কেউ জানে না। নাগাদের অন্যতম মূল দাবি 'গ্রেটার নাগাল্যান্ড' বা 'নাগালিম', যা পার্শ্ববর্তি রাজ্যগুলিতে বিস্তৃত। এই দাবি বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর খন্ডিত হবে। আমাদের এই লেখার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হল মণিপুরে যে জেলাগুলি নাগালিমের প্রস্তাবিত অংশ সেগুলি আবার কুকিদেরও প্রস্তাবিত 'হোমল্যান্ড' বা স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল। যেমন চুড়াচাঁদপুর, কাংপোকপি, চান্ডেল কুকিদের স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, এই জেলাগুলির ওপর আবার নাগাদেরও দাবি আছে। তাই মণিপুরি নাগারা কখনোই কুকিদের পৃথক অঞ্চলের দাবি সমর্থন করেন না। শুধুমাত্র এই কারণেই কুকি ও নাগাদের মধ্যে অতীতে ভয়ঙ্কর সব সংঘর্ষ হয়েছে। বর্তমান সংকটে নাগারা নিরপেক্ষ, তাঁরা বারবার সতর্ক করেছেন তাঁদের যেন কোনভাবেই এই সংঘর্ষে জড়ানো না হয়। সরকারও খুব সতর্ক যাতে নাগাদের গায়ে এই গোলমালের আঁচ না লাগে।

মেইতেই

মেইতেইরা 'সালাই তারেত' বা সাতটি জনগোষ্ঠীর সমষ্ঠি। সালাই অর্থ গোষ্ঠী, তারেত অর্থ সাত। অতীতে পনেরো ষোলটি গোষ্ঠী ছিল মণিপুরে। প্রতিটি ক্ল্যানের নিজস্ব ছোট রাজ্য ছিল এবং এঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এই নিরন্তর হানাহানিতে গোষ্ঠীর সংখ্যা কমে সাত হয় এবং একজন সর্দার বাকিদের পরাজিত করে নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন। রাজ্যের নাম হয় কাংলেইপাক। রাজারা কাংলা দুর্গে অধিষ্ঠান করেন তাই মেইতেইরা এই স্থানকে পবিত্র গণ্য করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে মণিপুরের সমাজ রাজনীতিতে যুগান্তকারি পরিবর্তন আসে। তখন রাজা ছিলেন মেইদিঙ্গু পামহেইবা (১৬৯০-১৭৫১)। তিনি রাজ্যে হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন করেন। শোনা যায় এর প্রায় আড়াইশো বছর আগে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিষ্ণু পুজো শুরু হয়েছিল। মেইতেইদের আদি ধর্ম সানামাহি, রাজা সেই ধর্ম বর্জন করার আদেশ দেন। তিনি পুরানো ধরনের জীবনযাপন বাতিল করার আহ্বান জানান। তাঁর নির্দেশে পুরানো সব শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, 'পুয়াস' পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এই পর্বকে বলা হয় 'পুয়া মেইথাবা'। প্রাচীন মণিপুরি লিপি, 'মেইতেই মায়েক' বর্জিত হয়, বাংলা এবং সংস্কৃত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা অনূদিত হয় এবং নট সংকীর্তন, রাসলীলা, গৌরলীলা মেইতেই জীবনের অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে। মেইতেই সমাজও মনুস্মৃতির ধাঁচে পরিবর্তিত হয়। কিছু বিশেষজ্ঞদের মতে 'বহিরাগত' ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে মেইতেইদের সাথে উপজাতিদের সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করা শুরু করে ও অন্যান্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। শোনা যায় উপজাতিদের পয়সা পর্যন্ত তাঁরা জঞ্জাল মনে করতেন এবং তাঁদের হাত থেকে তা নিতে অস্বীকার করতেন। পয়সা মাটিতে রাখতে হতো। আমাদের এখানে ছোঁয়াছুঁয়ির কুৎসিত বাতিকের কথা মনে পড়ে যায়।

গত তিরিশ বছরে মেইতেইদের মধ্যে তাঁদের পুরানো লিপি, ধর্ম ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা তীব্র হয়ে উঠেছে। বাংলা লিপি বর্জন করে 'মেইতেই মায়েক' ব্যবহার জনপ্রিয় হয়েছে। ধর্মের কথা বলতে গেলে, সানামাহি কোনদিনই মেইতেই সমাজ থেকে পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। কিছু মানুষ এখনও ওই প্রাচীন ধর্ম অনুসরণ করেন। আবার বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দু আছেন যাঁদের গৃহদেবতা সানামাহি। এছাড়া মেইতেইদের মধ্যে খ্রিশ্চান আছেন এবং আট শতাংশ মুসলিম আছেন, যাঁদের পাঙ্গাল বলা হয়। প্রসঙ্গত রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে রোমান লিপি ব্যবহার হয়ে থাকে।

কুকিদের বিরুদ্ধে মেইতেইদের অনেক অভিযোগ যার মধ্যে অন্যতম দুটি হল, তাঁরা রাজ্যের আদি বাসিন্দা নন এবং তাঁদের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওপরে এই দুটি অভিযোগ আমরা খন্ডন করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া অভিযোগ হচ্ছে এঁরা ড্রাগ-পাচারি, পপি বা আফিম চাষ করেন, মায়ানমারের লোকদের আশ্রয় দেন এবং এসবের কারণে এঁরা দেশের অখন্ডতা, নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক। প্রথমত মায়ানমারে গৃহযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে কিছু মানুষ মিজোরাম ও মণিপুরের সীমান্ত অঞ্চলে ঢুকে পড়েছেন। মিজোরামের সরকার তাঁদের ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে, মণিপুর সরকারেরও অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত পপি চাষ যথেষ্ট লাভজনক; দরিদ্র মানুষ সে মণিপুরে হোক বা অন্যত্র দু'পয়সা বাড়তি উপার্জনের কারণে গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে পপি চাষ করে থাকেন। মেইতেইদের আশঙ্কা কুকি নাগাদের দাবির কারণে তাঁদের রাজ্য খন্ডিত হতে পারে। 'নাগালিম' এবং কুকিদের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বাস্তবায়িত হলে মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলের প্রায় পুরোটাই কেটে বাদ পড়ে যাবে। মেইতেইরা এর ঘোর বিরোধী। তাঁদের আর একটি প্রধান সমস্যা হল তাঁরা উপত্যকায় আবদ্ধ যা রাজ্যের মোট জমির দশ শতাংশ মাত্র। এই জন্য তাঁরা তফসিলি উপজাতি (এস টি) তালিকাভুক্ত হতে চান যাতে তাঁরা পাহাড় এলাকায় জমি ক্রয় করতে পারেন এবং সংরক্ষণের সুবিধা পেতে পারেন। মণিপুরের রাজবংশ মেইতেই হওয়ার কারণে স্বাধীনতার পরেও মেইতেইরা প্রভূত সুবিধাভোগী। বিধানসভায় তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, মোট ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে ৪০ জন, বাকি ২০ জন কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবন্টিত। এই কারণে তাঁরা প্রায় নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেন। তাঁদের উপজাতি তালিকাভুক্ত করলে, রাজ্যে প্রধান তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে যতটুকু ভারসাম্য আছে তা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এটা লক্ষণীয় যে গত বিধানসভা নির্বাচনে কোনও দলেরই ইস্তেহারে মেইতেইদের এস টি তালিকাভুক্ত করার দাবি ছিল না। ইস্যুটা যদি অতই গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে সব দলই তো এই দাবি করত। মণিপুরের বর্তমান সংকটকে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে।

গত বছরের (২০২৩) ২৭ মার্চ মণিপুরের হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয় মেইতেই জনজাতিকে তফসিল উপজাতির তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করতে। সেই থেকেই মেইতেই-কুকি সংঘর্ষের সূত্রপাত। এই এক বছরে সংকট আরও গভীর হয়েছে। মেইতেই মানুষদের একটা অংশ কুকিদের সাথে সৌহার্দ্য গড়ে তোলার জন্য উদগ্রীব কিন্তু সরকারি বেসরকারি নানা চাপের কারণে তাঁরা অসহায়। এই কারণে কুকি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আজও একই রকমভাবে বিপন্ন। এই লেখার শিরোনাম হয়তো বিভ্রান্তিমূলক, কারণ মণিপুরে জাতি-উপজাতির কোলাজ আজ ভেঙ্গে পড়ছে। সুড়ঙ্গের শেষে আলো নেই, অন্ধকার……..

(১) https://zeenews.india.com/india/manipur-violence……dt. 24.07.2023

(২) https://www.indiatoday.in/history……dt. 04.08.2023

(৩) ওই

(৪) https://thewire.in…..dt. 27.05.2023

(৫) The Telegraph, dt. 26.07.2023, article by Pradip Phanjoubam

রাম মন্দির কথা: বাল্মীকি ও বিজ্ঞানের কবরস্থান আর খাওয়াপরা সুস্থভাবে বাঁচার চিন্তা যেখানে গৌণ

ভবানীপ্রসাদ সাহু

এই ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারি তারিখটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সেদিন বিপুল ব্যয়, বিশাল আড়ম্বর আর বীভৎস প্রচারের মধ্য দিয়ে একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরের মধ্যে 'রাম' নামক প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের এক নৃপতির পাথরের মূর্তি রেখে দিয়ে তার তথাকথিত 'প্রাণ' প্রতিষ্ঠা করা হল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চাগিয়ে তোলা হল রামভক্তির অসুস্থ এক গণ উন্মাদনা। এটি স্পষ্ট যে, যারা এটা করছে তাদের কাছে রাম-কে সম্মান জানানোর চেয়ে তার উপর সাধারণ সরল বিশ্বাসী মানুষের ভক্তির সুযোগ নিয়ে তাদের ভোট সুনিশ্চিত করার ধান্দাটাই প্রধান,—উদ্দেশ্য ক্ষমতালাভ আর ধর্মপরিচয়ের মত মানুষেরই তৈরি করা একটি কৃত্রিম বিষয়কে মানুষের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে ওই ধর্মের নামে ভারতরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

প্রাচীন বিশ্বে নানা অসাধারণ সাহিত্যকীর্তির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি অন্যতম। কিন্তু ইলিয়াড ওডিসির কোন চরিত্রকে নিয়ে এমন মিথ্যা অন্ধ বিশ্বাস তৈরি করা হয়েছে বলে জানা নেই, যা করা হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতকে ঘিরে। আসলে তা মনুবাদী চতুর্বর্ণপ্রথার তথাকথিত শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণদের একটি সংকীর্ণ প্রচার মাত্র, শাসকশ্রেণি ক্ষত্রিয়দের স্বার্থে,—যে ক্ষত্রিয় আবার ব্রাহ্মণকেই মাথায় করে রাখবে। সু প্রসিদ্ধ পুরাণবিদ পণ্ডিত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন।—

''এই যে একটা 'মিথ'—রাম রাজ্য, রাম-রাজত্ব সচেতনভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে, যার সঙ্গে রামায়ণের আদি থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত রামচরিত্র মেলে না। এমনিতেই দেশি-বিদেশি পণ্ডিতজনরা রামরাজত্বের আধার উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলেন, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য এই প্রক্ষিপ্তবাদকে ভীষণ গুরুত্ব দিই না। কেন না রামায়ণের এই প্রক্ষিপ্ত অংশেই সেকালের ব্রাহ্মণদের সেই সুপরিকল্পিত প্রয়াসটুকু দেখা যায়, যেখান এক কলুষিত প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই রামচন্দ্র 'পতিতপাবন সীতা রাম'-এর মধুরতার নির্মোক ছেড়ে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' হয়ে ওঠেন।''

রামায়ণের রচয়িতা হিসেবে আমরা বাল্মীকির কথাই জানি। সেই বাল্মীকিও রামকে ঐভাবে বর্ণনা করেননি, যেভাবে পরবর্তীকালে তাঁর কথা তথা রামায়ণকে বিকৃত করে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তথা দেবদেবী মানুষেরই কল্পনার সন্তান, বাস্তবে এমন কেউ নেই। তাদের অস্তিত্ব মানুষেরই কল্পনায় আর বিশ্বাসে। এমন এক অবাস্তব চরিত্র বিষ্ণুর মনুষ্য রূপ বা অবতার হিসেবে রাম-কে ভাবা হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি তাকে দোষেগুণে ভরা একজন মানুষ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন, কোথাও কল্পিত ঈশ্বর বা ভগবানের সমান বলে বা ভগবান বলেই বলেন নি। ঐ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর কথায় ''অবতার রাম, ভগবান রামের গণ্ডি পেরিয়ে আমার আপনার মতো দোষেগুণে সাধারণ মানুষটিকে''-ই বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি। তাই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রচার আর তুলসীদাস-কৃত্তিবাসের মত কবিদের জনপ্রিয় রচনায় রাম-কে ঘিরে এই ধরনের চিত্রায়ণ যে আরোপিত ও বাল্মীকির রামায়ণের বিরোধী তা-ও মাথায় রাখা দরকার।

এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আড়াই তিন হাজার বছর আগে বর্ণনা করা একটি চরিত্রকে ঘিরে এমন প্রচার, এমন বিপুল আয়োজন শুধু বাল্মীকি বিরোধী বলে নয়, যে মসজিদ ভেঙ্গে ভিন্ন ধর্মের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার তাড়নায় হিন্দুত্ববাদী আবেগ চাগিয়ে তোলার অপচেষ্টা করা হল তা হাস্যকরও বটে। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা পাশের বাড়ির রাম বা রহিমের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন;—তা জানতে পেরে এখন যদি তার প্রতিশোধ নিতে ঐ রাম বা রহিমের উপর নিগ্রহ চালানো হয়, তবে ব্যাপারটি এমনটি হাস্যকরই হবে। যদি তর্কের খাতিরে, মেনেও নেওয়া যায়, অযোধ্যার ঐখানে রামায়ণের রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, তবু তার জন্য অন্য ধর্মের সৌধকে নিশ্চিহ্ন করে রামমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করাটা বালখিল্যসুলভ। আদৌ রামচন্দ্র নামে কেউ ছিল কিনা তা বিতর্কিত, সে কোথায় জন্মেছিল তাও বিতর্কিত তবু প্রচারের জোরে ভিন্নধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বৈরিতা বাড়িয়ে তোলার নোংরামি করা হল প্রতিশোধের স্পৃহায়। যদি সত্যিই নিজ ধর্মের প্রাচীন মন্দিরের মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা থাকত, তবে নিজ ধর্মেরই অন্যরা যারা তা করেছে তারও 'প্রতিশোধ' নেওয়া দরকার। যেমন দক্ষিণ ভারতের হিন্দু পল্লব রাজবংশের হাতে মহাবলীপুরমের যে অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছিল, তা বারবার আক্রমণ করে ধ্বংস করেছিল হিন্দু চালুক্য রাজারাই। অবাধ মসজিদ ভাঙ্গার মত তাহলে চালুক্য রাজাদের বানানো বাদামি বা 'পাত্তাদোকল'-এর সুন্দর স্থাপত্যগুলি ধ্বংস করা দরকার। অন্যদিকে এই পল্লব রাজবংশের নন্দবর্মা পল্লবমল্ল বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জৈন সাধুকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছিলেন। এখন যদি বৌদ্ধ ও জৈনরা তার প্রতিশোধ নিতে ঐ সব গ্রামের ব্রাহ্মণ তথা হিন্দুদের তাড়াতে যায়, তা কি 'বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির গড়ার যুক্তি' অনুযায়ি মেনে নেওয়া হবে।

পাশাপাশি এটিও স্মরণ করা যেতে পারে, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে

গোলকুন্ডার সুলতানের সেনাপতি, মরাঠি ব্রাহ্মণ মুরাহরি রাও অহোবালামের বিখ্যাত নরসিংহ মন্দির লুণ্ঠন করে সেটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ নিতে রাম মন্দির বানানেওয়ালারা কি মরাঠি ব্রাহ্মণদের ধরে ধরে মারবে? চাণক্য রাজকোষে টান পড়লে মন্দিরের সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠন করার ও মন্দির ধ্বংসের পরামর্শ দিয়েছিলেন, এর জন্য দেবোৎপাটন মন্ত্রকও গড়া হয়েছিল, এখন ঐভাবে ধ্বংস করা মন্দিরের তালিকা বানানো হবে? কিংবা একসময় মারাঠা থেকে আসা বর্গি দস্যুরা বাংলায় নির্মম লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালিয়েছিল, এখন বাঙালিরা মহারাষ্ট্রে গিয়ে তার প্রতিশোধ নেবে? রাম মন্দির বানানেওয়ালাদের যুক্তি অনুযায়ি এসবই করা উচিত।

আসলে এই ধান্দাবাজ ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর ঐ স্থানে এমন মন্দির বানানোর পেছনে সুস্থ কোন যুক্তিই নেই। সবই অপযুক্তি। রাম মন্দিরের জায়গায় বাল্মীকিকে তো তারা কবর দিয়েছেই, এই যুক্তিবোধ সুস্থ চিন্তা মানবিকতা—এ সমস্তকেও কবর দিয়েছে। একদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্থাপত্য নির্মাণ, এমনকি রামনবমীর দিন প্রথম সূর্যের আলো রামের কপালে ফেলার মত অর্থহীন প্রযুক্তি জাতীয় নানা কর্মকাণ্ড, অন্যদিকে নিছক একটি বিশ্বাসকে সত্য ধরে নিয়ে রামের নামে মন্দির, তার পূজা, তার আবার 'প্রাণ' প্রতিষ্ঠার মত হাস্যকর ক্রিয়াকর্ম।

বহুজন কোনকিছু বহুদিন ধরে শুধু বিশ্বাস করলেই তা সত্য হয়ে যায় না। মানবতাবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা মানুষের ভালোর জন্যই এই বিশ্বাসের যাথার্থ অনুসন্ধান করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, কারণ তাঁরা জানেন যা মিথ্যা তার অনুসরণ কখনোই ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই করে না। আর যারা মিথ্যা বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়ে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ স্পষ্ট করার ধান্দাবাজি করেন তারা এই মিথ্যা বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী করে রাখার চেষ্টা করেন, যাতে মানুষ সত্যকে না জানতে পারে। হিটলার তাই করেছিলেন। সব দেশের সব সময়ের খৃষ্ট ইসলাম হিন্দু সব ধর্মীয় মৌলবাদী ও শাসকশ্রেণি তাই করেন, এখনকার ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দু মৌলবাদী ও শাসকগোষ্ঠীও তাই করছেন। প্রকৃত অর্থে তা মানবতা বিরোধী, গণবিরোধী।

কারণ তারা জানেন, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে যদি তাদের সরল বিদ্বেষমুক্ত বিশ্বাসের থেকে সরিয়ে নিজেদের অনুকূলে অন্ধ বিশ্বাস আর আনুগত্যের চোরাবালিতে ঠেলে দিতে পারেন, তবে খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-বাসস্থান-স্বাস্থ্য-র মত সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ও লড়াই থেকে তাদের ভাবনা ও কাজকর্মকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে। বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা থেকে ব্যবসায়িগোষ্ঠী, যারা ঐ শাসকগোষ্ঠীর লেজুড় ও সহায়ক শক্তি তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার হলেন। দেশের বিখ্যাততম অভিনেতা তাই অযোধ্যায় জমি কিনে গদগদ চিত্তে ভক্তি জানান (সঙ্গে ব্যবসায়িক ধান্দা আছে)। দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী উত্তরীয় গায়ে দিয়ে ধ্যানের পোজ দেয় (সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য লাভের ধান্দাও আছে)। মন্দিরের সৌন্দর্য ও মূর্তির শিল্পসুষমা দেখতে নয় (যেমন যাওয়া হয় তাজমহল বা কুতুবমিনার দেখতে), দলে দলে মানুষ ছোটে রাম আর মন্দির দেখতে। মনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় রামভক্তি, হিন্দুত্বের প্রতি আনুগত্য, অবচেতনভাবে ভিন্ন ধর্মের প্রতি অসূয়া। ধর্ম ও ধর্মপরিচয়ের মত কৃত্রিম ও মানুষেরই তৈরি করা দিকগুলিকে নিজের অস্তিত্বের সমার্থক বলে আরো জোরদার ভাবে বিশ্বাস করতে থাকেন। মুষ্টিমেয় কিছুজন প্রায় বিনাশ্রমে বিপুল সম্পদ আর দৃষ্টিকটু বিলাসের অধিকারী হন, আর বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজের সুযোগ পাননা, কাজ পেলেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না, প্রয়োজনীয় শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান থেকে বঞ্চিত—এই ধরনের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য কেন ঘটছে, বঞ্চিত মানুষ তা ভাবার আর তার সমাধানের লড়াইকে ভুলে যান।

বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির গড়ার (তালিকায় আছে আরো ২৭টি মসজিদ মতান্তরে ৫০টি—যার মধ্যে আছে মথুরা ও বারাণসীর মসজিদও) তীব্র আন্দোলন হিন্দুত্ববাদীরা শুরু করার আগে এদেশের জন্মসূত্রে হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষজনের অতি নগণ্য সংখ্যক ছাড়া কেউ-ই এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন হেরফেরও হয় নি। এখন এই ২০২৪ সালে রামমন্দির গড়ার প্রক্রিয়ায় আরো বহু সংখ্যক হিন্দু এ নিয়ে সচেতন ও আবেগপ্রবণ হয়েছেন। কিন্তু মন্দির গড়ার সাফল্যের জন্য তাঁদের দৈনন্দিন খাওয়া পরা শিক্ষা স্বাস্থ্য-র যে কোন উন্নতি হয়ে গেছে, তাও নয়, তা হওয়ার কথাও নয়। বরং উল্টোই হয়েছে, ইতিমধ্যে এ দেশের বেকারত্ব রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে, সাম্প্রতিক দি গ্লোবাল ইকনমি-ডট-কম-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে তা এতই ভয়াবহ যে সিরিয়ার মত বিধ্বস্ত, আর্থিক অনগ্রসর দেশের থেকেও বেশি।

স্পষ্টতই এই কর্মহীনতার ছাপ কর্পোরেট ব্যবসায়ী ও কিছু রাজনৈতিক নেতা ছাড়া সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর পড়েছে। তীব্র বেকারত্বের প্রতিফলন ঘটেছে মানুষের যা আবশ্যিক প্রয়োজন ঐ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পুঁজি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুস্থ পরিবেশ সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক নিরাপত্তা—এদের উপর। ভয়ংকর এক পরিস্থিতি। পাশাপাশি দেশের যে প্রধান সমস্যা, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভাজন, ধর্মমোহের উন্মাদনা, আপাদমস্তক দুর্নীতি, নির্লজ্জ ব্যক্তিপূজা, সর্বগ্রাসী কর্পোরেট পুঁজি—এসব থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়ে অস্তিত্বহীন অলৌকিক দৈবশক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস আর রাম মন্দিরওয়ালা তথা মৌলবাদী শক্তির (আসলে শাসকগোষ্ঠীর) অনুগত নাগরিক সমাজ তৈরি করা হচ্ছে। নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে লড়াই করার মেরুদণ্ডটিই ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

এখনকার এই ধর্মীয় মৌলবাদী অপশক্তির মত মিথ্যার বেসাতি করে হিটলারও একসময় এক দানবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, বিপুল জনসমর্থন নিয়েই। ঐ হিটলারের ভাবশিষ্য এই মৌলবাদী শক্তিও তারই মত ভয়ংকর হত্যালীলা চালানোর আগে মানুষই পারবে হিটলারের মত এদের নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু বড় বেশি দেরি হওয়ার আগে তা পারবে তো? কিন্তু পারতেই হবে।

ক'জন ভাবি – পরিযায়ীদের 'ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায়, বিনিদ্র রাত জাগে' ?

তপন কুমার সামন্ত

পরিযান কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়

আমরা যারা এখন বয়স্ক নাগরিক এবং লেখাপড়ার সঙ্গে একটু আধটু জড়িয়ে আছি তারা বাংলার 'পরিযায়ী' কথাটার থেকে ইংরেজিতে 'মাইগ্রেটরি বা 'মাইগ্র্যান্ট' কথাটার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম বেশি। কারণ আমাদের কিশোর বয়সে চিড়িয়াখানা থেকে রবীন্দ্র সরোবর বা সাঁতরাগাছি ঝিলে শীতের আগে থেকেই মাইগ্রেটরি বার্ডরা আসছে আসছে বলে লোকমুখে বা খবরের কাগজে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যেত। তারপর মাইগ্রেটরি বার্ডদের আসা, বাসা তৈরি করা, ডিম পাড়া, ছানা বড় করা, খাবার সংগ্রহ করা থেকে আবার তাদের পুরনো ডেরাতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক একটা আলোচনা চলত বিভিন্নভাবে। এভাবেই জেনে গিয়েছিলাম এবং যার পর নয় বিস্মিত হয়েছিলাম যে 'আর্কটিক টার্ন' পাখিরা নাকি নব্বই হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যায় প্রতি বছর। তারা সারা জীবনে যে পথ অতিক্রম করে সেটা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের তিনগুণ। বাংলা ভাষায় এই ধরনের পাখির বিষয়ে কথা বলা বা লেখার সময়ও 'মাইগ্রেটরি' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মাইগ্রেটরি' কথাটার থেকে বাংলায় 'পরিযায়ী' কথাটা বেশি প্রচলিত হল এবং 'পরিযায়ী' শব্দটি শুনলে তারপরে যে 'পাখি' শব্দটি আসবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতো না। 'পরিযায়ী' কথাটার পরে যে 'মানুষ' বলে একটি শব্দ আসতে পারে এটি ছিল আমার ভাবনার বৃত্তের বাইরে।

তবে সে ভাবনা ছিল একেবারেই অমূলক। 'পরিযান' দিয়েই মানুষ আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে এটা আমরা এখন সকলে জেনে গিয়েছি, তখন জানতাম না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাগৈতিহাস ভারতবর্ষে পরিযান ও জাতিগোষ্ঠী গঠন' বইটি এভাবে শুরু করেছেন – "দিনটা উষ্ণ ও আর্দ্র। আকাশের এক কোণে ঘাপটি মেরে থাকা কালো কালো মেঘ মাঝে মাঝে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে। চারিদিকে সবুজ বনভূমি; দূরে নীল পাহাড়ের ঢালে স্লেটের মত ধূসর অরণ্যভূমির রেখা দেখা যায়। সহস্র পশু চলেছে একে অপরকে অনুসরণ করে। ওয়াইল্ড বিষ্ট, এলান্ড, ইম্পালার দল খাদ্যের সন্ধানে ধীর গতিতে চলেছে। ওই পশুদের অনুগমন করছে শতখানেক মানুষ। মানুষগুলো লম্বা, কালো, হিলহিলে। ওদের কোমরে এক টুকরো পশুচর্ম বাঁধা আছে। হাতে আছে পাথরের কুঠার। ওরা জানে না কোথায় চলেছে, শুধু জানে ওই পশুদের সঙ্গে হেঁটে যেতে হবে। তবে মিলবে নতুন খাদ্যসমৃদ্ধ ভূমি।

এই হল এক লক্ষ তিরিশ থেকে আশি হাজার বছর আগের পূর্ব আফ্রিকার এক খণ্ডচিত্র। তৃণাবৃত উপত্যকা দিয়ে মাইগ্র্যান্ট পশুদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে 'হোমো সেপিয়েন্স' একদিন চলে যায় নতুন খাদ্য সমৃদ্ধ এলাকায়। ওরা সেই সময়ে ছিল শিকারি ও সংগ্রাহক। কোন ঘর-বাড়ি নেই, ছিল অস্থায়ী বসতি। প্রয়োজনমতো ওরা পরিযায়ী পশুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, খাদ্য সংগ্রহ করেছে। সাহারা তখন সবুজ। সবুজ সাহারা আধুনিক মানুষের পথ চলার এক করিডোর তৈরি করে দিয়েছিল, আফ্রিকাকে যুক্ত করেছিল এশিয়ার সঙ্গে। এভাবেই একদিন কোন এক মাইগ্র্যান্ট শিকারি-সংগ্রাহক জনগোষ্ঠী আফ্রিকার রিফ্ট ভ্যালি ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছে উত্তর দিকে। নীলনদ ছাড়িয়ে সরু নীল-সিনাই করিডোর ধরে সুয়েজ অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে ভূমধ্যসাগরের পূর্বে ইজরাইলে, সবুজ লেভান্ত অঞ্চলে।" এভাবেই প্রায় সত্তর হাজার বছর আগে ভারতে প্রথমে এসেছে মানুষ এবং তারপরও নানা রকম পরিযানের মাধ্যমে আমরা ভারতীয়রাএকটি মিশ্র জাতি হিসেবে ভারতে বসবাস করছি।

সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে মানব পরিযান একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শিকারি সংগ্রাহক জীবন থেকেই মানুষ পরিযায়ী, আজ আধুনিক সভ্য জগতের মানুষেরাও তাই। এভাবে দেখলে আর্যরা পরিযায়ী, মুসলিম শাসকেরাও পরিযায়ী। ব্রিটিশরাও। এই পরিযান অন্তঃ-পরিযান। আবার ভারত থেকে যে সমস্ত মানুষ ধর্ম বিস্তারের জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারাও পরিযায়ী। এটি বহিঃ পরিযান।

শিকারি সংগ্রাহক জীবন থেকে মানুষ যখন কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল তখন কৃষির কারণেই স্থায়ী বসবাসের জন্য পরিযান ক্রিয়াতে খানিকটা ভাঁটা এসেছিল। কিন্তু আবার জলবায়ুর পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উর্বর জমির সন্ধান করা, সেচ প্রভৃতির কারণে কৃষিজীবী মানুষই আবার পরিযান ক্রিয়াতে সামিল হয়েছে। বেঁচে থাকবার জন্য সম্পদ সংগ্রহ, আবার শোষণ করবার জন্য সম্পদ লুণ্ঠন সবার ক্ষেত্রেই পরিযান থাকে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, লেখাপড়া, উন্নত নাগরিক জীবন প্রভৃতি নানান কারণে পরিযান ঘটবেই। পরিযান বাদ দিয়ে বর্তমান সমাজ অচল।

তাহলে, পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে কেন এত আলোচনা?

প্রাক ব্রিটিশ ভারত থেকে ব্রিটিশ ভারত হয়ে স্বাধীন ভারতের আটের দশক পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার সাদামাটা গ্রামীণ জীবনে পরিযানের প্রয়োজন প্রায় ঘটেনি বললে চলে। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত লেখাপড়া বা চাকরির কারণে অনেকে নিজের বসত এলাকার বাইরে সাময়িকভাবে যেত, আবার ফিরেও আসত। তাদের খুবই অল্প সংখ্যকই জন্মভিটা ত্যাগ করে অন্য কোথাও পাকাপাকিভাবে থাকত। সেই সংখ্যাটা এতই নগণ্য যে হিসেবের মধ্যে আসে না। ফলে বংশপরম্পরায় জমিতে চাষবাস এবং একই এলাকায় শয়ে শয়ে বছর ধরে বসবাস চলে আসায় যে সুস্থিত 'মেন্টাল সেট আপ' গড়ে উঠেছিল, পরিযান সেখানে প্রবল আঘাত করল। পরিযান ক্রিয়াটি

বেশিরভাগ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে প্রবল মানসিক বাধার সম্মুখীন হয়েই ঘটছিল। বলা যায় - এই প্রায় নিশ্চল পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা মানুষরা বিগত দু'আড়াই দশকের ধরে পরিযায়ী হতে বাধ্য হল।

পরিযায়ী হওয়ার মূল কারণ অর্থনৈতিক

গ্রামীণ ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলায় প্রান্তিক মানুষদের কৃষি থেকে জীবিকা নির্বাহ করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ছিল। গ্রামীণ উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির নিজগ্রাম ছেড়ে ভিন্ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার পিছনে কারণগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়ঃ

এক - গ্রামীণ মানুষের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ কমেছে।

দুই - বিদ্যুৎ, সেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির খরচ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধির কারণে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলি (জমির মালিক থেকে ক্ষেতমজুর) অসহায় হয়ে পড়ছে।

তিন - জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের (মাটির চাষ দেওয়া থেকে ফসল মাড়াই সর্বত্র) ফলে শ্রমিকেরা উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। সারা বছর দূরের কথা বছরের কয়েক মাসেও সব কৃষিশ্রমিকের কাজ পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

চার - আমাদের রাজ্যে কৃষিমজুরির পরিমাণ, যে রাজ্যগুলিতে পরিযান ঘটছে সেখানকার শ্রমিকের মজুরির থেকে অনেক কম।

পাঁচ) ১৯৯০ সালের পর মানে দেশে উদারনৈতিক অর্থ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে চরম পেশাদার এবং কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকরা ছাড়া বাকিদের স্বচ্ছল জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দ্রুত নগরায়নের ফলে কৃষি এবং ভূমি বিষয়ক অর্থনীতির স্থিতাবস্থার কারণে ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে, কৃষিজীবীদের কাজের সুযোগ কমছে সামগ্রিকভাবে কাজের পরিবেশ শ্রমিকবিরোধী হয়ে যাচ্ছে। ফলে শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়ছে কিন্তু কাজের নিরাপত্তা থাকছে না। ইতিমধ্যে প্রচুর শ্রমবিরোধী আইন তৈরি হয়েছে। ভিন্ রাজ্যে অদক্ষ শ্রমিক যোগানোর পিছনে এই কারণগুলিও ক্রিয়াশীল।

পশ্চিমবাংলার বহিঃ পরিযান - সেকাল থেকে একালে

আমার ছোটবেলা কেটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে। ছোটবেলায় গ্রাম থেকে খুবই অল্প সংখ্যক কিশোর বা যুবকেরা কলকাতার মুদিখানা, স্টেশনারি বা মিষ্টি দোকানে কাজ করতে যেতে দেখতাম। আর আমাদের গ্রামে ক্ষেতমজুরির কাজ করতে আসত পাশের থানা থেকে। চাকরি-সূত্রে আটের দশকের প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানায় কাজ করতে গিয়ে এরকম পরিযানও চোখে পড়েনি। প্রায় নয়-এর দশক পর্যন্ত এই একই চিত্র ছিল পশ্চিমবাংলার সর্বত্র। অর্থাৎ গ্রাম বাংলা থেকে পরিযান অন্তঃরাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল - সাধারণভাবে এ কথাটা বলা যায়।

আমাদের দেশের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ একই রকমের নয়। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিযান সবসময়ই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকা রাজ্যের দিকে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - প্রাক স্বাধীন ভারতে বাংলা ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা একটি রাজ্য। সে কারণে সেই সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কলকাতামুখী পরিযান ঘটেছে। কিন্তু নানা কারণে স্বাধীনোত্তর ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশের অভিমুখ বাংলা থেকে সরে যাওয়ায় বাংলা থেকে শ্রমিকদের পরিযান ঘটছে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের রাজ্যগুলিতে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত বাংলার সার্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ছিল ৩.৩১ শতাংশ, যা ভারতের গড় (২.৭৫%) অপেক্ষা অনেকটাই বেশি। বাংলায় এই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প। কৃষির ভূমিকা ছিল নগণ্য। ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে যেখানে কৃষিতে বৃদ্ধির হার ছিল ৪.১৭ সেখানে পশ্চিমবাংলায় ছিল ১.৯৪। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অক্ষ কলকাতার বদলে বম্বেতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। দেখা যায় ১৯৬৭ সালে বোম্বেতে ১৩.৫৩ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে যেখানে বাংলায় ওই সময়ে কাজ করে ৮.৮৭ লক্ষ। মাশুল সমীকরণ নীতির সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স প্রথাও পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক অধঃপতনের অন্যতম একটি কারণ। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল চল্লিশটি কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স, সেখানে মহারাষ্ট্র পেয়েছিল একশ' পঞ্চাশটির।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা এবং তারপর ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, খেতমজুরি বৃদ্ধি এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও কোটি কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি এই পরিযানকে রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ভূমিহীন মানুষের হাতে খাস জমি বন্টিত হওয়ায় এবং ভাগচাষীদের ভাগচাষে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে যে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেটাই এই বহিঃপরিযানকে আটকে রাখতে সমর্থ হয়েছিল (ছবি - ১ ও ২)।

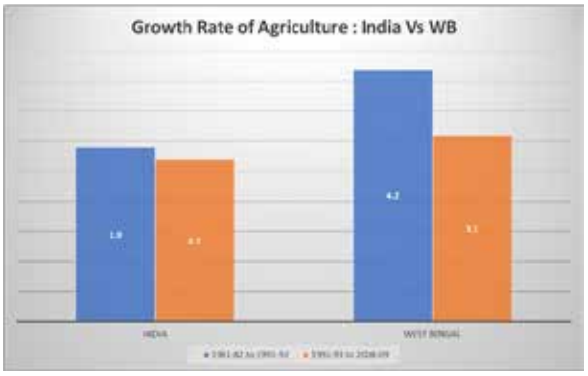

Source: Central Statistical Organisation (ছবি- ১)

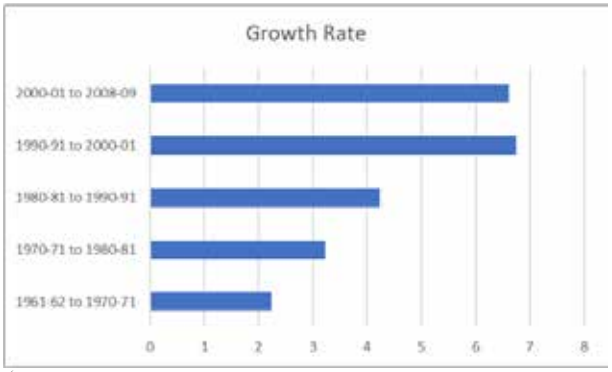

(Growth Rate of Net State Domestic Product, WB, Source: Central Statistical Organisation and West Bengal Human Development Report, 2004) (ছবি - ২)

১৯৫২ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত দেশে চালু ছিল মাশুল সমীকরণ নীতি। এই নীতির ফলে দেশের যে কোন জায়গায় কলকারখানা স্থাপন করতে গেলে কয়লা, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি খনিজ দ্রব্যগুলিকে একই মূল্যে পাওয়া যেত। কিন্তু কৃষি-পণ্য বা শিল্প-পণ্যের মাশুল সারাদেশে একই হারে ছিল না। এই নীতি আপাততভাবে শুনতে ভালো হলেও দেশের খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলি অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে রানীগঞ্জের কয়লা পাঞ্জাবের লুধিয়ানাতে পৌঁছাতে টন প্রতি মাসুল লাগতো ৪৯ টাকা ২০ পয়সা কিন্তু পাঞ্জাবের ফাজিলা থেকে হাওড়া পর্যন্ত এক টন তুলোর মাশুল ছিল ১৬৫ টাকা ৭০ পয়সা আর পাঞ্জাব থেকে হাওড়া পর্যন্ত এক টন তৈলবীজের মাশুল ছিল ৯০ টাকা ৯০ পয়সা। যখন রানীগঞ্জ থেকে বোম্বাই পর্যন্ত এক টন কয়লার মাশুল ছিল ৫৩ টাকা ৩০ পয়সা, তখন বোম্বাই থেকে কলকাতাতে এক টন লবণ আনতে মাশুল পড়ত ৭৩ টাকা ৯০ পয়সা। এই নীতির ফলেই খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির প্রতি শিল্পপতিদের আগ্রহ নষ্ট হয় ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তুলনায় খনিজ সম্পদহীন রাজ্যগুলিতে শিল্প স্থাপন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার (অধুনা ঝাড়খন্ড সহ), মধ্যপ্রদেশ (অধুনা ছত্রিশগড় সহ) ও ওড়িশায় শিল্পের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। দেখা যায় - মহারাষ্ট্র, গুজরাট সহ পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে শিল্প কলকারখানার প্রসার ঘটতে। স্বাভাবিক কারণেই পশ্চিমবাংলায় শিল্পের ক্ষেত্রে তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। এই সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমবাংলার সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রটিকে বেছে নেয় এবং এর বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কৃষি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বহু মানুষ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে নিযুক্ত হয় (ছবি - ৩)।

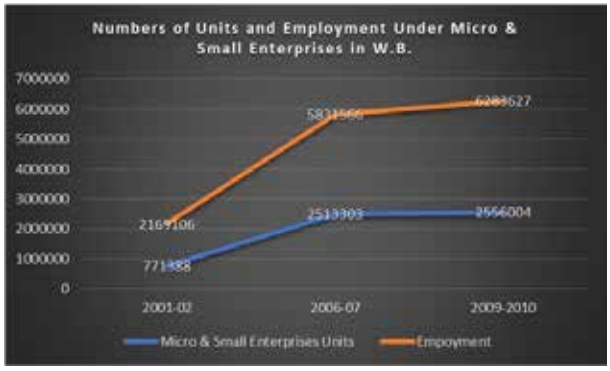

[Source: 3rd Census (2001-02); 4th MSME Census (2006-07); Statiscal Appendix, Economic Review, Government of West Bengal] (ছবি - ৩)

পশ্চিমবাংলায় শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত হওয়ার কারণ

গত শতাব্দীর নয়ের দশক থেকেই গ্রামে গ্রামে উদ্বৃত্ত শ্রমিক দেখা দিতে শুরু করল। এর প্রধান কারণ হলো - ১) অধিক জনঘনত্বের কারণে পশ্চিমবাংলায় মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ছিল অন্য রাজ্যের তুলনায় কম। খাসজমি বন্টন ও অপারেশন বর্গার ফলে জমির মালিকানা বা অধিকার যাদের হাতে গিয়েছিল, বছর কুড়ির মধ্যে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সেই জমি ভাগ হয়ে যাওয়ায় ওই জমি থেকে উৎপন্ন ফসলে জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে পরিবারগুলির।

২) কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির যে সুযোগ ছিল তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি। ৩) শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় হাজার হাজার স্কুল, কলেজ স্থাপন, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে বই ও পুস্তক প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি, ভূমিহীন পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বিপুলভাবে ঘটায় তাদের একটি অংশ কৃষি কাজ ছেড়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজ খুঁজতে থাকে। কিন্তু সেই সুযোগ বাংলায় তখন ছিল না।

৪) ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার ফলে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন যুবসমাজের সবার এই রাজ্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না।

বাড়তে থাকল বহিঃপরিযান

এর প্রভাব দেখা গেল ২০১১ সালের সেনসাস রিপোর্টে। এই রিপোর্টেই প্রথম পশ্চিমবাংলায় আসা পরিযায়ী অপেক্ষা, পশ্চিমবাংলা থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া পরিযায়ীদের সংখ্যা বেড়ে গেল অর্থাৎ নেট মাইগ্রেশন রেট নেগেটিভ হয়ে গেল (ছবি - ৪)। নেট মাইগ্রেশন রেট কিভাবে নির্ধারিত হয় সেটি জানলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। নেট মাইগ্রেশন রেট (N) নির্ধারিত হয় নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে

N = (1-E)/ M X 1000

I = Number of immigrants (অন্তঃ পরিযায়ী), E = Number of emigrants (বহিঃ পরিযায়ী), M = Mid year population

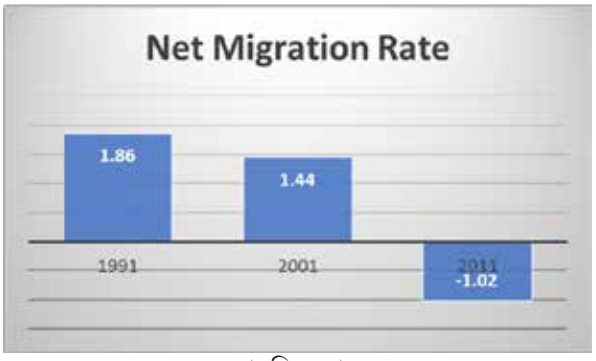

(ছবি - ৪)

১৯৯১ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের রাজ্যে আসা পরিযায়ীর হার ছিল ২৯.৭৩ আর আমাদের রাজ্য থেকে বাইরে যাওয়া পরিযায়ীর হার ছিল ১.৬৪, কিন্তু ২০১১ সালে অন্তঃপরিযায়ী কমে দাঁড়ায় ২৬.৭৪ আর বহিঃপরিযায়ী বেড়ে হয় ২৭.৭৩। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের রাজ্যে অন্তঃপরিযায়ী ও বহিঃ পরিযায়ীদের সেনসাস রিপোর্টে যে ছবি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ -

অঞ্চল	অন্তঃ পরিযায়ীর হার			বহিঃ পরিযায়ীর হার		
	1991	2001	2011	1991	2001	2011
উত্তরাঞ্চল	5.65	5.51	4.02	0.36	6.34	7.57
উত্তর পূর্বাঞ্চল	1.84	2.07	2.39	0.2	1.93	1.9
পূর্বাঞ্চল	20.67	21.99	19.26	0.8	7.7	9.77
মধ্যাঞ্চল	0.32	0.35	0.26	0.11	1.08	1.18
পশ্চিমাঞ্চল	0.42	0.47	0.4	0.14	3.46	4.97
দক্ষিণাঞ্চল	0.83	0.69	0.41	0.08	1.2	2.34
মোট	**29.73**	**31.08**	**26.74**	**1.64**	**21.71**	**27.73**

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে পশ্চিমবাংলায় আসা পরিযায়ীর হার সব থেকে বেশি কমেছে, আর তার পরেই কমেছে উত্তরাঞ্চলে। বিপরীতে পশ্চিমবাংলা থেকে বহিঃপরিযায়ীর হার বেড়েছে সব থেকে বেশি পশ্চিমাঞ্চলে, তারপর দক্ষিণাঞ্চলে, তারপর উত্তরাঞ্চলে।

এখন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের চিত্রটা কী রকম? ২০১১ সালের পর আর কোন সেন্সাস না হওয়ায় সরকার স্বীকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সাধারণ চোখে গ্রাম শহরগুলি থেকে যে পরিমাণ শ্রমিক পশ্চিমবাংলার বাইরে যাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে সেই চিত্র হচ্ছে মারাত্মক। বাংলার বহু গ্রাম এখন পুরুষ শূন্য। স্কুলগুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রদের থেকে বেশি। আবার স্কুলে যে সমস্ত ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজ্যের বাইরে কাজ করতে চলে যায়। এই চিত্রগুলি থেকে ২০১১ সালের পর পশ্চিমবাংলা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিযান যে বহুগুণ বেড়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিভিন্ন উৎস থেকে কিছু ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ২০১১তে পরিযায়ী শ্রমিকের বিচারে প্রথম চারটি রাজ্য ছিল যথাক্রমে উত্তর প্রদেশ (৩৭.৩ লক্ষ), বিহার (২২.৬ লক্ষ), রাজস্থান (৬.৬ লক্ষ), পশ্চিমবাংলা (৫.৮ লক্ষ)। ১৯.১১.২৩ তারিখের 'দি হিন্দু' থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এপ্রিলের প্রথম দিকে 'কর্মসাথী-পরিযায়ী শ্রমিক' নামে একটি পোর্টাল চালু করে। এই পোর্টালের মাধ্যমে ১৮,০১,৪১৫ জনের দরখাস্ত ডিজিটাইজড হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে। অনুমান করা যায় যে ৪০ লক্ষের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক পশ্চিমবাংলার বাইরে অন্য রাজ্যে কাজ করছে আর এই পরিযায়ীদের সবথেকে বড় অংশ কাজ করছে দক্ষিণ ভারতে।

মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাজমুল হক জানালেন - তার পঞ্চায়েত এলাকায় আনুমানিক দু'হাজারটি হল গরিব, খেতমজুর ও পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার। এদের শতকরা আশি ভাগই পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে রাজ্যের বাইরে কাজ করতে যায়। এদের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ন'শ' জন পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেছে। তাঁর মতে শ্রমিকদের পরিযায়ী হওয়ার কারণ হলো - প্রথমতঃ ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষকেরা ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি দিতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ এক'শ দিনের কাজ 'ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিশিয়ারি সিস্টেম'-এ চলে আসায়, মানুষ কী কাজ হচ্ছে, আদৌ কোন কাজ হচ্ছে কিনা - তা দেখতে পাচ্ছে না। ফলে দুর্নীতির পরিমাণও বাড়ছে। এখন ১০০ দিনের কাজ না থাকায় গ্রামীণ মজুরেরা কোন কাজ পাচ্ছেন না। ফলে বেশি রোজগারের জন্য শ্রমিকেরা পরিযায়ী হয়ে যাচ্ছেন।

আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগেও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশের মতো হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি থেকে পরিযায়ী শ্রমিকেরা দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের দিকে কাজের জন্য যেতেন। কিন্তু নব্বই-এর দশকে কেরালা থেকে ২৫ লক্ষ মানুষ উপসাগরীয় ও পশ্চিমের দেশগুলিতে চলে যাওয়ায় ওই রাজ্যে যে শ্রমিকের শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য উত্তর ও পূর্ব ভারতসহ দেশের বেশিরভাগ রাজ্য থেকে শ্রমিকেরা কেরালার দিকে যেতে শুরু করেন। দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কেরালাতে মজুরি বেশি হওয়ার কারণে সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

সম্ভবত কেরালার পরেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের দ্বিতীয় স্থান হল আমাদের দেশের 'সিলিকন ভ্যালি' বেঙ্গালুরু। বেঙ্গালুরুর জনবসতির ৫০.৬% পরিযায়ী। কেবলমাত্র আইটি সেক্টরের দক্ষ শ্রমিক নয়, এখানকার রিয়েল এস্টেটের কাজ এবং নিম্নমানের পরিষেবার (বাথরুম থেকে নর্দমা পরিস্কার ইত্যাদির) কাজে যুক্ত আছে আমাদের রাজ্যের প্রচুর শ্রমিক।

ছয়ের দশকের শেষের দিকে পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামীণ এলাকার যে পাড়ায় আমার শৈশব কেটেছে, সেখানে ছিল খান চল্লিশেক ঘর। এখন বেড়ে হয়েছে শতখানেক। জনসংখ্যা শ' দেড়েক থেকে বেড়ে এখন চারশ'র কাছাকাছি। ছয়ের দশকে প্রায় সকলে ছিল কৃষিজীবী। তখন ছিল - বড় কৃষক ১টি পরিবার, সাত- আটটি মাঝারি কৃষক,

বাকিরা প্রান্তিক চাষি ও ক্ষেতমজুর। অন্য পেশার মধ্যে একজন অধ্যাপক, ২ জন প্রাথমিক শিক্ষক ও একজন সরকারি চাকুরে ছিল। সাতটি পরিবার থেকে পরিযান ঘটত। এদের তিনটি পরিবারের সকলেই কলকাতায় থাকতেন। কলকাতায় তাদের ছিল ছোটখাটো মুদিখানা দোকান। বাকি চারটি পরিবারের একজন করে কলকাতায় হয় মিষ্টি, নয় মুদি দোকানে বা কাপড়ের দোকানে কারিগর বা কর্মচারি হিসাবে কাজ করতেন। এখন সাত-আটটি ঘর বাদ দিলে বাকি নব্বইটি বাড়ি থেকেই পরিযান ঘটছে। পাড়াতে ২২-৬০ বছর

বয়সী পুরুষের তের-চোদ্দ জন বাদে সকলেই মানে সোয়া' শ' মানুষ পরিযায়ী। এখন বয়স্ক পুরুষ, মহিলা ও স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই সারা বছর গ্রামে থাকেন। পাড়ায় এখন দু'জন ডাক্তার, একজন মাধ্যমিক স্কুলের লাইব্রেরিয়ান, দু'জন প্যারাটিচার। পাঁচ জন মিলিটারিতে আছেন। তাদের সারাদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। বেসরকারি সংস্থায় ভালো মাইনেতে কাজ করে এমন যুবক আছে জনা তিনেক। অর্থাৎ স্থায়ী সরকারি চাকুরি বা উল্লেখযোগ্য স্বাধীন আয়ের দিক থেকে বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। এই পরিযায়ীদের আনুমানিক ৩০% কলকাতা, হলদিয়া অর্থাৎ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। বাকিদের গন্তব্য হল মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা। ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছোটখাটো কোম্পানির কাজ, মিষ্টির দোকানের কারিগর, দোকান কর্মচারি, ব্যাগ-গেঞ্জি— চটকল, প্রাইভেট হাসপাতালে নার্স থেকে সুইপার এরকম নানারকম কাজে পরিযায়ীরা নিযুক্ত।

পরিযায়ী শ্রমিক ও কোভিড ১৯

আমরা সকলেই জানতাম যে বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রামে কাজ না পেয়ে কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু সম্ভবত এটা আমরা জানতাম না যে ওই সমস্ত শ্রমিকেরা বাইরের রাজ্যে গিয়ে কিভাবে দিনাতিপাত করেন। কোভিড-১৯ আমাদের সামনে পরিযায়ী শ্রমিকদের সেই দুর্বিষহ ভয়াবহ জীবনকে সামনে নিয়ে এলো। কোভিড-১৯ যদি না আসতো, যে বঞ্চনা, অপমান আর লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে এই মানুষগুলি জীবন কাটায় সেটি আমরা বুঝতে পারতাম না।

কোভিডের কারণে ২২ শে মার্চ, ২০২০ তারিখে দেশে ১৪ ঘণ্টার কারফিউ জারি হওয়ার পর ২৪ শে মার্চে ঘোষিত হল যে পরের দিন থেকে লকডাউন। এই লকডাউন পেরিয়ে আমদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে ২০২১ সাল পেরিয়ে গেল। এই সময়ে আমরা দেখলাম হাজার হাজার মানুষকে পায়ে হেঁটে শ'য়ে শ'য়ে কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আসতে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে প্রাণ হারালেন কত মানুষ তার খোঁজ খবর রাষ্ট্র রাখেনি। কত মানুষ রোড ট্রাফিক এক্সিডেন্টে প্রাণ হারালেন তারও কোন তথ্য নেই। আমরা নির্বিকার হয়ে বসে দেখলাম - হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মানুষেরা যখন ট্রেন লাইনের উপর বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন তখন তাদের উপর দিয়ে ছুটে গেছে ট্রেন। ট্রেন চলে যাওয়ার পর লাইনের উপরে টুকরো টুকরো রুটির সঙ্গে পড়ে আছে রক্তাক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের দেহাংশ। সাইকেলে চেপে পুরো পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে শ'য়ে শ'য়ে কিলোমিটার পাড়ি দিতে আমরা দেখলাম। দেখলাম - খাবার না পেয়ে, থাকার জায়গা না পেয়ে, পুলিশের লাঠির বাড়ি খেয়েও হাজার হাজার মানুষকে রেলস্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে মরিয়া হয়ে বসে থাকতে। জল কামানের মত তীব্র গতিতে রাসায়নিক জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে পরিযায়ীদের জীবাণুমুক্ত করার নৃশংসতা দেখিয়েছে রাষ্ট্র। গুজরাত পুলিশকে একটি লরিতে ১২০ জন শ্রমিককে মারতে মারতে গবাদিপশুর মত ঠুসে দিয়ে মহারাষ্ট্রের সীমান্তে পাঠিয়ে দিতে আমরা দেখেছি। অসুস্থ মেয়েকে সাইকেলে চাপিয়ে গুরুগ্রাম থেকে বিহারে বারো 'শ কিলোমিটার সাইকেল চালাতে দেখেছি বাবাকে। বহু পরে যখন পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ট্রেন চালু হল, তখন দেখেছি স্বাভাবিক ভাড়ার থেকে অনেক বেশি টাকা দিয়ে খাদ্যহীন, জলহীন, পুতিগন্ধময় শৌচাগারযুক্ত, স্বাভাবিক সময়ের থেকে তিনগুণ চারগুণ লেট ট্রেনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে ফিরতে। উচিত ছিল পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের জায়গায় রেখে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করার। উল্টে তাদেরকে বে-রোজগার করে, আশ্রয়হীন করে খোলা রাস্তায় বার করে দেওয়া হয়েছে। এ সময় এফসিআইতে দেড় বছর ধরে গরিব মানুষদের খাওয়ানোর মতো খাদ্যশস্য মজুত ছিল। কিন্তু রেশন ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে খাদ্য শস্য বিতরণের ব্যবস্থা ছিল নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক। তাই পরিযায়ী শ্রমিকরা যেখানে থাকতেন সেখানে খাবার পাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্য রেশন যদি তাদের থাকার জায়গাতে পৌঁছানো যেত এবং তাদের হাতে কিছু নগদ টাকা দেওয়া যেত, তাহলে তারা

বেপরোয়াভাবে ঘরে ফিরবার চেষ্টা করতেন না। 'দি হিন্দু' পত্রিকা একটা সমীক্ষার মাধ্যমে জানিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের ৯৬ শতাংশ কোন রেশন পায়নি আর ৯০ শতাংশ কোন মজুরি পায়নি। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০-তে শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রী সন্তোষ কুমার গাঁওয়ার জানান যে, রাজ্য সরকারগুলির তথ্য অনুযায়ী দশ মিলিয়ন পরিযায়ী শ্রমিক তাদের বাড়িতে ফিরতে পেরেছেন। পরের দিনই সংসদে তিনি জানান যে, কতজন মারা গেছেন বা কর্মচ্যুত হয়েছেন তার হিসাব সরকারের কাছে নেই। এই হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি সরকারের নিঃস্পৃহতার উদাহরণ। পায়ে হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে বা হাজার হাজার টাকা দেনা করে, যথা সর্বস্ব বিক্রয় করে, সহায় সম্বলহীন, আমাদের রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাস, লরি বা ছোট গাড়ি ভাড়া করে তাদের নিজের গ্রামে বা শহরে ফিরতে আমরা দেখেছি। ফেরার জন্য তারা মৃত্যুবরণ করতেও পিছপা হননি।

৫৪৪৯ জন পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে করা একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে হঠাৎ লক ডাউনের কারণে এদের ৭৩% এর কোন খাদ্য ছিল না, ১২% নিজেদের বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করছিলেন আর ৭% এর কাছে কোন টাকা পয়সা ছিল না।

পরিযায়ী মায়ের প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করে মৃত্যু আমরা দেখেছি।

সমস্ত ভারতবাসী নজর এড়ায়নি যে কেরালা সরকার কোভিড পিরিয়ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তারা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। কোভিড যাতে ছড়াতে না পারে তার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় কোভিড আক্রান্তদের পরিবারে পরিবারে খাদ্য ও ওষুধ পৌঁছে দিয়েছেন বিনামূল্যে।

পরিযায়ীরা কেমন থাকে: কিছু উদাহরণ

সংসারে একটু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ আনার জন্য, সব রকম মানসিক বাধা জয় করে যারা পরিযায়ী হচ্ছে তারা পরিযানের পর সেই এলাকায় দুর্বিষহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির পুরুষদের পরিবারের পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কাটাতে হয়। তারা একাকী বা পরিবার সমেত অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে দিনাতিপাত করেন দিনের পর দিন। কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গাতে বাসা ভাড়া নেওয়ার সামর্থ্য তাদের থাকে না। কাজ করতে গিয়ে স্বচ্ছন্দ পরিবেশ পাওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে প্রতিনিয়ত অপমানিত হতে হয়। এছাড়াও যে মজুরির শর্তে তারা পরিযায়ী হন, অনেক সময়ে সেই মজুরি তারা পান না। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা থাকে না। আত্মীয়-স্বজন পরিবার বন্ধুদের সঙ্গে তারা একেবারেই সময় কাটাতে পারেন না। ফলে তীব্র মানসিক কষ্ট নিয়ে পরিযায়ী হওয়ার পর বেঁচে থাকবার উপযোগী পরিবেশ না পেয়ে তারা অবসাদে ভোগেন সবসময়। ২০১১ সেনসাস অনুযায়ী ভারতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন পরিযায়ী। ভারতের মোট প্রায় ৪৬ কোটি পরিযায়ীর মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি রাজ্যের বাইরে গিয়ে এরকম দুঃসহ জীবন কাটান।

সম্রাট কুরি রাজস্থান গিয়েছিলেন নির্মাণকর্মী হিসাবে। বিকানির গৌহাটি এক্সপ্রেসে ভাইকে নিয়ে ফেরার সময় কোচবিহার জংশনের কাছে টয়লেটে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান। কোচবিহারের পুটিমারি জিপির সুভাষ রায় জয়পুর গিয়েছিলেন। তার তিন মাস বয়সী কন্যাকে দেখার জন্য পরিযায়ী এক্সপ্রেসে আসার সময় তিনি মারা যান। চিরঞ্জিত বর্মনকে রাজস্থান যেতে হয়েছিল। সেখানে তার পিত্তথলিতে পাথর ধরা পড়ে এবং অপারেশনের প্রয়োজন হয়। তার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কাজে লাগানো যায়নি। সে মারা যায়। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ইউনিয়নের পূর্বতন সম্পাদক জমির মোল্লার মতে মুর্শিদাবাদে পরিযায়ী শ্রমিকদের অস্বাভাবিক মৃত্যু বাড়ছে। মুর্শিদাবাদ থেকে সর্বোচ্চ পরিযায়ী শ্রমিকরা যায় কেরালা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে। নানা কারণে হতাশ হয়ে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি অংশ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। বিগত এক বছরে পরিযায়ী শ্রমিকদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার বেড়েছে। ২০২২ সালে ২৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক মারা গিয়েছেন। তাঁর মতে MGNREGA-তে এক শ' দিনের কাজ না থাকাই এর বড় কারণ। যে ঠিকাদাররা পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে যান, তারা প্রাপ্য মজুরি না দিয়ে শ্রমিকদের ঠকান। বর্তমানে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কত আছেন তার কোন পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই। তিনি আশা প্রকাশ করেন - - সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ই-শ্রম পোর্টাল চালু হওয়ায় হয়তো আগামী দিনে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে। তাঁর মতে - শ্রমিকদের পরিযানের কারণে গ্রামের পর গ্রাম পুরুষ শূন্য হয়ে যাওয়ায় নানারকম সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ভগবানগোলার মুরসালিন শেখ যে গ্রামে থাকেন সেখান থেকে কর্ণাটক, কেরালা, বিহার, ঝাড়খন্ড, ইউপিতে নির্মাণ শ্রমিকরা যান। মুরসালিন জানান ঠিকাদাররা নথিবদ্ধ নয়। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে কম্পেনশেসন পাওয়ার সুযোগ থাকে না। কে দায়বদ্ধ তাই পরিবারের লোকেরা জানতে পারে না। উনিশ বছরের ইকবাল হোসেন ৩১.০৫.২০২১-এ মারা যায়। সে ময়লাবাহী ড্রেনের পাইপ লাইনের প্রজেক্টে কাজ করত। সে তার কমপেনশেসন পায়নি।

মুর্শিদাবাদের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলন সেখ। তার বয়স সাতাশ। সে এখন টোটো চালক। বছর পাঁচেক আগে সে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কেরালার এর্নাকুলামে কাজ করতে গিয়েছিল। কোভিডের সময়টা বাদ দিয়ে গত বছর পর্যন্ত সে এর্নাকুলামে যখন যে কাজ পেয়েছে সে কাজ করেছে। কখনো রাজমিস্ত্রির কাজ তো কখনো ইলেকট্রিক মিস্ত্রির হেলপারের কাজ। দিনে মজুরি পেতো ৭৫০ টাকা। তার সঙ্গে কখনো কখনো ওভারটাইম এর কাজও জুটে যেত। তখন দিনে রোজগার হতো ৯৫০ থেকে ১২০০ টাকা। রাতে ক্যাম্প খাটে থাকা আর ভাগাভাগি করে রান্না করে খাওয়া। তার কেরালায় যাওয়ার কারণ হল - মদনপুরে রোজ কাজ পেলেও মাসে পাঁচ হাজার টাকার বেশি আয় হয় না। কিন্তু কেরালাতে সে মাসে ১৪ হাজার টাকা আয় করতে পারে। খরচ বাদে বাড়িতে মাসে ৯০০০ টাকা সে পাঠাতে পারে। ২০২৩-এও পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে

কেরালা গিয়েছিল মিলন। কিন্তু ঠিকাদার তার মজুরি থেকে ২৪,০০০ টাকা মেরে দিয়েছে।

ওই মদনপুরেরই আর একজন পরিযায়ী শ্রমিক বাইশ বছরের যুবক আলাহিম মন্ডল। সে ২০১৯ সাল থেকে এর্নাকুলামে কফি ও ফলের রসের দোকানে কাজ করছে দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরিতে। তাকে বারো ঘণ্টা কাজ করতে হয় দিনে। রাত্রে একটা ঘরের মেঝেতে চার-পাঁচ জনকে থাকতে হয়। তার জন্য এক হাজার টাকা দিতে হয়। তার মতে সে সেখানে ভালই আছে।

মেঘালয়ের ব্রিজ দুর্ঘটনায় আমাদের রাজ্যের কুড়ি জন, ওড়িশার ট্রেন দুর্ঘটনায় রাজ্যের এক শ' জন শ্রমিক মারা গিয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারা টানেল দুর্ঘটনায় আটকে পড়া ৪১ জনের মধ্যে বাংলার ছিল তিনজন। ভিন্ রাজ্যে দুর্ঘটনা সহ নানান কারণে মৃত পরিযায়ীদের দেহ প্রতি মাসে কয়েকটি করে আসতেই থাকছে আমাদের রাজ্যে।

দুই চব্বিশ পরগনার ৭০০ জন পরিযায়ী শ্রমিক যারা পাথরের কারখানায় কাজে গিয়েছিলেন তারা সকলেই কমবেশি সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৫০ জন মারা গেছেন। ১৬ টি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। জীবিতদের মধ্যে ৩৩ জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।

ভারতের প্রথম রেজিস্টার্ড পরিযায়ী শ্রমিক ইউনিয়ন 'ইন্টার স্টেট মাইগ্র্যান্ট ওয়াকার্স ফেডারেশন অফ কর্ণাটক'-এর সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাউ জানালেন - 'পূর্ব ব্যাঙ্গালোরে কুন্দনাহাল্লি অঞ্চলে বাঙালি শ্রমজীবী মানুষের বসতি অঞ্চলে এখন ১০ হাজার মানুষের বসবাস। ২০১১-তে সেখানে থাকতো কুড়ি জন। এই মানুষদের প্রায় সকলেই বাঙালি। এরা র‍্যাগ পিকারের কাজ করে। র‍্যাগ পিকারের কাজ মানে আবর্জনা সংগ্রহ ও সংগৃহীত আবর্জনা থেকে নানান উপাদানকে আলাদা করা। এটি খুব অস্বাস্থ্যকর ও নিম্ন মানের কাজ। ২০১১ পর্যন্ত এই কাজ করতো তামিলরা। কাবেরী জল সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই কাজ থেকে তামিলদের সরিয়ে নেওয়া হয়। সেই শূন্যস্থান পূরণ করে বাঙালিরা। এই সব বাঙালি পরিবারের মেয়েরা শহরের ফ্ল্যাটে গৃহপরিচারিকা বা রান্নার কাজ করে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজও বেঙ্গালুরুতে বাঙালিরাই করে। ধর্মের পরিচয়ে এখানে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠই মুসলিম। একে মুসলিম তার ওপরে ভাষা বাংলা। তাই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার কাজটা সহজ হয়ে যায় পুলিশের। এরা নাগরিকত্বের সমস্ত রকম কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সঙ্গে নিয়ে আসে না। সেটি হয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে প্লাস পয়েন্ট। বিদেশ বিভুঁইয়ে চরম পুলিশি হয়রানির শিকার হয় এরা। এই সমস্ত কারণে কর্ণাটক রাজ্যটি 'দক্ষিণ ভারতের উত্তরপ্রদেশ' হিসেবে শিরোপা লাভ করেছে। যদিও এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই পরিযায়ীদের অতি সামান্য একটি অংশ লুম্পেনদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে নানা কারণে। 'আরবান কোম্পানি' নামে একটি ঠিকাদারি ধাঁচের সংগঠন গড়ে উঠেছে বেঙ্গালুরুতে, যেগুলি নগরবাসীদের ঘরবাড়ি - বাথরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা সহ সবরকম কাজের ঠিকা নেয়। এই কাজ এক একজন শ্রমিক ওই সংস্থার অধীনে একদিনে দু-তিনটি বাড়িতে কাজ করার সুযোগও পেয়ে যায়। তাতে তাদের দিনে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা আয় হয় যা রাজমিস্ত্রির আয়ের তিনগুণ। ফলে এরা রাজমিস্ত্রির কাজ থেকে ঘরবাড়ি বাথরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা থেকে গাড়ি ধোয়ার কাজে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের দিক থেকে এই শ্রমিকদের শতকরা ৯৯ ভাগই মুসলিম।

এই প্রসঙ্গে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার উল্লেখ করি। দেগঙ্গার দোগাছিয়া গ্রামের মিরাজুল কর্ণাটক পাড়ি দিয়েছিল কিছু টাকা জমিয়ে পাকা বাড়ি তৈরি করার জন্য। সে স্বপ্ন তার পূরণ হয়নি - কফিনে বন্দি হয়ে ফিরেছিল তার মৃতদেহ। সে ম্যাঙ্গালোরে মাছ প্রক্রিয়াকরণের এক কারখানায় কাজ করতো। মিরাজুলের সঙ্গে গিয়েছিল আশপাশের গ্রামের আরও চারজন। কারখানার ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু হয় ওই পাঁচ জনের।

বিঘ্নিত হচ্ছে বাচ্চাদের লেখাপড়া

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় - যে সমস্ত পরিবারে বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, সে সব পরিবারে সাধারণতঃ মা মাঠ-ঘাটের কাজে বা অন্য কোন পেশায় যুক্ত হয়ে ঘরের বাইরে থাকে বেশ কয়েক ঘন্টা। সেই বাড়ির শিশু-কিশোরেরা কখনো অভিভাবক হিসেবে দাদু ঠাকুমাকে পাচ্ছে, কখনো পাচ্ছে না। ফলে যত্নের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের শিশু কিশোরেরা অপুষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে দিনের পর দিন স্কুলে না গিয়ে গিয়ে। সেবামিলনী হাই স্কুল বহরমপুর শহরের একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এখানে গৃহপরিচারিকা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের মতো প্রান্তিক মানুষদের ছেলেমেয়েরাই লেখাপড়া করে বেশি। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা অদিতি ভট্টাচার্য উপরোক্ত কারণগুলোর সঙ্গে আরও একটি জটিল ও গুরুতর সমস্যা জানালেন। বস্তিবাসী মানুষদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসার ক্ষেত্রে খুবই অনিয়মিত, অনেক সময় বহু ছাত্র-ছাত্রী বাবা-মায়ের সঙ্গে রাজ্যের বাইরে চলে যায় কয়েক মাস। তাদের বাবা-মায়েরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন্ রাজ্যে কাজ করতে যান। বাইরের রাজ্যে কয়েক মাস কাটিয়ে তারা আবার স্কুলে আসে। স্বাভাবিকভাবেই এই অংশের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়াতে খুব পিছিয়ে যায়।

"অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায়, বিনিদ্র রাত জাগে।"

এটা ঠিক - পেটে ছুঁচোয় ডন মারলে প্রেম জানলা দিয়ে উড়ে পালিয়ে যায়। তাই 'পূর্ণিমার চাঁদ'কে 'ঝলসানো রুটি' মনে হয়। তবুও প্রেম এবং প্রেমজদের জন্য সমাজের কোণে পড়ে থাকা রাশি রাশি মানুষ পরিযায়ী হয়—পরিযায়ী হয় প্রেমজদের মুখে দুমুঠো ভাত, একটু নুন তুলে দেওয়ার জন্য, একটু স্বাচ্ছ্যেন্দের জন্যও। বিদেশ বিভুইয়ে দাঁত কামড়ে লড়াইটা সেই জন্যই। রাগ হলে, মনে দুঃখ জমলে, অভিমানে হৃদয় টইটম্বুর করলে, মুখ থেকে অনাবিল হাসির কথা বেরোতে চাইলে, গলা চিরে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলে

বা 'ও মাঝি রে' বলে গেয়ে ওঠার সময় পাশের মানুষটা যদি সে ভাষা না বোঝে, আবেগগুলোকে স্পর্শ করার কেউ না থাকে, তবে সেটা হয় মরে বেঁচে থাকা। অনেক সময় এভাবে মরে বেঁচে থাকতে গিয়ে অনেককেই চিরকালের জন্য মরে যেতে হয়। তখন দিনের পর দিন বিনিদ্র প্রিয়ার ঘরে এসে পৌঁছায় তার প্রিয়র লাশ। ঠিক তখনই ভোটের অঙ্ক কষে পরিযায়ী প্রিয়ার দিন গুজরানের কোন খবর কোনদিন নেয়নি যে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী-সান্ত্রীরা, তারাই ছুটে যায় সেই লাশের পাশে। ঝরায় কুম্ভিরাশ্রু। আবার একটা কোভিড এলে এটাকেই প্রকট রূপে দেখব আমরা।

দিনের পর দিন পরিযায়ী-প্রিয়াদের 'একা শয্যায়, বিনিদ্র রাত' কাটানো গরিব গ্রামগুলি বছরের পর বছর প্রায় পুরুষশূন্য থাকার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে এখনো সম্পূর্ণ উদাসীন আমরা। অথচ এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অন্য সব বাদ দিলেও এটা দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের শিশু-কিশোরেরা অভিভাবকত্বহীনতায় ভুগছে। ফলে বাড়ছে স্কুল-ছুট বা নামমাত্র স্কুলে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কমছে উল্লেখযোগ্যভাবে। স্কুলে স্কুলে কমছে ছাত্র সংখ্যা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন ফাঁকা থাকছে। আর এত যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে, তার কারণ এটা নয় তো - প্রায় পুরুষশূন্য হওয়ার ফলে গ্রামগুলি হয়ে যাচ্ছে অরক্ষিত?

ঋণস্বীকার:

1) West Bengal 4th in the outbound migration for employment - Saibal Sen (TNN/updated November 3, 2019: timesofindia.indiatimes.com)
2) Exploitation of labour: A Study of Migrant Labours in West Bengal: August 2015, European Research 96(7):470-479 - Sribas Goswami (Serampore college): www.researchgate.net
3) Risk and Vulnerability of Migrant Labours from West Bengal and Their Life Satisfaction during Pandemic Covid-19: A Case Study: Md Mustakim and Woheeull Islam: Asian Review of Social Sciences ISSN 2249-6319 volume 9 No. 2 PP 40-45 November 2020: www.researchgate.net
4) Migration Marathons: 7 Unbelievable bird journeys: www.birdlife.org
5) Www.thehindu.com>news>India>Other States> Over 21 lakh migrant workers from West Bengal Seek registration in State Government portal, 19 November 2023 6) Bengali migrant workers in South India: A Mixed - Method Enquiry into Their Earnings, Livings and Struggle During Covid Pandemic - Monalisa Chakraborty, Subrata Mukherjee and Priyanka Dasgupta: National Institute of Health(.gov) - www.nebi.nih.gov.> articles>PMC 9208344
7) Indian Migrant Workers during the Covid—19 pandemic in.wikipedia.org>wiki>indian_migrant wor-
8) Migrant workers from West Bengal since 1991 From the Left to TMC government - Avijit Mistri: Economic & Political Weekly vol-56 issue 29, 17 July 2021>www.epw.in> journal>commentry> migrant.
9) মুর্শিদাবাদের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাজমুল হক, মদনপুর গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক মিলন সেখ ও আলাহিম মন্ডল।
10) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার বিভীষণপুর গ্রামের ঝর্নারানী সামন্ত ও প্রভারানী সামন্ত।
11) সেবামিলনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা অদিতি ভট্টাচার্য।
12) Facebook, বাংলা যুগান্তর 14.03.2022: মাশুল সমীকরণ নীতি, পর্ব-2: ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ রনজিৎ রায়

THE HISTORY OF KOLKATA PORT AND THE HOOGHLY RIVER AND ITS FUTURE

(135th Anniversary Lecture of the Port Trust)

Barun De

1. The Pre-Port Anchorages :

The first docks in the city were moorings on the east bank of the Hooghly River, far to the north of the present Dockland. The earliest were in north central Calcutta, what used to be called, three hundred years ago, Dihi Kolikata and Bazar Kolikata around Lal Dighi (later known as the Great Tank and briefly for about hundred years, only Dalhousie Square), now, B.B.D Bag. These

two villages close to the Hooghly Bank were incidentally not the spot where Job Charnock landed – he landed further north at Sutanuti to which his pilot steered him by an ancient banyan tree in Ahiritollah Ghat or a ghat nearby. Charnock lived and died in Sutanuti -- only his remains were removed later to the grave in St. John's Churchyard near Lal Dighi.

I was interested to find in a recent Commemorative Volume, published by the Port Commissioners, an article by Shri P. Thankappan Nair, the chronicler of the Calcutta streets and early British inhabitants, which says – without any reference or footnotes – that originally there was a creek, that ran along the side of the old Fort William. He says that in 1712, a dry dock was constructed which "was not equipped for warships and the Dalhousie tank was converted into a wet dock with facilities for launching vessels''. Apart from the solecism of attributing Lord Dalhousie's name to the place long before Dalhousie was born, Shri Nair proceeds to tell us that this wet dock conversion took place at Colonel Clive's suggestion in 1759 after the Battle of Plassey. He says " the Bankshall, Marine Store Yard and the dry dock erection in 1716 were situated (at a) site now occupied by the Bankshall Street, Bankshall Court" etc. [1]. He tells us all these were removed in 1808. We have not been favoured in this article by any means of checking these facts, beyond the solecisms mentioned. Prof. Satyesh Chakraborty, in his introductory lecture last year, referred to the Bankshall docks and canal as a known fact. We need to know the exact archival references. In their absence, let us hypothesise that in the early eighteenth century, the East India Company converted the Lal Dighi area into docks with a canal running towards the eastern levee that bounds the Hooghly east bank.

In the early eighteenth century, the Hooghly river always had distributaries running east towards the Sundarbans through, what is today, Kolkata. The old dried up bed of the Saraswati channel through eastern Howrah District used to flow across the present Garden Reach South-east, what is now the Adi Ganga channel. North of it, was a creek that does not exist any more, through the area south of Chittaranjan Avenue and Bowbazar, whose memory still remains as Creek Row, the narrow canyon of very old houses between Azad Hind Bagh and Entally. It used to be recalled in the books of the early twentieth century about old Calcutta history that in the early eighteenth century, boats were stranded here in a cyclone in the locality called Dingabhanga (broken skiffs). In fact, the East India Company's settlement itself changed the course of the Hooghly River : "the sinking of the (ship Royal) James and Mary in 1696 and the formation of the Sumatra Sand resulted in the gradual formation of sandbanks on the left bank. The river withdrew from the left to the right bank, throwing (sic) the large chunk of land called the Strand … The construction of the Strand Road was taken up by the Lottery or Calcutta Improvement Committee in 1820 and the shipbuilders of Clive Street were obliged to shift their establishments to Howrah. The Strand Bank lands from Chandpal Ghat to Ahiritola were leased to the Port Trust on its formation by the Government in perpetuity" [2].

The southern distributory is known as Tolly's Nullah at the point of its link with the River. Major Tolly was a Briton, who according to the histories, was the first person to think of building docks here. He "dug" - or perhaps only widened for navigation – the old creek, which takes off from where the old Saraswati is presumed to have lost itself on the north bank of the River, where today it runs towards the north base of the Zoological Gardens then under a bridge and then the Taj Bengal Hotel and the Presidency Jail. He was not able to complete new docks. Another attempt was made by one, Colonel Watson who founded a marine yard in what is now called Kidderpore. The actual docks were, in

what was called after him, Watgunge, now a street leading to Dock no.1, where he launched three beautiful vessels. After he retired, the sons of the Company's Chief Engineer, Col. Kyd, took up the work and are commemorated by Kidderpore Docks [3].

2. The Strand Waterfront :

The point being made is that the earliest Calcutta Port was the Strand Bank; then Watgunge was followed by the decisive southern end shift along the broadening bends of the Hooghly river. A folding map at the back of the basic source book of Calcutta Port history, Prof. Nilmoni Mukherjee's concisely excellent Short History (1968) gives a pre-independence listing of the shifting expansion of jetties and moorings, ruins of which still exist(on either side of the southern Ghats of the River) – from where the Customs House stands (on the site of old Fort William) through the Calcutta and the Hastings Moorings, till just ahead of Tolly's Nullah [4]. When I was a boy about the time of the Second World War, my father would drive my mother and me in his old Austin 12 to the Strand for a walk along the still unfenced river path. He would park at a place, I was surprised to learn some Port Trust people have already forgotten (perhaps because the Marine Headquarters has enclosed it), in front of the Lascar Memorial, commemorating the Indian seamen who took part in the First World War. This should be protected as a heritage monument in the same way INTACH, in the 1990s, restored the Prinsep Ghat nearby. Near it is the old Takta Ghat (plank landing stage) where I remember till early Independence days (if I am not incorrect) the good ship Maharaja used to dock ferrying people to and from the Andaman Islands (occasionally to the Penitentiary there). That anchorage too has now shifted south to Kidderpore Dock No.1. All through the Second World War and till the 1950s, from Man of War Jetty to Outram Ghat, there would be ships at moorings filling the River.

I often wonder what happened to them. Why did they suddenly disappear in the Fifties and Sixties. By that time, you could get a clear view across to the dead, graying derelict buildings on the Howrah side of the river. I am told that one of the reasons, (and I presume the only big reason), was that all along the river, behind the jetties, particularly on the Howrah side, where after the Bengal Partition of 1947, there was a slump in the inputs of factories, jute mills, principally along the Foreshore Road and then on the other side of Howrah Station at a place which I have very pleasant memories of, the Golabari, the long black godowns of Howrah, just ahead of Salkia. In the 1950s, friends of mine, Sambit Chatterjee and his

younger brother, later the eminent actor Soumitra Chatterjee, used to live with their father who was the head of the salt 'gollahs'. The salt would be unloaded in the GOLABARIS. Then jute would be loaded on the cargo boats and there were tea sheds also. These were commodities which suddenly slumped after the Partition that the British imposed on India as their price for independence.

Apart from the many natural causes - first of all, apart from the siltage of the river, one of the big blows to Kolkata as a port, (I am now not talking about Haldia) was the blow given by the second Partition of Bengal. Whatever happened to the jute industry, at any rate, it shifted towards Narayangunj for several years. The salt trade of the river was felled by a shift in the policy of transportation according to which, it moved from river to rail, so that rail transportation took the river's place for the big movements of salt. The anchorages of the Strand Bank jetties disappeared after the first half of the twentieth century. The active port moved South in the second half. Only the Customs Warehouses, some disused jetties, and the later wall of the circular railway remain as mute testimony of a waterfront that was.

As regards tea, we know the history. The creation of East Pakistan and then its secession into Bangladesh

meant that the traffic down the Brahmaputra – Yamuna system to Goalundo and then through, as the Inner Channel or even the Outer Channel through the Sunderbans, going past Khulna towards Barisal. This was completely disrupted, throwing out of gear companies like the Rivers Steam Navigation Company.

The independence of Burma, which came at the same time from the British Empire, only solidified what had begun in 1935, when Burma was made a Crown Colony outside the scope of British India's purview. This meant,

of course, difference in the pattern of the rice trade which had been initially disrupted in the Second World War and which now was consumed by the home market of Burma. This meant a complete disruption of the Rangoon–Kolkata Port links. In general, there was an obsolescence in the traditional industries of Bengal. Industries which had not been very much capital forming, industries which had been based indeed on very considerable exploitation of primary producers, whether the tea garden labour or the jute cultivating peasants of East Bengal or the coal industry, were then in a dismal condition of crisis. But for whatever value they had, they had created the pattern of the base of the industries of Bengal on which there had been reared a certain structure of engineering, related largely to the Railways, but also to the Port and to the industries of the northern suburban, in machine tools, in mechanical work. On the other side of the river from Kolkata and Howrah, the clang of tools could be heard, as one came from Dasnagar to Ramrajatala into Howrah Station. This stretched up to the very famous machine tool workshops of Belilious Road and similar areas of Howrah.

The Partition imposed on West Bengal had "over determined" the regional imbalance by taking away the jute industry, creating transport problems for the tea industry and truncating the ports of Bengal, so that Khulna and Chittagong were lost as supplements to Kolkata Port. A large number of ports on the West Coast of India, as well as Visakhapatnam, as well as the newer and smaller port of Paradip, came up and developed in terms of equality of market choices. And then there was the transformation of cargo boats to flatter, broader bottoms to permit containerization. This precluded upriver navigation and called for broader estuarial ports. As a result of this, and along with a general attack on Kolkata in terms of the historical developments, there was a particular sort of shift from Kolkata. The condition of the port has to be seen as a part of the condition of Kolkata as a whole.

I wouldn't go so far as to support a metaphor that Dr. Pratap Chandra Chunder has made, in his wisdom, in Dr. Satyesh Chakraborty's compilation on 125 years of Kolkata Port in the first article. He says that the port and the city were Siamese Twins.[5] I don't know about that. It is certainly true that when the Port Trust was set up, for the first two years, the idea was that it would be run by the Municipal Corporation. It was only by special legislation that the Port Trust was then set up with its own purposes in view.

However, between 1947 and the revival of the Calcutta dockland in the recent decades, the port reflected the general lack of faith of the city in its own future.

Kolkata is a set of anchorages which have moved southwards – all the way from the Customs House to the Screw Pile Jetty Area, to what I used to know as King George's Dock, but I now find that according to our usual practice of heaping all the name changes on one or two devoted figures, King George's Dock is now called Netaji Subhas Dock – we have an amplitude of Netaji Subhas transportation terminals in our city. It is only a logical development as has been said before, today, that the port is shifting itself towards Haldia and in an attempt to obviate what people call "the bends, bores and bars" of the river, the shift will finally take place according to

projections, to Diamond Harbour and even further southwards towards Saugor. The point still remains, these are all anchorages of a relatively new river course in a process of change and decay; how does one handle that aspect?

3. UPSTREAM FROM THE ESTUARIAL REACHES :

I am addressing myself to a particular question, Dr. Ashok Mitra raised. Let us look at Calcutta, for hypothetical purposes, as distinct from Haldia. The glory of the last two or three years, the remarkable and laudable change that has taken place in the river borne traffic of Kolkata includes the fact of the existence of Haldia. In fact, the development of Haldia as a sea port has made it easier to focus on the renovation of work in the Calcutta Dockland, on upriver traffic into the city and to rail and road terminals taking goods further inland. Supposing one leaves the seaward, southward, shift out, is there any possibility of reversing the trend, according to which, in the 1970s and 1980s, we thought of the decrepitude of Kolkata itself as a port.

Hydrographically speaking, the Hooghly river should be seen as distinct from the Bhagirathi. We learn in school, we teach our children that ***Hooghly Bhagirathi ekee nadeer naam.*** (**Hooghly Bhagirathi, they are names of the same river**). There is some material in two articles in the Commemorative Volume edited by Dr. Chakraborty to lead us to look at the upper (**Bhagirathi**) and the lower, estuarial reaches of this river as a case of amalgamation of the Bhagirathi, the Damodar and the Rupnarayan, sometimes before the Europeans navigated it for their trade.[6]

D.M. McDowell, who served as Chief Hydraulic Engineer of the Port Trust and was later Prof. Emeritus of Hydrology in Manchester has shown in detail that the Bhagirathi, as a distributary of the river Ganges, got entangled with what is known as the Nadia river system – the Mathabhanga and the Jalangi, lower distributaries, all of which had tied up together and gone in for river capture in a big way, as happens in estuaries and deltas. This river capture between Murshidabad and Ranaghat has meant that the flow of the Ganga is depleting and has led to the Bhagirathi itself being a very narrow river. How narrow I recall, seeing with horror and surprise, about forty two years ago in 1963, when I had occasion to lecture in the Berhampore Krishnath College. I was taken by rickshaw to Murshidabad to see where the later Nawabs used to live. If you go to Hazar Duari, the big 19th century palace and you walk past it to the river, you will find the Bhagirathi flowing past ; the great river beside whose mammoth bends I had grown up, was just a narrow little nullah which flowed roughly from this table up to the wall there. A veteran jumper could pole-vault across the Bhagirathi there: the water level was very low. I don't know what the situation is now, but I doubt if the Bhagirathi has really broadened.

McDowell makes the point that south of Kalna, the river broadens out and where it flows past, what used to be Adi Saptagram, past what still at Bandel remains a church. Bandel is the Portuguese corruption of Bandar of Hooghly. I imagine that the tides do not come up to Hooghly, any more, I am sure, but pretty much up the river. The tidal portion of this estuary of the Ganga is quite different in its development, its pattern, and its morphology.

I imagine this is due to the rivers on the west bank of the Hooghly – the Ajoy and the Mayurakshi, which comes down near Katwa then the Saraswati which lost itself in the Amta area in Howrah (and of which the Adi Ganga, east of the Hooghly may be a remnant), and finally the Damodar, which in early mid-20th century near Amta in Howrah District used to be called "Kana Damodar" below Uluberia when, in the 1930s and early 1940s, we crossed it, going along the Bengal – Nagpur Railway Line. Today you can hardly see the Kana Damodar, probably now a ditch. Then there are the rivers Mundeswari, and Rupnarayan which river-captured the Damodar and dried up the whole swampy

tract of Howrah and southern Hooghly districts.

It is significant that many of the great bars that make pilotage on the Hooghly, such a tricky and technical business, have been created perhaps because of the inflow of silt from these lower tributaries of the Hooghly. I am told that even in Haldia, the Nayachar, that is coming up is being created by the inflow of water, from the Haldi river.

4. ROAD – RIVER COMPLEMENTARITIES:

Is it not necessary for us to think of a transportation model which includes a massive increase of traffic from the north bank of Ganga, all the way from Basti, Baraich, and Gonda in Uttar Pradesh through Muzaffarpur and Mithila which crosses by the bridge over the Ganga, to the east of Patna. Improvements are necessary in goods movements to and from North – East India and more traffic from the Himalayan states. This of course takes us into the realm of political decision in an arena that is specifically uncertain, since we have, not to put it too exaggeratedly, a most unnatural dynasty in Nepal which has massacred most of its kin and embattled large segments of its democratic as well as backwards/ underclasses. We

cannot exclude the possibility of political uncertainty, the lack of political stability, hampering the sort of economic development that had begun in Nepal and that has begun again to be a bit wary, given the development of violence along the Terai region of Nepal. One always takes note of uncertainty when one thinks of any pattern of development.

It is just the point that if Kolkata Port has to develop its landward connectivities, then it will have to think not only of the tremendous development of containerization, ease of movement, shortening of turn- around-time, better clearing facilities. All these exist, they have taken place yet a long-term planner's horizon has to move further from that. Whatever the southward movement, whatever the movement seaward and shipping improvement, Kolkata, as distinct from Haldia, will never again compete with Colombo or Singapore. There is a certain limit to the capacity of even a tidal river port, as compared with the open sea ports of the West Coast or even of Vishakapatnam or, on the other hand, the ports in the Kra Isthmus, and Malaysian Peninsula.

Planning for improved hinterland distributary networks for Kolkata Port one has to think, not only of the development or rather re-establishment of river borne traffic but of the development of road-rail- river co-operation, a co-operation that does not neglect the point of the principal advantage that Kolkata Port has suddenly rediscovered with the switch to containerization, the renewal of access to the commodities of the Indian Ocean that Trincomalee, Vizag and Singapore link it up with. This is the model in which the thinking must go forward. It has to be a model of sea-river- transportation highway co-ordination and co-operation in what is coming to be known as the BIMSTEC[7] area compassing the Eastern, South Asian and the Western South-Eastern nations around the Bay of Bengal, the Malacca Straits and the South China Sea. We have to think, not just in terms of competition for markets but of road-water route co-operation.

5. A DIGRESSION: PRESERVING PORT HERITAGE :

I would like to take your indulgence to move away from the essentials of port clearance to a point, which may be a trifle esoteric but of which I have some more knowledge; of preservation of the heritage of the old elements within the Calcutta Port Trust area. When a KMDA Committee in 1997-98, of which I happened to be Chairman, was listing Heritage Buildings of Kolkata, that were later notified by the Kolkata Municipal Corporation, our Committee's report to Government said that the Port Area should be listed as a Heritage Zone. When you list some part of a city as a Heritage Zone, it does not mean that that you cannot redevelop within it. It only means

that it would be useful if specifically all old buildings of any significance vis–a–vis architecture, vis–a–vis aesthetic beauty and environmental health and also vis–a–vis relationship with eminent personalities are listed, described and photographed and maintained as far as possible, as they were. It means that a category be imputed to such buildings 'A' or 'B' class, i.e. higher preservation necessity and lower preservation necessity. It means that these categories should be respected when development goes on, at least by maintaining the outer facade.

I am sorry to say that the Kolkata Municipal Corporation Heritage Committee, of which I have been a member since its inception, did very little except considering applications for de-classification of buildings or sanctioning a few projects for re-use for commercial profit. It is still open to other bodies to begin exemplary action in this regard. The Port Trust, like the Railways, the Police, the Posts and Telegraphs, the Army have a tradition of being cognate organizations that have preserved their heritage buildings. I am sure that the residential bungalows in Portland Park and the mansions in Remount Road deserve preservation, in one way or another, as the buildings of the old Bengal – Assam Railway quarters in Belvedere Park on Belvedere Road deserve similar preservation; or the South-Eastern Railway the historic buildings in Garden Reach, such as the Bengal Nagpur Railway's Agent and General Manager's Bungalow, (inhabited once by Lord Inchcape of Mackinnon and Mackenzie) or the Godfrey Mansions I and II, all remarkable examples of mansion buildings in old colonial Calcutta. The Postal authorities too are trying to show off some of their old post offices in the city. I am sure that Kolkata Port Trust can do something in this direction.

Having been taken recently to visit Netaji Subhas Dock, I came across the old Clock Tower, a very elegant piece of architecture that could easily beat the Ghantaghar of Allahabad, in terms of beauty. People, thirty years ago, used to talk of the Ghantaghar only when they went to eat grimy kebabs there. No one really takes notice of the Clock Tower which was used to keep work time for the whole of the old King George's Dock. There is a notice affixed to it, difficult to read; or at least my eyesight is bad but others also found it difficult to read, it is so high up. Some clear signs along the older buildings, marking their original significance, would be interesting. The port has some of the fine old red brick buildings that were once the hallmark of old Calcutta. Most of the red brick buildings, including the one in which I was born in the then lovely Theatre Road, had been pulled down to build the very ugly present Shakespeare Sarani. At least some of these old red brick buildings in Dockland could be identified, placarded and treated with whatever care or concern that the Port Trust believes that they deserve.

I remember feeling very sorry about ten or fifteen years ago, when I was approached by the then River Surveyor, who told me that he had under his care some of the very old, beautifully painted, river maps of the Hooghly. It was suggested to him at that juncture that he could work through the Victoria Memorial for their good preservation, because they seemed to be in a state of decay and these were very valuable maps of the Hooghly . The Hooghly may have changed its course since then, shoals may have developed, but these were historical records of 18th and 19th century cartography which certainly deserved preservation. But then the Chairman of that time decided the Victoria Memorial need have nothing to do with it. The Port Trust should look after its own materials. I wonder whether these maps have retained interest of those who are now concerned with the history, either of cartography or of the river. A easily accessible volume of full reproduction could be entrusted to expert bodies like INTACH's Calcutta chapter, which is now sponsoring an excellent guide to Calcutta's heritage buildings.

In many old institutions of imperial vintage such as the Port Trust, there are many elements which deserve commemoration. The other day, in Netaji Subhas Dock, the officer who very kindly showed me around, showed the area where the ships enter the dock from the river, where the Lockgates are. Pointing at the brickwork on either side of the Lockgates, he said, ' Sahebra ei dharaner jinish kore giye chhilo, amra parbo kina janina, tobe amra samprati ei dharaner jinish tairi korini' (The British made these sorts of things, I don't know if we will be able to

repeat them, but we have not recently done so). Of course, we can do it but why not preserve what was done earlier, no matter whether the Sahibs made it or the non - Sahibs made it according to Sahebi technology. It is always good to plan for the future but quite often, when we plan for the future we write an old history which we then forget.

I wonder if there are any among you who have read Dr. Nilmoni Mukherjee's very lucid, panegyric of the way the Port was built which he wrote about thirty five years ago and which the port itself sponsored. All I am asking for is to keep note of the past, and on the basis of the constraints of the past, work out what is feasible for the future. That feasibility requires research and planning but it also requires a certain courageous vision, a vision which will be broad and which will take into note the fact that our futures are not statically fixed, that there are going to be changes. The point is, from what base line and how do we visualize those changes and what part does the Port Trust itself think will be played by Kolkata Port in those changes, as you visualize them over the next twenty years. Or will it merely rest on the laurels that Haldia and containerization, as well the lack of necessity to bother about river traffic movement as much as before, have gained it in the last twenty or thirty years?

Prof. Barun De (1932-2013) was an eminent historian. He was ex-Prof. Indian Institute of Management, Kolkata; Founder-Director, Centre for Studies in Social Science, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies; Member, Indian Council of Historical Research and Vice-President of the Asiatic Society, Kolkata. He authoered several books.

[Courtesy: Kolkata Port Trust & Kanad Ray]

জলে ডুবে মৃত্যুর শীর্ষে সুন্দরবন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৩টি ও উত্তর ২৪ পরগণার ৬টি মোট ১৯টি ব্লকে ২০১৫-'১৯ অবধি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় ২৪৩ জন এবং পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সীদের মধ্যে প্রতি লক্ষে ৩৯জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে যা বিশ্বের মধ্যে শীর্ষে। অন্যদিকে কোভিডের মধ্যে শিশু পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুপাত্র দিল্লিতেই ৫৮% বৃদ্ধি।

অপরিচ্ছন্নতায় এগিয়ে

- ২০২৩-এর নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ' রিপোর্ট অনুযায়ী এক লক্ষর বেশি জনবহুল দেশের সবচাইতে অপরিচ্ছন্ন ১০টি শহর পশ্চিমবঙ্গে। যার মধ্যে কলকাতা রয়েছে। হাওড়া সবচাইতে অপরিচ্ছন্ন। অন্যগুলি হল ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, বিধাননগর, রিষড়া, আসানসোল, কৃষ্ণনগর, মধ্যমগ্রাম ও কল্যাণী
- গঙ্গার তীরবর্তী সবচাইতে অপরিচ্ছন্ন ১০টি শহরের নয়টিই পশ্চিমবঙ্গে। হুগলি-চুঁচুড়া, উলুবেড়িয়া, গয়েশপুর, ডায়মণ্ডহারবার, হাওড়া, কামারহাটি, চাকদা, হলদিয়া ও ধূলিয়ান

জরায়ু-মুখের ক্যানসারের টিকা

প্রতিবছর দেশে এক লক্ষের বেশি নারী জরায়ু-মুখ ক্যানসারে আক্রান্ত হন। প্রতি বছর জরায়ু-মুখ ক্যানসারে মৃত্যু হয় ৫০ হাজারের বেশি রোগীর। মহিলাদের মধ্যে স্তনের ক্যানসারের পর সবচাইতে বেশি হয় জরায়ু-মুখ ক্যানসার। সারা বিশ্বে জরায়ু মুখ ক্যানসারের এক চতুর্থাংশ ভারতীয়। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এই ক্যানসারের কারণ। নয় থেকে ১৪ বছর বয়সী মেয়েদের ছ-মাস অন্তর দুটি ডোজে এর টিকাকরণের ভাবনা চিন্তা চলছে।

ব্রিটেনে চারশ পার, ফ্রান্সে ত্রিশঙ্কু

বিপুল ভোটে জিতে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের ২০ মাসের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৪ বছর পর কিয়ের স্টার্মারের নেতৃত্বে ক্ষমতায় এল লেবার দল। ৬৪৯টি আসনের মধ্যে তারা পেয়েছে ৪১২, কনজারভেটিভ ১২১, লিবারেল ডেমোক্র্যাট ৭১, ও অন্যান্যরা ৪৫ আসন। ইউরোপীয় ইউনিয়নে দক্ষিণপন্থীরা ভাল ফলের পর ফ্রান্সে নির্বাচনে প্রথম দফায় এগিয়ে যায়। অন্তিম পর্বে বাম ও মধ্যপন্থীরা জোট করে তাদের আটকায়। ৫৭৭ আসনের মধ্যে বাম 'নিউ পপুলার ফ্রন্ট (NFP)' ১৮৮, মধ্যপন্থী 'এনসেমবল' জোট ১৬১ এবং দক্ষিণপন্থী 'ন্যাশানাল র‍্যালি (RN)' ১৪২ আসনে জয় লাভ করে।

অন্য ভুবন

‘একজন আরবকেই সে গুলি করতে গেল কেন’ ?

নাসির আহমেদ

বন্ধু সৌরভ ঘটকের অযাচিত আত্মকথনে শিরোনামের ঐ প্রশ্ন এ লেখার প্রেক্ষিত।

যাদবপুরের পিজি হোস্টেলে ক্যান্টিনের কর্মচারি ছটফটে, ছিপছিপে রকেট নামের ছেলেটি ডাইনিং হলে বিকেলের চা, বিস্কুট দিয়ে গেল। বন্ধু পার্থ পান্ডা, দাউদ হায়দার, সৌরভ ঘটক—সকলেই সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র। নীরব চা-এর চুমুকে ভেসে উঠেছে ঐ দিনের আমাদের ক্লাসগুলির খণ্ড খণ্ড স্মৃতি। ইউরোপীয় সাহিত্যে অ্যাবসার্ড থিওরি বা নিরর্থকতাবাদ ও existentialism—অস্তিত্ব বাদ তত্ত্ব আমাদের বিমূর্ত ভাবনায় মজে যাওয়া মনের প্রায় সমগ্রটা অধিকার করেছিল সেই দিনগুলিতে। এক দশক আগেই ১৯৬৯ এ ফরাসি আইরিশ নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট তাঁর Waiting for Godot নাটকের জন্য নোবেল পুরস্কৃত হয়েছেন। যে জগতে মানব অস্তিত্ব তাৎপর্যহীন, ভাষাও যেখানে অর্থ হারিয়ে সার শূন্য সংলাপে পর্যবসিত, এমনই নিরাশ্রয় পৃথিবীতে বেকেটের নাটকের দুই ভবঘুরের সমর্পণের আশ্রয় গোদোর বা God এর --ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্তির প্রতীক্ষা নিষ্ফল হয়েছে। মনুষ্য জাতির এই উদ্ভট, নিরর্থক অস্তিত্বকে কোনোভাবেও তাৎপর্য দেওয়া যায় না—এমনই নতুন প্রবাহিত তত্ত্বে তামাকের মতো আগ্রহ আমাদের—সেদিনের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। জীবন যেন ছিল বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের ভাবনার মতো। সেদিন অনেকের অন্বিস্ট ছিলনা বাণিজ্যিক সাফল্যের জীবন । দুনিয়া পাল্টে দেওয়া বিপ্লবের স্বপ্নের পালেও হাওয়া ছিল স্তব্ধ। ‘ বিপন্ন বিস্ময়’ তখন আমাদের অন্তর্গত রক্তে খেলা করেছিল । আমরা সকলেই ছিলাম এক একজন সমাজ বিচ্ছিন্ন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’।

আলবেয়র কামু

ক্যান্টিনে কথা হচ্ছিল ফরাসি লেখক, নিরর্থকতা তত্ত্বের আলবেয়র কামুর দ্য স্ট্রেঞ্জার উপন্যাস নিয়ে। বাংলা, ইংরেজি, কম্পারেটিভ লিটারেচার - সব বিভাগেই কামুর লেখা সিলেবাসের বাইরে যেন অবশ্য পাঠ্য। ক্রমশ অপসৃয়মান বিকেলে সিনিয়র বন্ধু সৌরভের জানালায় চেয়ে উদাস আত্ম জিজ্ঞাসা : ‘নায়ক মেরসল্ট কেন একজন আরবকেই গুলিতে হত্যা করলো? অথচ সে অপরাধে নায়ক শাস্তি না পেয়ে তার মায়ের মৃত্যুতে ক্রন্দনহীন ও স্বাভাবিক থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।’ জুরিদের বিচার তাকে গিলোটিনে পাঠিয়েছে আরব ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য নয়, যতটা তার মায়ের মৃত্যুতে নির্বিকার থাকার জন্য।

বন্ধু সৌরভের স্ব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ইঙ্গিত আমরা ধরতে যাই নি। একজন ফরাসি আলজিরিয় যুবকের অন্য ধর্মাবলম্বী আরব ব্যক্তিকে গুলি করার পিছনে জীবন সম্পর্কে নায়কের উদ্দেশ্যহীন, তাৎপর্যহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসকেই কারণ মনে করেছিলাম। যদিও সৌরভের প্রশ্নে আরব ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও নিজের ধর্মীয় পরিচয়ে ঐক্য আবিষ্কার করে বিচিত্র অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম, তবু ঐ প্রশ্ন আমাদের কাছে ধর্মীয় নয়, ছিল আত্মিক সংকট জাত। যুক্তির সমর্থনে অন্যতর কারণ বইয়ের পাতায় আমরা কৃমির মতো খুঁটে খুঁজেছিলাম ।

উনিশ শতকে এনলাইটমেন্ট বা যুক্তির যুগ থেকে সকল বিশ্বাসের প্রতি যে আঘাতের শুরু আর ঐ শতকেই দার্শনিক নীৎসের ‘ঈশ্বর মৃত’- এই বিস্ফোরক ঘোষণা ইতিমধ্যে মুক্ত বুদ্ধিকে দিয়েছিল অবিমৃষ্য স্বাধীনতা। পরবর্তী শতকে দুই মহাযুদ্ধের সময়ের বর্বরতা, জাতিহত্যা, ধনতান্ত্রিক পশ্চিমি সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা, বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল মানুষের মনে সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত আদর্শের প্রতি ছিল ব্যাপ্ত অনাস্থা । সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে নানা সামাজিক ও আত্মিক জটিলতায় আবিল মানুষের কাছে নিরর্থক জীবন শূন্যতা বোধে আক্রান্ত। সমস্যা ও দুঃখ ভরা জীবন কার্যকারণ সম্পর্কহীন আর নৈতিক ব্যাখ্যার অতীত। কামুর অবাস্তবতাবাদ তত্ত্ব এই ধারণাকে ভিত্তি করে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর ‘দ্য স্ট্রেঞ্জার-’ ‘অপরিচিত’ উপন্যাসে অকারণ প্ররোচনায় একজন আরবকে গুলি করা হত্যাকারী নির্বিকার চিত্ত নায়ক আমাদের কাছে ছিল অর্থহীন অস্তিত্বের বিশ্বে এক আপতিক বিপথগামী চরিত্র। এর অতিরিক্ত কিছু নয়। এই হত্যাকান্ডের পিছনে কামুর কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল কিনা আমরা ভাবতে যাই নি। সাম্প্রতিক কালে অভিযোগ উঠেছে, কামুর লেখায় অসঙ্গত, উদ্দেশ্যহীন মনুষ্য জীবনের সমস্যা আদপে সাদা ককেশীয় ইউরোপের দর্শন ও সংস্কৃতির সংকটের কথা—যেটা ছিল কামুর উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইউরোপের ককেশীয় জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করা ধ্রুবক। আর এই বিশ্বাস থেকে জাত বর্ণবৈষম্যবাদের এক স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। কামুর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অভিযোগ তাই মুখ্যত রাজনৈতিক।

কামুর জীবন ও সাহিত্যের পর্যালোচনা করলে একটি ধারণা স্পষ্ট হয়, তিনি জন্মভূমি আলজিরিয়াকে ভালোবেসে ছিলেন মন্ত্রোচ্চারণের মতো—দেশের প্রতি আবেগ ও মমতায় সারা জীবন ভারাক্রান্ত ছিলেন। তাঁর চিন্ময় সত্তা তাঁর লেখায় আলজিরিয়ার জন্য সমর্পিত ছিল । ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে জীবনের অধিকাংশ

সময় প্যারিসে কাটালেও কামুর গল্প উপন্যাসের পটভূমি মুখ্যত আলজিরিয়া। ১৮৪৮ সালের সংবিধানে আলজিরিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ হওয়ার পর থেকে এক তিক্তকর শতবর্ষ কেটেছে ফ্রান্সের আগ্রাসন ও আলজিরিয়ার প্রতিরোধের যুদ্ধে আর স্বাধীনতা এসেছে রক্তক্ষয়ী (১৯৫৪--৬২) ফ্রান্স-আলজিরিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তিতে। প্রায় সমান্তরাল ইতিহাসের ঘটনায় প্যালেস্টাইনের ওয়েস্ট ব্যাংকে ইসরায়েলীদের বসতির মতো ফ্রান্সের নাগরিকরাও আশ্রয় নিয়েছিল আলজিরিয়ায়। শুধু আজও প্যালেস্টাইন স্বাধীনতার প্রতীক্ষায়।

কামু জন্মেছিলেন ছোট আলজিরীয় শহর মণ্ডভিতে ১৯১৩ সালে। মেধাবী কামু আলজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র ছিলেন। আজীবন বামপন্থী, স্বঘোষিত 'নৈতিক' কামু বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির নৈতিক অবস্থান সুবিধার আশ্রয় নেওয়া প্রায়োগিক রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। তবু কমুনিস্ট কামুর সংঘাত হয়েছে সমকালের রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের সঙ্গে। মার্ক্সবাদী লেনিন তত্ত্ব ও স্তালিনের 'স্বৈরতন্ত্রের' তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছেন। এমনকি মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বও তিনি খারিজ করেছিলেন। রাশিয়ার কমুনিস্ট রাজ্যপাট প্রসঙ্গে যুযুধান তর্কে বন্ধু সার্ত্রের সঙ্গে কামুর বারংবার মতান্তর হয়েছে কখনো দীর্ঘ হয়েছে মনান্তর। কামু নীতিগত ভাবে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, তবে তিনি স্বাধীন আলজেরিয়া চেয়েছিলেন 'ভূমধ্যসাগরীয়' উদারবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হয়ে বহুত্ববাদী ও বৈচিত্রময় সমাজের দেশ হোক—ধর্ম অনুশাসিত জাতীয়তাবাদী আরব ভূখণ্ড নয়। কামু ১৯৬০ সালে মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে আলজেরিয়ার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ তিনি দেখে যান নি। জন্মভূমির দেশের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনাকাঙ্খিত পরিণতি দেখে কামুর পীড়িত হওয়ার দুর্ভাগ্য হয় নি।

আলজেরিয়া প্রশ্নে কামুর মিশ্র অনুভূতি তাঁর প্রবন্ধগুলিতে অসংকোচে প্রকাশ পেয়েছে। কামু স্বীকার করেছেন আলজেরিয়ায় অতিবাহিত যৌবনের দিনগুলিতে ব্যক্তিগত বা সামাজিক স্তরে খুব কম আরব ব্যক্তিকেই তিনি চিনতেন। প্রতিবেশী আরবেরা তাঁর কাছে ছিল দূরতর নাগরিক।

খ্রিস্টিও জায়নবাদ আখ্যান—শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের ইহুদি নির্যাতনের দিনগুলিতে জায়নবাদ আন্দোলন ইউরোপের একাংশ বুদ্ধিজীবীদের সরব সমর্থন পেয়েছিল। কামু ও সার্ত্রে স্বাধীন ইজরায়েলের জন্য জায়নবাদীদের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিমধ্যে ইহুদি জায়নবাদের সমমর্মী আমেরিকার প্রোটেস্টান্টদের খ্রিস্টিয় জায়নবাদী মত আটলান্টিক পেরিয়ে ইউরোপে প্রচার পেতে শুরু করেছে। কামু ও সার্ত্রের বিরুদ্ধে আরব বিরোধী জাতি বিদ্বেষের অভিযোগ উঠেছিল খোদ ইউরোপেই।

শিকড় খুঁজতে গেলে ১৬ শতকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মনেতা মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কারের—Reformation-এর সময়ে খ্রিস্টিও জায়নবাদ ভ্রূণের জন্ম। বিশেষভাবে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের কাছে 'অভ্রান্ত' বাইবেলের ভবিষ্যবাণীগুলির অন্যতম ছিল প্রথম ধর্মপুরুষ আব্রাহামের সেই অজেয় ঘোষণা—নির্বাসিত ইহুদিরা একদিন জেরুজালেমের জায়ন পাহাড়ে তাদের উপাসনা মন্দির পুনরুদ্ধার করে নিজভূমি কানান দেশে প্রত্যাবর্তন করবে (জেনেসিস ১৭:৮)। পাঁচ কোটি আমেরিকার মানুষ আজও বিশ্বাস করে খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের যৌথ ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে ইহুদিদের ইজরায়েল প্রত্যাবর্তনের ঘটনা এক অমোঘ ঐশী প্রতিশ্রুতি। তাই জায়নবাদীদের স্বাধীন ইজরায়েলের দাবি ন্যায়সঙ্গত ও সমর্থন যোগ্য। ইজরায়েল পুনরার্জন করে একদিন ইহুদিরা খ্রিস্টবাদে আকৃষ্ট হবে। জায়ন পাহাড়ের মন্দিরে খ্রিস্টবাদীরাও প্রার্থনায় নত হবে একদিন।

খ্রিস্ট পূর্ব ছয়শো বছরের বাইবেল কথিত ঐশী বাণী খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা অনেকেই সাধারণ ও যুক্তিজ্ঞানে মানে না। উল্টে সহিংস যুদ্ধে দখলিকৃত ইজরায়েলের 'চিরজয়ী সম্পত্তি'র বিরুদ্ধে পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে তরুণ প্রজন্ম আওয়াজ তুলেছে আজ তাদের দেশে—মিছিলে, প্রতিবাদে, শহরে- নগরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব দশকে (১৯৩০-৪০) হিটলারের ইহুদি নীতি—যার পরিণতি হয়েছিল ইহুদি গণহত্যায়-- উগ্র জায়নবাদী আন্দোলনের সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করে। সমর্থকদের সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত প্রচার পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলির বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজকে স্বপক্ষে প্রভাবিত করে। ইংরেজি ভাষী দেশগুলির দৈনিক সংবাদপত্র ও রেডিও ভাষ্য ইহুদি জায়নবাদকে কোথাও প্রকাশ্যে , কখনো সতর্ক সমর্থন দিতে থাকে। ক্ষুদ্রতর গন্ডির আরবি ও তুর্কি ভাষার প্রচারমাধ্যমের অদক্ষ, নিষ্প্রভ, প্রজ্ঞাহীন সাংবাদিকতা প্যালেস্টাইনের সমর্থনে দুর্বল ভাবে আর্দ্রতা সম্পাদন করে অনুকম্পার প্রত্যাশী হয়েছিল শুধু। ১৯৪০ সালের শেষের ও পঞ্চাশের দশকের প্রথম অর্ধ ছিল ইজরাইলের প্রতি বিশ্বের গণসমর্থনের ঈর্ষণীয় সময়। ফরাসি বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষত বিশ্ব বিবেকের দুই মুখ্য কণ্ঠস্বর কামু ও সার্ত্রে - জায়নবাদের সমর্থনের মায়াজালে ধরা দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েল সুয়েজ ক্যানালের উপর 'পাশ্চাত্য' নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ও প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়নের কুরুচিকর ব্যক্তিগত আক্রমণের কারণে সার্ত্রে জায়নবাদী রাজনীতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন, ক্রমশ সরে আসেন তাঁর জায়নবাদী পূর্ব অবস্থান থেকে। ইজরায়েলের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে চিত্ত শুদ্ধি করতে লেখনী ধরেন আবার। সার্ত্রের অবস্থানের ১৮০ দ্রাঘিমা পরিবর্তনে খুশি হন নি কামু। কামু সরে আসেন নি তাঁর জায়নবাদ সমর্থনের ঘোষণা থেকে।

কামুর লেখক ও রাজনৈতিক সত্তা স্পষ্টতই বিভাজিত ছিল। লেখক কামু তাঁর সাহিত্যে মানব জীবনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রিক পুরানে বর্ণিত সিসিফাসের অসহায় জীবনকে মর্ত্য মানবের চিরকালীন সংকট মনে করেছেন। সিসিফাসের প্রতি আদেশ ছিল,

বড়ো পাথর খণ্ডকে মাথায় নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানো। কিন্তু তার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়—পাথর নিচে গড়িয়ে পড়ে। সিসিফাস আবার নিষ্ফল চেষ্টা করে পাথর মাথায় নিয়ে পাহাড়ে উঠতে থাকে—এমনই অভিশপ্ত ও অসহায় মানবের সে প্রতীক হয়ে ওঠে। আলোহীন নিখিলে নিক্ষিপ্ত এমন নির্বাসিত মানুষেরা কামুর গল্প উপন্যাসের চরিত্র, যাদের বোধের জগৎ ও বাহ্যিক জীবন যাপনে সঙ্গতির অভাব থেকে যায়। নায়ক মেরসল্ট আরব ব্যক্তিকে হত্যা করার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। উল্টে এই হত্যাকান্ড লেখকের অবচেতনে শ্বেতাঙ্গ জাতিবাদ, বর্ণবিদ্বেষ ও ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের নির্বিকল্পতাকে মান্যতা দেয়।

নানা চাপান উতোর সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার অনস্বীকার্য, আলবেয়র কামুর গল্প উপন্যাসে নিরর্থক অস্তিত্বের যন্ত্রণা বহন করা চরিত্র গুলির সাহসী মানসিক জীবন তাঁর রাজনৈতিক বিচারের অনেকে উর্ধে থাকা সত্যের জগৎ। স্বঘোষিত নিরীশ্বরবাদী কামু বিশ্বাস করতেন ভয়, দুর্বলচিত্ততা ও অপরীক্ষিত জীবনে ঈশ্বরে অসহায় আত্মসমর্পণ নয়, যুক্তির সাহস ও আপোসহীন নৈতিক দৃঢ়তায় সুখ দুঃখের জীবনকে নিরাসক্ত ভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়তর জীবন। দ্য স্ট্রেঞ্জার উপন্যাসের নায়ক মেরসল্ট যখন মরুশহরে রৌদ্র দহনে ক্লান্ত হয়ে বিচার বিবেচনা হারিয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত এক আরবকে হত্যা করে, ঐ হত্যাকান্ড তার কাছে ছিল আপতিক সিদ্ধান্ত মাত্র। ঐ ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতা তাকে গুলি করতে প্ররোচিত করেনি। কামুর নেতিবাদী জীবন দর্শনের পটভূমিতে আরব বিরোধিতার রাজনীতির ঘ্রাণ খুঁজে পাওয়া তাই বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়ন নয়।

পদাতিক ইতিহাসবেত্তার পথ চলার অবসান

অরণি সেন

কেরলের মালাবার উপকূলের হিন্দু নায়ারদের নিয়ে বহু গবেষণা রয়েছে। এরমধ্যে প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ক্যাথলিন গফের কথায় এটি কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী নয়, অনেকগুলি জাত গোষ্ঠীর সমষ্টি। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক বিক্রমন নায়ার থেকে মনোজ ও মনীষা মুরলি নায়ার বাংলার সারস্বত জগতকে আলোকিত রেখেছেন। সম্প্রতি কলকাতার মালয়ালি সমাজের প্রতিনিধি হয়েও আরও বেশি করে কলকাত্তাইয়া এবং ১৬৯০ এ প্রতিষ্ঠিত কলকাতা নগরীর অন্যতম ইতিহাসবেত্তা পরমেশ্বরণ থনকপ্পন নায়ার (১৯৩৩ - ২০২৪) পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে নীরবে চলে গেলেন। অবশ্য ছয় বছর আগেই তিনি এক সন্তানের মৃত্যুর পর কলকাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ কাটিয়ে কেরলের এরনাকুলম জেলার চেন্নামঙ্গলমে চলে যান যেখানে তাঁর প্রাক্তন স্কুল শিক্ষিকা স্ত্রী এবং পরিবার বাস করেন।

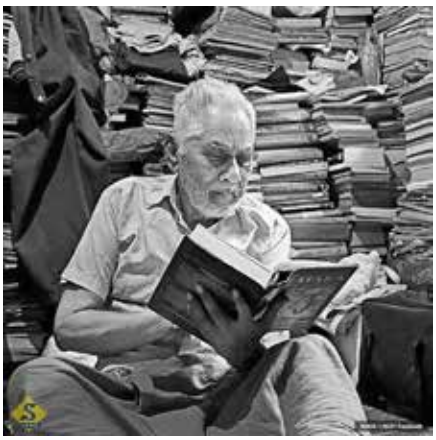

পি. টি. নায়ার

সেসময়কার আর পাঁচজন উচ্চ শিক্ষা ও কর্ম সংস্থানে আগ্রহী ভারতীয়র মত ১৯৫৫ সালে মাদ্রাজ মেলে করে তাঁর কলকাতা আগমন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা ও আইন শাস্ত্রে স্নাতক। তারপর ফ্রিল্যান্স টাইপিষ্ট হিসাবে ও বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে কাজ করেন। কিন্তু কলকাতা শহর সম্পর্কে তাঁর এত কৌতূহল ও আকর্ষণ জন্মায় যে এই শহর নিয়ে তথ্য সন্ধান, নিবিষ্ট লাইব্রেরি অধ্যয়ন, তনিষ্ঠ গবেষণা এবং পায়ে হেঁটে সরেজমিনে প্রমাণ সংগ্রহে মগ্ন হয়ে পড়েন। যার জন্যে এককথায় ছেড়ে দেন ভালো মাইনের সরকারি চাকরি। ভবানীপুরের কাঁসারি পাড়ার টিভি মোবাইল হীন বইয়ে ঠাসা এক চিলতে ঘরে দারিদ্র্য ও কষ্টের জীবন বেছে নিয়ে ছয় দশক ধরে স্বাধীনভাবে ও একাগ্রচিত্তে কলকাতার ইতিহাস চর্চা করে গেছেন। তাঁর দ্বিতীয় গৃহ ছিল আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি।প্রায় প্রতিদিন তিনি সেখানে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন এবং লাইব্রেরি খোলা থেকে বন্ধ করা অবধি অতিবাহিত করতেন। এর পরিণতি ৭০ টির মত প্রামাণ্য গ্রন্থ যার বেশিরভাগ কলকাতার বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাস সম্পর্কে।

সত্তর ও আশির দশক থেকে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী গৃহ ও নির্মাণ গুলি ভেঙ্গে বহুতল আবাসন নির্মাণ তাঁকে নিদারুণ কষ্ট দেয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি লিট উপাধি দেয় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে রিসার্চ প্রফেসর পদে সম্মানিত করে। তাঁর সংগ্রহে ছিল বিরল গ্রন্থের এক বড় সংগ্রহ যা পাওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি তাঁকে খালি চেক দিতে চেয়েছিল। কেরলে চলে যাওয়ার আগে তিনি সংগ্রহটি কলকাতার টাউন হল লাইব্রেরি কে দিয়ে যান। আমৃত্যু তিনি অধ্যয়ন ও লেখালেখির মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

অর্থনীতির হালহকিকত

- **কেন্দ্রীয় বাজেটে :** ২০২৪-র ফেব্রুয়ারির কেন্দ্রীয় বাজেটে স্বাস্থ্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ১.৮ শতাংশ ও ২.০ শতাংশ। পরিকাঠামোয় বৃদ্ধি ১১ শতাংশ। গৃহের ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা ৩০০ ইউনিট অবধি নিঃখরচায় ব্যবহার করতে ও উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারবেন। আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে' অন্তর্ভুক্ত হলেন। পশ্চিমবঙ্গের মেট্রোর প্রকল্পগুলিতে বাজেট বাড়ানো হল।
- **রাজ্য বাজেটে :** ২০২৪-র রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পে ৫০০ টাকা বেড়ে ১০০০ টাকা, জনজাতি ও যাটোর্ধ মহিলাদের ১২০০ টাকা। সরকারি কর্মচারীদের ডি.এ. বৃদ্ধি ৪%। সিভিল ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও গ্রিন পুলিশদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি ১০০০ টাকা ও মিডডে মিলের রাঁধুনি ও সহায়িকাদের সাম্মানিক বৃদ্ধি ৫০০ টাকা। জব কার্ড থাকলে রাজ্যের কর্মশ্রী প্রকল্পে বছরে ৫০ দিন কাজ। রাজ্যের পুঞ্জীভূক্ত ঋণ গত তিন আর্থিক বছরে ৫.২৫, ৫.৮৬ ও ৬.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা। একইসময়ে রাজকোষ ঘাটতি যথাক্রমে ৩.৭০ শতাংশ, ৩.৯৩ শতাংশ ও ৩.৮৩ শতাংশ।
- **কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে সংঘাত :** কেন্দ্র-রাজ্য অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে রাজ্যের বক্তব্য কেন্দ্র ১০০ দিনের অর্থ বরাদ্দ না করায় ২১ লক্ষ মানুষ মজুরি পাননি। রাজ্যই তাদের টাকা দেবে। কেন্দ্র সরকার ও সিএজির বক্তব্য ২০২১-র মার্চ পর্যন্ত রাজ্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ২,২৯,০৯৯ কোটি টাকা খরচের কোন হিসাব দেয়নি। এর মধ্যে ৩৪,৮৮০ কোটি টাকা বাম আমলে এবং ১,৯৪,২১৯ কোটি টাকা তৃণমূল আমলে বরাদ্দ।, এর সাথে দুর্নীতির ভুরিভুরি অভিযোগ। এরই মধ্যে রাজ্য বাজেট হিসাব না দেখিয়ে বাজার থেকে ৪৩১২ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিগত বিধানসভা ভোটের আগে কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, বাংলা স্বাস্থ্য বিমা, জয় জোহর ও তফসিলি বন্ধু এবং রূপশ্রী প্রকল্পে ১১২২, ৭২০, ৫৩৮, ৪৯১, ও ৪৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। মোট বাজেটের নিরিখে অতিরিক্ত খরচ বিগত চারটি আর্থিক বছরে ৩৩,০৩৭, ২৫,০০০, ২১,০০০ ও ১৫,২৬২ কোটি টাকা।
- **ব্যাঙ্কের খাতা থেকে ঋণ মোছা হল :** কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছে ২০১৪-'১৫ থেকে ২০২২-'২৩ আর্থিক বছরে নরেন্দ্র মোদির শাসনকালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হিসাবের খাতা থেকে ১৪,৫৫,২২৬ কোটি টাকার অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) মুছে দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে বড় শিল্পগুলির ঋণই মোছা হয়েছে ৭,৪০,৯৬৮ কোটি টাকার। সরকারের এই পুঁজিবাদি-বান্ধব আচরণের সমালোচনা করেছেন বিরোধিরা।
- **পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার অভিযোগ :** কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ অভিযোগ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। প্রবল ঋণগ্রস্ত রাজ্যের কোষাগারের আয়ের ৩৫ শতাংশ চলে যাচ্ছে ধারের সুদ ও সরকারি কর্মীদের পেনশন মেটাতে। মূলধন সৃষ্টির হার ২০১০ এর ৫.৭ শতাংশ থেকে নেমে হয়েছে ২.৯ শতাংশ। দেশ যখন স্বাধীন হয় সারা দেশের শিল্পোৎপাদনের ২৪ শতাংশ হত পশ্চিমবঙ্গে, যা এখন পৌঁছেছে ৩.৫ শতাংশ তে। ২০১০ থেকে ১১ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়েছেন। শিক্ষাতেও একসময় কেরলের পর পশ্চিমবঙ্গ ছিল। এখন তামিলনাড়ু, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের থেকে পিছনে।
- **শেয়ার বাজারে ধস :** ২৭ অক্টোবর '২৩ একদিনে শেয়ার বাজারে ধস নেমে লগ্নীকারীদের ১৭.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা মুছে গেল। সেনসেক্স পড়ল ৯০০.৯১ পয়েন্ট, নিফটি ৯৫৪। ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামও কমে গেল। এরকম মাঝে মাঝে হয়ে ফাটকা পুঁজির কারবারীরা সাধারণ লগ্নীকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করছেন।
  আবার ১ জুন এক্সিট পোলে মোদি সরকারের বিপুল জয় দেখিয়ে মানুষকে শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করা হয়। এর পরপরই ফলাফল ঘোষণার পর শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে। লগ্নিকারীদের ৩০ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হয়। রাহুল গান্ধী, নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে দায়ী করে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) তদন্ত চেয়েছেন।
- **ভারত চতুর্থ সামরিক শক্তিধর দেশ :** গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার মিলিটারি স্ট্রেন্থ র‍্যাঙ্কিং সমীক্ষায় ২০২৪ সালে ১৪৫টি দেশের সামরিক শক্তির বিচারে ভারত চতুর্থ। (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (২) রাশিয়া, (৩) চীন, (৪) ভারত, (৫) দক্ষিণ কোরিয়া, (৬) ব্রিটেন, (৭) জাপান, (৮) তুরস্ক, (৯) পাকিস্তান, (১০) ইতালি...
- **দুর্ভিক্ষপ্রায় পরিস্থিতি :** রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য সংস্থা (FAO)-র তথ্য জানাচ্ছে প্রতি ১০ জন মানুষের একজন ক্ষুধার্ত, ৭০ কোটি মানুষ জানেন না কখন আবার খাবার পাবেন, ৩৪ কোটির বেশি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। ৫০টি দেশের চার কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ এখন দুর্ভিক্ষের দোরগোড়ায়। এক থেকে পাঁচ বছর বয়সী চার কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। অতিমারি, ইউক্রেন ও গাজার যুদ্ধ, সারের দাম বৃদ্ধি, কম শস্য ফলন প্রভৃতি সঙ্কটকে বাড়িয়েছে।
- **ক্ষুধা সূচকে আরও নেমে গেল ভারত :** বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত ১২৫টি দেশের মধ্যে ২০২২-এ ছিল ১০৭ নম্বরে। ২০২৩-এ আরও চার ধাপ নেমে হয়েছে ১১১। ভারতে স্বাস্থ্যকর খাবার জোটেনা ১৬.৬ শতাংশ মানুষের। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ৩.১ শতাংশ। শিশুদের অপুষ্টির হার ১৮.৭ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী মহিলাদের ৫৮.১ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগেন। ভারতের চাইতে ভালো অবস্থান শ্রীলঙ্কা (৬০), নেপাল (৬৯), বাংলাদেশ (৮১) ও পাকিস্তান (১০২)।
- **দূষণ ও বৈদুতিক যান :** 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যাণ্ড

এনভায়রনমেন্ট'-র তথ্য অনুযায়ী ভারতের রাস্তায় ২০০৫ সালে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৮০ লক্ষ টন। এটি ২০২৫ ও ২০৩৫-এ গিয়ে দাঁড়াবে ৭২ কোটি ১০ লক্ষ টন ও ১২১ কোটি ২০ লক্ষ টন। ভয়াবহ দূষণ থেকে মুক্তির পথ বৈদ্যুতিন যান। কিন্তু বর্তমানে দেশের ৩৪ কোটি যানবাহনের মধ্যে বৈদ্যুতিন যান মাত্র ২৮.৭ লক্ষ (০.৮২ শতাংশ)। পশ্চিমবঙ্গের ২৩.৪২ লক্ষ নথিভুক্ত যানবাহনের মধ্যে ২১,৮৩৫টি যান এলপিজি, সিএনজি, বৈদ্যুতিন সহ বিকল্প জ্বালানি চালিত (০.৯ শতাংশ)। আর শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন যান ০.৪৫ শতাংশ। দেশের মধ্যে ই-চার্জিং স্টেশন মাত্র ৭,৫৮০টি। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৪০১টি।

- **যোগ্যতা ছাড়াই বরাত :** মার্কিন হিণ্ডেনবার্গ রিপোর্ট, ও সি সি আর পি রিপোর্ট ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা, রাশিয়া থেকে খনিজ তেল, মালয়েশিয়া থেকে পাম তেল আমদানি; বিভিন্ন সরকারি বরাত; সামরিক সরঞ্জাম তৈরির বরাত; খনিজ বরাত; বন্দর ও বিমানবন্দর পরিচালনার বরাত; বিশ্বের বৃহত্তম বস্তি ধারাভিতে গৃহনির্মাণের বরাত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে 'অর্থ জোগানকারী' 'বন্ধু' শিল্পপতিদের, বিশেষ করে আদানি গোষ্ঠীর, অবৈধ সুবিধা পাওয়ার অভিযোগের পর তেলেঙ্গানায় রাস্তা তৈরির ১৫৬৬ কোটি টাকার আদানির বরাত পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বজন পোষণের অভিযোগ এল সি এ জি রিপোর্টের ভিত্তিতে।
- **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিক নির্দেশ (সূত্রঃ আর. বি. আই.) :**
  অক্টোবর-ডিসেম্বর '২২ : ৬.৬ শতাংশ,
  জানুয়ারি-মার্চ '২৩ : ৫.৯ শতাংশ,
  এপ্রিল-জুন '২৩ : ৬.৭ শতাংশ
  জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৩ : ৫.৪ শতাংশ
- **রাশিয়া বৃহত্তম সরবরাহকারী (সূত্রঃ ভর্টেক্সার) :** ইউক্রেন যুদ্ধের পর পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। সবাইকে পেছনে ফেলে রাশিয়া এখন ভারতের খনিজ তেল সরবরাহের বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশ। দৈনিক সরবরাহ ৯,০৯,৪০৩ ব্যারেল। এর পরে তিনটি স্থানে রয়েছেঃ ইরাক, সৌদি আরব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে ৮,৬১,৪৬১; ৫,৭০,৯২২ ও ৪,৫৫,৫২৫ ব্যারল।
- **টেলর সুইফটকে কেন্দ্র করে 'ফানফ্লেশন' :** কোভিড-উত্তর সময়ে বিয়ন্সে, বার্বি, ওপেনহাইমার-কে ধরে বিনোদন অর্থনীতিকে যে মেলে ধরা তাকে রেকর্ড পরিমাণে নিয়ে গেছেন মার্কিন সঙ্গীত শিল্পী টেলর সুইফট। 'ফান' আর 'ইনফ্লেশন'কে নিয়ে তাঁর 'ফানফ্লেশন' ৫০টির বেশি রাষ্ট্রের মোট অর্থনীতির বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'বিটলস', বব ডিলান, এলভিস প্রেসলি, ম্যাডোনা, মাইকেল জনসনদের জনপ্রিয়তা ছাড়িয়ে তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন বিগত এক শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিনোদনকারী। রেকর্ড বিক্রি কবে ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, কনসার্ট মুভিতেই উঠেছে ২৫ কোটি ডলারের বেশি। এক সঙ্গে অসংখ্য এওয়ার্ড। বিভিন্ন শহর, রাস্তা, স্টেডিয়াম তাঁর নামে। রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তাঁর লক্ষ লক্ষ ফ্যান 'সুইফটি' পশ্চিম দুনিয়া মাতাচ্ছে। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কোর্স' চালু হয়েছে।
- **ভারতীয়দের সঞ্চয় হ্রাস ও দেনা বৃদ্ধি (সূত্রঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) :**
  ভারতীয়দের নিট সঞ্চয় ক্রমশ নিম্নমুখী—
  ২০২১-'২২ : ১৬.৯৬ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ৭.২ শতাংশ)
  ২০২২-'২৩ : ১৩.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ৫.১ শতাংশ, পাঁচ দশকে সর্বনিম্ন)
  ২০২৩-'২৪ : সম্ভাব্য ৪ শতাংশ
  গৃহস্থের দেনার বোঝা বৃদ্ধি—
  ২০২১-'২২ (জিডিপির ৩৬.৯ শতাংশ)
  ২০২২-'২৩ (জিডিপির ৩৭.৬ শতাংশ) স্বাধীনতার পর ২০০৬-'০৭এ একবারই এত বেড়েছিল।
- **ভারতের উন্নয়ন (**'ন্যাশনাল ম্যাল্টডায়মেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স : এ প্রসেস রিভিউ ২০২৩—নীতি আয়োগ):

ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
• দারিদ্র কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.৯৬ শতাংশ • গ্রামে ১৯.২৮ শতাংশ, শহরে ৮.৭ শতাংশ • উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও রাজস্থান সার্বিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।	• ১১.৮৯ শতাংশ • এক তৃতীয়াংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছেন • ৬১ শতাংশ পরিবার কাঠ কয়লার উনুন ব্যবহার করেন • ৩২ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার নেই • দারিদ্র বেশি পুরুলিয়া (২৬.৮৪ শতাংশ), উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে

- **বেকারত্ব কমলেও কর্মস্থান বাড়ছে না (সূত্রঃ পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২২-'২৩) :** বেকারত্বের হার ২০১৭-'১৮-র ৬.২ থেকে কমে ২০২২-'২৩-এ দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশ (যুবকদের ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ থেকে ৮.৫ শতাংশ)। এবার ভাল করে বিশ্লেষণ করলে এই বৃদ্ধিটি হয়েছে মূলত স্বনিযুক্ত পারিবারিক শ্রমে। দেশের মোট কর্মরত জনসংখ্যা ৩৫ শতাংশ। স্নাতকদের মধ্যে ১৩.৪ শতাংশ-র কোন কর্মসংস্থান মেলেনি।
- **জিডিপি বনাম জিভিএ :** জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট) হল মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন। জিভিএ (গ্রস ভ্যালু এডেড) হল মোট যুক্ত মূল্য (দেশের উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার মোট মূল্য)। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন অক্টোবর-ডিসেম্বর ৮.৪ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি নিয়ে প্রচার করছেন তখন বিরোধী নেতা জয়রাম রমেশ জিভিএ-র বৃদ্ধি মাত্র ৬.৫ শতাংশ উল্লেখ করেছেন।
- **জিডিপি বৃদ্ধির আসল হার :** ভারত সরকারের প্রাক্তন আর্থিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণম জানিয়েছেন যে ভারতের বৃদ্ধির আসল হার পাঁচের বেশি নয় যদিও তাকে অনেক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধির হারকে বাস্তবের সব চাইতে কম

দেখিয়ে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস করা হচ্ছে।

- **তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি দেশ হলেও গরীব দেশ :** রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্ণর ডি. সুব্বারাও বলেছেন ১৪০ কোটি জনসংখ্যার কারণে ভারত ২০২৯ এর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে পারে। কিন্তু ভারত গরীব দেশই থাকছে। ২৬০০ ডলার মাথা পিছু আয় নিয়ে বিশ্বের মধ্যে ১৩৯তম এবং জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে দরিদ্রতম। তাই তৃতীয় বৃহত্তম বলে উৎসবে মেতে ওঠা অর্থহীন। বরং জিডিপি বৃদ্ধি এবং আর্থিক সুবিধা সকলের মধ্যে বন্টনের উপর জোর দেওয়া উচিত।
- **কয়লার দাম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আদানির মুনাফা:** সংবাদে প্রকাশ শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থা কয়লা আমদানির খরচ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে বিপুল মুনাফা করছে। একটি উদাহরণ, ভারতের বিদ্যুত কেন্দ্রগুলির জন্য বরাত পাওয়া আদানি গোষ্ঠী ২০১৯ জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়ার কালিওরং থেকে ৭৪,৮২০ টন কয়লা ১৯ লক্ষ ডলারে কিনে, এর সাথে পরিবহন ও বিমার খরচ ৪২ হাজার ডলার খরচ করে জাহাজ করে গুজরাতের মুন্দ্রা বন্দরে নিয়ে আসে। সেই সময় ঐ কয়লার দাম দেখানো হয় ৪৩ লক্ষ ডলার।
- **রহস্যজনক বৃদ্ধির হার:** সমস্ত হিসাব, সমস্ত পূর্বাভাস, সমস্ত আভ্যন্তরীণ অন্যান্য লক্ষণকে ছাপিয়ে ভারত সরকারের এপ্রিল-জুন '২৩-র বৃদ্ধি ৭.৫ শতাংশ (সংশোধিত ৮.১ শতাংশ), জুলাই-সেপ্টেম্বর '২৩ এর বৃদ্ধি ৭.৬% (সংশোধিত ৮.১% এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর '২৩-র বৃদ্ধি ৮.৪ শতাংশ ঘোষণা সমস্ত বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করেছে। এমনকি কেন্দ্র সরকারের প্রাক্তন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যণ এই পরিসংখ্যানকে রহস্যজনক বলেছেন। লোকসভা নির্বাচনের সময় ঘোষণা করা হয়েছে জানুয়ারি-মার্চ ৭.৮% এবং ২০২৩-'২৪ সমগ্র অর্থবর্ষে ৮.২% বৃদ্ধি।
- **নির্বাচনী বন্ড অসাংবিধানিক:** প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং শীর্ষ আদালতের চারজন বিচারপতির বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায়ে নির্বাচনী বন্ডকে জনস্বার্থ বিরোধী ও অসাংবিধানিক বলেন এবং বাতিল করেন। তাঁরা এস.বি.আই. কে নির্দেশ দেন পূর্ণাঙ্গ তথ্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে এবং ১৫ মার্চ নির্বাচন কমিশনকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে। ফলে জানা যায় ৩০টি কর্পোরেট সংস্থা, যাদের মধ্যে অনেকগুলি কলঙ্কিত এবং তাদের অনেকেই সরকারি বরাত পেয়েছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে মোট ১২,৭৬৯ কোটি টাকা ২০১৮ থেকে ২০২৩ অবধি রাজনৈতিক দলিগুলিকে দিয়েছে। সবচাইতে বেশি টাকা দিয়েছে ফিচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস (১,৩৬৮ কোটি), মেঘা ইঞ্জিনিয়ারি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার (৯৬৬ কোটি), কুইক সাপ্লাই চেন (৪১০ কোটি), হলদিয়া এনার্জি (৩৭৭ কোটি) ও বেদান্ত (৩৭৬ কোটি)। ১৪টি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা চাঁদা দিয়েছে। এর মধ্যে অনেক সংস্থা আছে যারা ইডি-সিবিআই-আয়কর হানার পর পরিত্রাণ পেতে শাসকদলকে চাঁদা দিয়েছে। কেউ কেউ সংস্থার যে মুনাফা দেখানো হয়েছে তার থেকে বেশি টাকা চাঁদা দিয়েছে। সব চাইতে বেশি চাঁদা পেয়েছে যে পাঁচটি দল : (১) বিজেপি (৬০৬১ কোটি টাকা, ৪৭.৪৫%), (২) তৃণমূল (১৬১০, ১২.৬%), (৩) কংগ্রেস (১৪২২, ১১.১৪%), (৪) বিআরএস (১২১৫, ৯.৫%), ও (৫) বিজেডি (৭৭৬, ৬.০৭%)।
- **ভারতে বৈষম্য আকাশ ছোঁয়া:**
- ২০২২-'২৩-এ ভারতের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশ অতিধনী এক শতাংশের কুক্ষিগত
- দেশের মোট আয়ের ২২ শতাংশ তাদের
- সবচাইতে ধনী ১০ হাজার জনের গড় আয় বছরে ৪৮ কোটি টাকা। যা সাধারণ মানুষের গড় আয়ের দু হাজার গুণের বেশি
- আয়ের দিক থেকে ৫০ শতাংশ নীচের অংশের মোট আয় সমগ্র আয়ের ১৫ শতাংশ
- সবচাইতে উপরের সারিতে ১ শতাংশ এর গড় আর্থিক আয় ৫৩ লক্ষ টাকা যা সাধারণ মানুষের গড় আয়ের ২৩ গুণ বেশি
- ৫০ শতাংশ নীচের অংশের গড় বার্ষিক আয় ৭১ হাজার টাকা
- মাঝের সারির ৪০ শতাংশ-র গড় বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা
- আর্থিক অসাম্য কমাতে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লুকাস স্যাঁসেল, নিতিন কুমার ভারতী, আনমোল সোমানইচ ও টমাস পিকেটি যে পথ বাতলেছেন তা হল : (১) ১০ কোটি টাকার বেশি নিট সম্পদে ০২% বিত্ত কর। (২) ১০ কোটি টাকার বেশি উত্তরাধিকারে সূত্রে পেলে ৩৩% বিত্ত কর– (৩) করের টাকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের সমাজ কল্যাণ। তাঁরা হিসাব কষে দেখেছেন যে এর ফলে সরকারের ঘরে জিডিপির ২.৭৩% টাকা আসবে এব জনসংখ্যার ৯৯.৯৬% প্রাপ্ত বয়স্কের জীবন ভালভাবে চলে যাবে।
- **সাংসদদের সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি:** ২০১৯এ সাংসদ হওয়ার পর ৩২৪ জন ২০২৪এ আবার প্রার্থী হয়েছিলেন। তাদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে ২১.৫৫ থেকে ৩০.৮৮ কোটি টাকা (>৪৩%)।
- **মোদি জমানায় প্রশ্নপত্র ফাঁস:** (১) সেনাবাহিনীতে নিয়োগ (বারবার), (২) এ আই পি এম টি, (৩) এস এস সি সি পি ও, (৪) নিট (বারবার), (৫) এস সি সি এম টি এস, (৬) সি জি এল, (৭) ইউ জি সি নেট সহ আরও অনেক।
- **জাঙ্ক ফুড ও রোগে সবচাইতে বেশি খরচ পশ্চিমবঙ্গে:** ক্ষতিকর জাঙ্ক ফুডের সাথে রোগ ভোগের সম্পর্ক প্রমাণিত। গ্রাম ও শহরে বাঙালী রেস্তোরাঁর খাবার, পানীয় ও প্যাকেটের খাবারে এক হাজার টাকার মধ্যে ২১১ ও ২৫০ টাকা খরচ করে। মাছ-মাংস-ডিমে ১৮৯ ও ১৮৯ এবং আনাজে ১২৬ ও ১০৮ টাকা খরচ করে। চিকিৎসায় করে ১৬৮ ও ১৫০ টাকা, জ্বালানী ও বিদ্যুতে ১৬৩ ও ১৪২ এবং পড়াশোনায় ৬১ ও ৮৮ টাকা।
- **একনজরে কেন্দ্র বাজেট ২০২৪-'২৫:** মোট ৪৮.২১ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে পরিকাঠামোর ১১.১১, প্রতিরক্ষায় ৪.৫৫, গ্রামোন্নয়ন ২.৬৬, কৃষি ১.৫২, স্বরাষ্ট্র ১.৫১, শিক্ষা ১.২৬, তথ্যপ্রযুক্তি ১.১৬ লক্ষ কোটি, স্বাস্থ্য ৮৯, শক্তি ৬৯, সমাজকল্যাণ ৫৭, শিল্প ৪৮, ক্রীড়া ৩.৪৪ হাজার কোটি।

শতবর্ষে আবোলতাবোল

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে ১০০ বছর আগের কথা। সন্দেশ পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় সুকুমার রায়ের বিশেষ বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বর্গীয় সুকুমার রায়' শীর্ষক একখানি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিন আগেই সুকুমার রায় অত্যন্ত অল্প বয়সে পরলোক গমন করেছিলেন। স্বভাবতঃ স্মৃতিভারাক্রান্ত এই নিবন্ধে বন্ধুর প্রতি তাঁর হৃদয়ের যাবতীয় বেদনা উজাড় করে দিয়েছিলেন। সুকুমার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লেখেন,

''সুকুমারবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পর যে গুণ সর্বাগ্রে লোকের কাছে ধরা পড়িত তাহা হইতেছে তাঁহার রসিকতা ও তেজস্বিতা। তাঁহার বাক্য ছিল পরম, তাঁহার রচনা ছিল সরস, তাঁহার সঙ্গ ছিল সরস, তাঁহার ব্যবহার ছিল সরস। আনন্দময়তা তাঁহার স্বভাব ছিল। এই আনন্দময়তা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি বন্ধু মজলিসে আনন্দের কেন্দ্র হইতেন, এবং যাহা কিছু রচনা করিতেন তাহা আনন্দে অভিষিক্ত হইত।'' শুরুতেই এই লেখাটির অবতারণা করার কারণ রয়েছে নিশ্চিতভাবেই। ১৯২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এন্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম আলোকস্তম্ভ 'আবোল তাবোল'। এই বই-এর প্রকাশ গ্রন্থকার সুকুমার রায় তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশের ১০ দিন আগে প্রয়াত হন। ২০২৩ সালে আবোল তাবোল প্রকাশের শতবর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। চারদিকে প্রকাশিত হয়েছে এই বিষয়ে নানা লেখা। আয়োজিত হয়েছে আলোচনাসভার। এই নিবন্ধে আরও একবার চর্চা করবো অন্ততঃ চারটি প্রজন্মের মানুষের কাছে বড়ো আদরের বই আবোল তাবোল। দুরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুকুমার। রোগশয্যায় শুয়েও তিনি আবোল তাবোলের ভূমিকাটি রচনা করেছিলেন। ভূমিকায় সুকুমার রায় লিখেছিলেন,

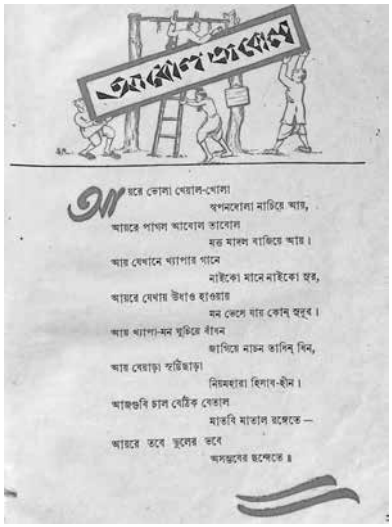

''যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট। যাহা অসম্ভব। তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং যে যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে''। ভূমিকা থেকেই এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই বইতে ছড়িয়ে রয়েছে হাস্যরসের নানাবিধ উপকরণ। এই সংকলনের বিভিন্ন কবিতা সুকুমার রায় সন্দেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার জন্য রচনা করেছিলেন। এঁকেছিলেন অনেকগুলি ছবিও। সেই অসাধারণ ছবি এবং কবিতাকে একসূত্রে গেঁথে সন্নিবেশিত হয়েছে এই বইতে।

প্রথমে আসা যাক আবোল তাবোল-এর ছবির প্রসঙ্গে। যদি প্রথম ছবিটাই ধরি তাহলে দেখব যে মস্ত একটা সাইনবোর্ড টাঙাতে চারজন লোক ব্যস্ত। 'আবোল তাবোল' এই অক্ষরকটি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বৃত্ত বা অর্ধবৃত্তের টুকরো দিয়ে সাজানো রয়েছে। 'গোঁফ চুরি' কবিতায় হেড অফিসের বড়বাবুর ছবির মধ্যে হাত তোলা ভঙ্গিতেই তাঁর রাগী ও বদমেজাজী গোছের চরিত্রটি ধরা পড়ে আমাদের সামনে। 'কাতুকুতু বুড়ো' যে লোক দেখলেই হাসান বোঝা যায় ছবিটি দেখলে। লড়াই-খ্যাপা পাগলাজগাই বা হুঁকোমুখো হ্যাংলার ছবি দেখলে তাদের চরিত্র আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যখন 'ন্যাড়া বেলতলা যায় ক'বার' কবিতায় রোদে রাঙা ইটের পাঁজার ওপর রাজা বসেন তখন তার গোমড়া মুখটা দেখলে সত্যিই মনে হয় যে হিসাব একদম মিলছে না। 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' বা 'রামগড়ুরের ছানা' কবিতায় মূলচরিত্রের আদলে ধরা পড়ে মনুষ্যচরিত্র। 'রামগরুড়ের ছানা' কবিতায় তার বাড়ির আশেপাশে যে মেঘ ও গাছগুলো দেখতে পাই তখন তাদের মধ্যে মানুষের হাসিমুখের আদল লক্ষ্য করা যায়। 'হাতিমি', 'হাঁসজারু', 'ট্যাঁশগরু', 'নন্দগোঁসাই', 'হাতুড়ে', 'আহ্লাদী' ইত্যাদি ছবিগুলিতে সুকুমার রায়-এর প্রগাঢ় পর্যবেক্ষণ শক্তির ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। আবোলতাবোলের শেষ কবিতায় মেঘের দেশে পাড়ি দেয় ছেলে। রোগজীর্ণ এক যুবকের জীবনসায়াহ্নের মুহূর্তটি আসে এগিয়ে। সেদিন 'দস্যি ছেলে'র লক্ষ্মী পৃথিবীতে বসে বৃদ্ধ দেখতে থাকেন এক প্রাণচঞ্চল ছেলের চলে যাওয়া—

''আদিম কালে চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।''

আবোলতাবোল আমার কাছে যেন নানারকম শব্দের এক জাদুশালা। 'শব্দ কল্পদ্রুম' কবিতায় বেশকিছু শব্দের তিনি দুটি করে অর্থ ব্যবহার করেন। একটি হল ধ্বনি বা আওয়াজের অনুষঙ্গ এবং আর একটি হল সাধারণ কোন কাজের অর্থ। 'ঠোস ঠাস দ্রুম দ্রাম' শব্দটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাত কাটছে 'খ্যাঁশ খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ' শব্দে, ব্যথা বাজছে আবার 'ঠুং ঠাং ঢং ঢং' শব্দে, বুক ফাটছে 'কট্‌কট্' শব্দে। কবিতায় এইভাবেই বিভিন্ন ধ্বনাত্মক শব্দের নানারকম প্রয়োগ

কবি ঘটিয়েছেন। 'খিচুড়ি' কবিতায় আবার সুকুমার শব্দ তৈরির বিশ্বকর্মা। হাঁস আর সজারু মিলিয়ে হাঁসজারু, বক আর কচ্ছপকে একত্রিত করে বকচ্ছপ। বিছা আর ছাগলকে মিলিয়ে বিছাগল। গিরগিটি আর টিয়া মিলে হয় গিরগিটিয়া। কিভাবে তিনি শব্দকে নিয়ে খেলা করেছেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 'ভুতুড়ে খেলা' কবিতা যেখানে পান্ত ভূতের জ্যান্ত ছানাকে তার মা বিচিত্র ভাষায় আদর করছেন।

''ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টিরে!
ওরে আমার হামান ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্নাহাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার গোবরা হাওয়ার স্বপ্ন ঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবর গণেশ ময়দাঠাসা নাদুস রে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোঁকলা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিস রে'

যখনই 'আবোলতাবোল'-এর পাতা উল্টোই একটা ব্যাপার দেখে অবাক হই যে সুকুমার রায়ের প্রবল রাজনৈতিক চেতনা। তিনি যে সময় এইসব কবিতা বা ছড়াগুলি লিখছেন তখন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন, ব্রিটিশদের কঠোর দমননীতি ইত্যাদি সমসাময়িক সমাজকে প্রভাবিত করছে। 'লড়াই ক্ষ্যাপা' কবিতায় পাগলাজগাইকে দিয়ে সুকুমার যে রকম রসিকতা করেছেন তা অনবদ্য। জগাই যেন বীর শহীদ যে অনায়াসেই প্রচুর লড়াই করে এবং শেষে জানান—

'শোন রে জগাই, ভীষণ লড়াই হল
পাঁচ ব্যাটারে খতম করে জগাইদাদা মোলো।'

আবার ধরা যাক 'বাবুরাম সাপুড়ে'র কথা। সেসময় যাঁরা নরমপন্থী রাজনীতির কথা বলতেন তাঁরা হয়তো সেই সাপ যার চোখ, শিং নখ নেই। সে কাউকে কাটে না বা ফোঁসফাস করে না, ঢুঁসটাঁস মারে না। ব্রিটিশ ভারতের নানা বাধানিষেধ যেন রামগড়ুরের বাসায় ভরা। যেখানে 'রামগড়ুরের ছানা'রা হাসার সুযোগ অবধি পায় না। আবার 'একুশে আইন' কবিতার ব্যঙ্গের কশাঘাত যে দেশের দণ্ডমুণ্ডর কর্তাদের প্রতি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না কারো। এইভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এর পরিমিত হাস্যরস দিয়ে সুকুমার রায় সাজিয়েছেন 'আবোল তাবোল' এর ভাণ্ডারকে।

তবু আমরা 'আবোল তাবোল'এর চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেদের খুঁজে পাই, 'কাঠবুড়ো' আমাদের চারপাশে ঘোরে, 'হেড অফিসের বড়বাবু'ও যেন আমাদের ভারি চেনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু যে পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড় তা আরও একবার ভাবতে শেখান সুকুমার রায়। তাঁর কোনও চরিত্র 'গানের গুঁতো'তে পাগল করে সবাইকে— এরকম অসুর বেসুরের দল প্রতিনিয়ত ঘোরে আমাদের চারপাশে। আমরা চিনে নিই সেই ক্ষণজন্মা খুড়োকে যিনি দৌড়োনোর এক অভিনব কল অনায়াসেই আবিষ্কার করেন। 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি' করবে বিষয়টি মজা দেয় আমাকে। ভাবুন তো 'বোম্বাগড়ের রাজা'র পরিবারটিকে, যেখানে রাজারানী, রাজার খুড়ো, রানীর দাদা, রাজার পিসি, সবাই সেই যৌথপরিবারের বাসিন্দা। এই যৌথপরিবারের একএকজন সদস্যের একএকরকম বৈশিষ্ট্য যা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। এখানে রয়েছে সেই 'ডানপিটে ছেলে' যে দুধভাত ফেলে শিলনোড়া খেতে চায়, 'নোটবুক'-এর মাহাত্ম্য নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত সেই মানুষটি যেন নিজেকে জাহির করতে চায়। 'সৎপাত্র' কবিতায় একটি সমাজের বেকারত্বর নানাদিক মজার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। যদি আবোলতাবোল পড়ি আমরা তাহলে আমাদের সম্মুখে এক-বিচিত্র চিড়িয়াখানা দৃশ্যমান হয়। যেখানে 'খিচুড়ি' কবিতার বিচিত্র সব প্রাণীরা ঘুরে বেড়ায়। কুমড়োপটাশ, ট্যাঁশগরু, হুঁকোমুখো হ্যাংলারা ভারী আপন হয়ে ওঠে।

এখনও যখন দেখি বইমেলায় একটি কোমলপ্রাণ শিশু আবোলতাবোল নিয়ে মজা পাচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগে। যখন আবৃত্তিকারীরা অত্যন্ত মুন্সীয়ানায় আবৃত্তি করছেন এই বইএর কবিতাগুলি, মন ভরে যায়। গায়করা গাইছেন এই কবিতার গীতিরূপ। অ্যানিমেশানে এসেছে চরিত্রগুলি। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবোলতাবোলের চরিত্রগুলির চিত্ররূপ চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে আবোলতাবোল চিরসুন্দর, চিরনতুন একখানি বই। শতবর্ষে আবোলতাবোলের জনপ্রিয়তা বাড়ুক আরো। চর্চিত হোক এই বই নতুন নতুন ভাবে। আমরা আবোলতাবোল পড়ে বড় হয়েছি। এ আমাদের পরম প্রাপ্তি।

তথ্যসূত্র:
১। সুকুমার রচনা সমগ্র, তুলিকলম
২। সংবাদ প্রতিদিন রোববার (৩০ অক্টোবর ২০১১) (তাতাবাবু)

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি

জ্যোতির্ময় রায়

['উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন: সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ' থেকে সংগৃহীত—সম্পাদকমণ্ডলী]

স্বাধীনতার সময়কাল থেকে রাজবংশী সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন শুরু হয়। পরবর্তীকালে বিপুল অভিবাসনে সেটা দ্রুত এবং ব্যাপক হয়। রাজবংশী গ্রাম সমাজের বিন্যাস পাল্টে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ও ১৯৫৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন উত্তরবাংলার আর্থ সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এক নতুন রূপ নেয়। উত্তরবাংলার এক বিশাল সংখ্যক জোতদার বিশেষ করে রাজবংশী জোতদার তাদের জমি হারান। এর ফলে জোতদাররা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি রাজবংশী সমাজের কৃষকশ্রেণিও বিপুল ক্ষতির স্বীকার হন। এদের মধ্যে এক বিরাট অংশ ছিল ভাগচাষি-আধিয়ার। আবার ভূমিসংস্কার আন্দোলনের বিলিবন্টন ব্যবস্থায় স্থানীয় রাজবংশী

সম্প্রদায় বিশেষ উপকার পাননি। জমির ঊর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে যারা পুরোপুরি ভূমি নির্ভর ছিলেন তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। শুরুতে তারা এর তাপ যথেষ্ট অনুভব করতে না পারলেও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় এর তাপ পেতে শুরু করেন। অর্থাৎ বেনামি জমি বা খাসজমি উদ্ধার একটি সংকটের সৃষ্টি করে। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ও ভূমিসংস্কারের মতো প্রগতিশীল কার্যসূচি

উত্তরবঙ্গের ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজের মধ্যে এক অস্থির সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ ছয়ের দশক অবধি রাজবংশী সমাজ ভূমির বাইরে অন্য কোন পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করার কথা কখনও ভাবেননি । বরং ঘোরতর বিমুখ ছিলেন। ফলত : উদ্ভূত সমস্যায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্বাভাবিকভাবে সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে দোলাচল শুরু হয়। অত্যধিক উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ও স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে জমির উপর চাপ বাড়ে এবং চাষবাসের ক্ষেত্রে একপ্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেইসঙ্গে অভিবাসন উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে অনেক পরিবর্তন আনে। রাজবংশী জাতির জীবনযাপন ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। সর্বোপরি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত বর্ণহিন্দুদের অভিবাসনের ফলে এতদঞ্চলের বাসিন্দাদের স্থায়ী আধিপত্যের উপর আঘাত আসে। আবার বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে এবং একত্রে বসবাসের ফলে রাজবংশীদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির উপর চাপ বাড়তে থাকে। রাজবংশী সমাজের একাংশের মধ্যে বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং নিজের সংস্কৃতির মধ্যে যেন অজান্তেই পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে। অবস্থাপন্ন রাজবংশীরা শহরে অভিবাসিত হতে থাকেন, ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় পাঠাতে আগ্রহী হন ও পরিবারের ঐতিহ্যশালী পেশা কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য পেশা গ্রহণেও আগ্রহী হন। ক্রমাগত রাজবংশীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও জীবনশৈলীর পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহী হতে বাধ্য হন। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তে বর্ণহিন্দু সমাজের পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে থাকেন। আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটান। নিজের সমাজের তথাকথিত অনগ্রসর দলের কাছে নিজেদের উন্নততর ভাবতে থাকেন। এর ফলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে যে সাম্যতা ছিল তার অভাব ঘটতে থাকে এবং সমাজে অদৃশ্য এক উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির উদ্ভব হয়। সামাজিকভাবে অগ্রসর এইসব মানুষেরা তাদের সমাজের অনগ্রসর রাজবংশীদের সঙ্গে মেলামেশাও বন্ধ করে দেন, ফলে রাজবংশী সমাজের মধ্যে একপ্রকার সামাজিক বিভেদের জন্ম হয়। অন্যদিকে জমিহারা, সর্বহারা রাজবংশীরা টিকে থাকার লড়াইয়ে দিনমজুর, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা থেকে শহরাঞ্চলে কিংবা অন্যান্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হন। পাশাপাশি অভিবাসিত জনগণ বিভিন্ন ভাবে কৃষিকার্য, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা চাকরি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার ফলে চিরাচরিত গ্রামীণ কাঠামোটি বদলে যায়। অভিবাসিত জনগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এতদঞ্চলের রাজবংশীরা কোন দিক থেকেই পেরে ওঠে না বরং আর্থ- সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক সংকটের আবর্তে অবতীর্ণ হন। বলা যায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়েন। ফলে রাজবংশী সমাজ জীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে।

সময়ের স্রোতে শিক্ষা, যোগাযোগ তথা আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে। নগরায়নও প্রসারিত হয়েছে। সংঘবদ্ধ জীবন গ্রামীণ জীবন থেকেও উধাও হয়েছে। বিশ্বায়িত বিজ্ঞাপনী প্রচারেও জনজীবন আর আবদ্ধ নয়। আবার বর্তমান প্রজন্মের কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে মিশ্র সংস্কৃতির হাতছানি । রাজবংশী সমাজও তার বাইরে নয়। দ্রুত পরিবর্তনের সাপেক্ষে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির লোকায়ত রূপটিও দ্রুত পরিবর্তমান। এমনি গ্রামীণ জীবনের কাঠামোর বদল ঘটেছে, জনবিন্যাসের চরিত্রও পালটেছে, রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যাও এখন হাতে গোনা। সর্বোপরি রাজবংশী সমাজের মনন মানসিকতাও আর আগের মত নেই। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ভাবে সময় ও সংকটের আবর্তে আবর্তিত। জীবনযাপনের অভিমুখও আর আগের মত নেই। স্বাভাবিকভাবে লোকায়ত পরিসরটি অক্ষুণ্ণ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও বলা যায় রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির লোকায়ত পরিসরটি শত সমস্যায়ও একেবারে হারিয়ে যায়নি। অনেক পরিবর্তন ও গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে বজায় আছে। এখনও তাই গ্রামে গঞ্জে লোকায়ত সংস্কৃতির বিষয়গুলি নজরে আসে। রাজবংশী মানুষেরা সাধ্যমত পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শহর ও গ্রামের রাজবংশী মানুষের মধ্যে বিভেদরেখাও তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকায়ত পরিসরটির বিষয়ে সবাই কমবেশি সচেতন। রাজবংশীদেরও একটা মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে উন্নাসিকতা কিংবা বর্ণহিন্দুদের মত মনোভাবও তৈরি হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ আজও অনেক পরিবর্তনকে মেনে নিয়েও লোকায়ত পরিসরে স্বচ্ছন্দ এবং সাধ্যমত যত্নবান। সেটা রাজবংশী সমাজের একটা অংশ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে। রাজবংশী সমাজের ঘরবাড়ির চেহারা পাল্টেছে। বাড়িঘরের সেই অবস্থান এখন খুঁজেই পাওয়া যাবে না। ঘরোয়া চলাফেরায় এখন অতীতের সেই ছবি নেই। পুরুষ মহিলা সবাই এখন জীবন-জীবিকার স্বার্থে বাইরে ছুটছে। সেরকম কোন বিধিনিষেধ নেই। অবসর এখন উধাও। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ক্রিয়া-কর্ম, বিনোদন থেকে পূজা-অর্চনা লোকায়ত আচার-সংস্কার সবেতেই এখন পরিবর্তন এসেছে।

বর্ণহিন্দু সমাজের অনেক কিছুই তারা গ্রহণ করেছেন পরিস্থিতির চাপে। বর্ণহিন্দুদের পূজা-অর্চনায় এখন রাজবংশীরা সমানভাবে অংশ নেন। লক্ষ্মীপূজার রেওয়াজ এখন রাজবংশী সমাজে সংযোজিত হয়েছে। শারদীয়া দুর্গোৎসব এখন ভাণ্ডানী দেবীর বিকল্প হয়ে রাজবংশী সমাজে গৃহীত। যদিও ভাণ্ডানী দেবীর পূজা ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি জেলা), কামাখ্যাগুড়ি (আলিপুরদুয়ার পূর্বাংশ) কিংবা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার কিছু জায়গায় সম্পন্ন হয়। সরস্বতী পূজাও নয়া সংযোজন। যাত্রা পূজা, যা ছিল সরস্বতী পূজার

নামান্তর তার পরিসর কমেছে। খুব কম পরিবারেই এখন যাত্রা পূজা করে। স্বাভাবিকভাবে গবাদি পশুর পরিচর্যা কিংবা হাল যাত্রার রেওয়াজও হারিয়ে যাওয়ার পথে। জামাইষষ্ঠীর মত অনুষ্ঠানও বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শেই আজকে রাজবংশী সমাজে অন্তর্ভুক্ত। বরং এখন অষ্টমঙ্গলার বিষয়টি গৌণ হয়েছে। দলবেঁধে কন্যা পক্ষের বাড়ির লোকের যাওয়ার ছবি এখন নস্টালজিক মাত্র। এমনকী দেশীয় বাজনা পার্টির (সানাই, কড়কা, বাঁশি সহ) সংখ্যা এখন কমেই গেছে। সানাই-র করুণ সুর এখন রাজবংশী মানুষের স্মৃতির কোঠায়। বিয়ের শুরুতে মাড়েয়া গানের আসরও আর সেভাবে বসে না, নিয়ম রক্ষার্থে পূজা-অর্চনা কিংবা নমঃ নমঃ করে অল্পক্ষণের আসর বসানো হয়। অন্নপ্রাশন কিংবা নামকরণের পুরোনো ঐতিহ্য আর নেই। এমনকী নামকরণের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব লক্ষণীয়। আগের মত বস্তুভিত্তিক কিংবা সময়ভিত্তিক নামকরণ এখন করে না রাজবংশী পরিবারগুলো। আগে যেমন বুরুং, ধদলং, বালিয়া কিংবা ফাগুয়া এসব নামের সংস্কার এখন উঠে গেছে। আগে মাসের নামে, ঘটনার নামে কিংবা চেহারা স্বভাব দেখেও নামকরণ করা হত। বিয়েতে 'পানিছিটা' বাপ কিংবা 'মিস্তর' ধরার রীতি শহরাঞ্চলের রাজবংশী ভাবনা থেকে উধাও হয়েছে। যদিও গ্রামাঞ্চলে রাজবংশীরা এখনও এই রীতিটি ধরে রেখেছে। আগে আশীর্বাদের সঙ্গে টাকা পয়সা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল, এখন দেখা যায় না। বিয়ের গান নাচের পর্ব হারিয়েই গেছে বলা যায়। গুয়াকাটা, নারদের ভার এখন নেই। ভাটাইত/ফারুয়া (ঘটক) কমেছে। কলা পাতায় কিংবা খোলে খাওয়া দাওয়ার রেওয়াজ ক্যাটারার কেড়ে নিয়েছে। দই, চিড়ে খাওয়ার বিষয়টি একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আগে তো রাজবংশীরা রোজ চিড়ে কুটে খেত। সঙ্গে বহু প্রকারের দই। পানসা দই, ট্যাঙ্গা দই, ঝাল ট্যাঙ্গা দই, ছাচি দই, কাচা দই প্রভৃতি বিচিত্র নামের বিচিত্র স্বাদের দই। বউভাতের সময় গ্রামের পাঁচ দেওয়ানীর মান্যতা প্রদান এখন আর ততটা জরুরি নয়। সর্বোপরি বর্ণহিন্দু ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বিয়েও সম্পন্ন হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সংযুক্তি ঘটেছে। অধিকারী পুরোহিতের গুরুত্ব কমেছে। তাদের সংখ্যাও কমেছে, গ্রামাঞ্চলে যাও বা আছে শহরাঞ্চলের রাজবংশীরা এখন বলা যায় সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গেই অভ্যস্ত। বিষুয়া পরবের নিয়মকানুন তারা জানেন না, গ্রামাঞ্চলেও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। বিষুয়া উপলক্ষে শিকারের পর্বটি অনেকদিন আগেই বর্জিত হয়েছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের বিধিনিষেধে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মাছ মারার বিষয়টি কোথাও কোথাও থাকলেও নিয়ম রক্ষা মাত্র হয়েছে। কিন্তু লোকায়ত সংস্কারের যেমন- কান্দির জল তৈরি, দুপুরে 'ভাজাভুজা' খাওয়া, ২২ প্রকার শাক খাওয়ার যে রীতি অনেকক্ষেত্রেই সেটা নেই। দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে একসঙ্গে শাক রান্না করে খাওয়ার রীতি ছিল। যদিও মালদহ জেলাতে রাজবংশীদের মধ্যে ভাজাভুজা কিংবা শাক খাওয়ার রীতি বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে। পান্তাভাত খাওয়ারও রীতি (সংক্রান্তির রাতে রেখে পরের দিন পয়লা বৈশাখে) এখন আর মানা হয় না। মালদহ জেলার রাজবংশীরা 'ছাতু বাড়ান' (চণ্ডীমণ্ডপে ছাতু উৎসর্গ করে দুপুরে খায়) প্রথা অনুসরণ করে। বাস্তুঠাকুরকে পূজার প্রথাটি এখন সংকুচিত। সেইসঙ্গে ঘরের চালে গাঁজা, বিস্তি, বিষ ঢেকিয়া, ময়না, পানিমুথারি, পাতা গুজে রাখা ইত্যাদি প্রথাও এখন হারাতে বসেছে। তুলসী গাছে 'ঝরা' ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রথাটি খুব বেশি দেখা যায় না। তবে অসমের গোয়ালপাড়া জেলার রাজবংশীরা বিষুয়া পরবে এখনও এই আচারগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কিংবা দার্জিলিং জেলার রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামে বিষুয়া পরবে নিয়মরক্ষার জন্য সামান্য কিছু অনুষ্ঠান করা হলেও লোকায়ত পরিসরটি অনেকটাই লোকান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ জীবন-জীবিকায় ব্যস্ততা সেইসঙ্গে প্রবীণ-প্রবীণাদের সংখ্যা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মাচারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের সমস্যা এবং অপ্রতুলতা। বর্তমান সময়ে গ্রামাঞ্চলের রাজবংশীরা বিষুয়া পরবকে মাথায় রাখলেও শহরে বসবাসকারী রাজবংশীরা অধিকাংশই স্মৃতির পাতায় রেখে দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলেও বাস্তু ঠাকুরের পূজা দেবার বিষয়টিও এখন সর্বস্তরে পালিত হয় না। অথচ এই বিষুয়া পরবকে ঘিরে চার-পাঁচ দশক আগে রাজবংশীদের বাড়িতে সারাদিনই বহু লোকায়ত আচার-সংস্কার পালিত হত। আজকে বিশ্বায়ন ও ভুবন যুগের সন্ধিক্ষণে রাজবংশী সমাজ জীবনের এই অন্যতম বিষুয়া পরবের গুরুত্ব হারাতে বসেছে। একইভাবে আমাতি (অম্বুবাচী) পরবের বিষয়টিও গুরুত্ব হারাচ্ছে। নিয়ম আচার পালনে শিথিলতা এসেছে। অতীতে রাজবংশী সমাজে এই আমাতি পরবটির সঙ্গে কামাখ্যা বসুমতীর যোগাযোগের ভাবনা সক্রিয় ছিল। বসুমতি রজঃস্বলা অশুচ হিসাবে ঠাকুরবাড়িতে সান্ধ্যপ্রদীপ না দেওয়া, পূজাপার্বণ বন্ধ করা, মাটি না খোঁড়া, চাষবাস বন্ধ রাখা ইত্যাদি পালনীয় কৃত্যাদি ছিল। বর্তমানে ভূমিহীন

রাজবংশীদের কাছে এই 'আমাতি' শুধু নামমাত্র। ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত রাজবংশীরাও এই লোকায়ত পরিসরটিকে অনুসরণ করেন মাত্র। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশীরা বর্ণহিন্দুদের মতই অম্বুবাচী পালন করেন। এখানে অম্বুবাচী 'আমৈৎ' হিসাবে পরিচিত। রাজবংশী মহিলারা উপবাস করে কচুপাতায় দুধ, খৈ, আম ইত্যাদি ফল বাস্তুদেবতা, তুলসী মণ্ডপ অন্যত্র শুদ্ধ জায়গায় রেখে দেন সর্প দেবতার উদ্দেশ্যে। মূলত: এই আমাতি পরবটি প্রজনন শক্তির পূজা এবং তৎসংক্রান্ত ধ্যানধারণা বটে। রাজবংশী সমাজ এই কৌম পরিসরটিকে অনুসরণ করে। যদিও এখনও ভূমি নির্ভর রাজবংশী সমাজের এই পরবটি আজকে নানাভাবে সংকটাপন্ন। প্রবীণ-প্রবীণারা এই আমাতি বা অম্বুবাচী পরবটিকে অনুসরণ করলেও বর্তমান প্রজন্মের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। সংকীর্ণ হচ্ছে লোকায়ত সংস্কৃতির পরিবৃত্তটি। মূলত: ভূমি নির্ভর সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনটাই মুখ্যত দায়ী । রাজবংশীদের অনেকের কাছে এই পরবটি আজকে বাহুল্য মাত্র । রাজবংশী সমাজের কৃষি কৃত্যাদির অনুষ্ঠানগুলি সংক্ষিপ্ত হয়েছে, 'গচিবুনা' অনুষ্ঠানটি করা হলেও বাস্তু ঠাকুরের পূজা ও অন্যান্য কৃত্যাদি সংক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানটি এখনও উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই রাজবংশীরা সম্পন্ন করেন। তামাক চাষের ক্ষেত্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীরা অনেক সময় 'গচিবুনা' পালন করেন। তবে গচিবুনার পূর্বে গ্রাম ঠাকুরের পূজার বিষয়টি অবলুপ্ত হয়েছে। কর্ষিত ভূমিতে নৈবেদ্যর সঙ্গে ৫/৭টি বিছনের থোক রোপণ করে পাট, কলা, কচু, দূর্বা ঘাস রোপণ করে গচিবুনার পর্বটি সম্পন্ন করে গৃহকর্তা। অধিকারীর দরকার পড়ে না । তামাক চাষের ক্ষেত্রে মানকচুর পাতা ও পানের পিক ফেলার রীতি সংস্কার প্রচলিত। আরও বিবিধ নিয়ম থাকলেও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আবার জেলাভিত্তিক সংস্কার রীতিও আলাদা আলাদা হয়েছে। ড. চারুচন্দ্র সান্যালের মতে গচিবুনা আসলে লক্ষ্মী পূজা নয় 'মা ধত্তির' অর্থাৎ ধরিত্রীদেবীর পূজা। গচিবুনাকে কেন্দ্র করে রাজবংশীদের কৃত্যাদি এই ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ভূমি নির্বাসনের সাথে সাথে গচিবুনার কলেবরও কমেছে বলা যায়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে 'ধানের ফুল আনা' ও 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটির কলেবর কমেছে। আগে নতুন ধানের চাল, চিড়ে প্রথমে নৈবেদ্য হিসাবে ঠাকুর দেবতাকে তুলে দেওয়া হত। ধানের ফুল আনা বা আগ নেওয়া অনুষ্ঠানটি গৃহকর্ত্রী নিষ্ঠা সহকারে করেন। হৈমন্তিক বা হেউতি ধানের ক্ষেত্রে এই রীতি আজও প্রচলিত। তবে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যেহেতু বোরো ধানের চাষ বহুল পরিমাণে হয় সেক্ষেত্রে নিয়মাচারে ধানের ফুল আনার বিষয়টি অন্যভাবে পালিত হয়। মনসা, লক্ষ্মী বা বুড়িকালীর উদ্দেশ্যে পূজা প্রদান করে ধানের ফুল আনার নিয়ম রক্ষা করা হয় । থানছিরি দেবীর কাছে ধানের শিষ রাখার নিয়ম মানা হয় না। তবে নবান্ন বা নয়া খৈ হৈমন্তিক বা আমন ধানের ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য ধানের ফুল আনা এবং নয়া খৈ অনুষ্ঠান পালন না করে রাজবংশীরা নতুন ধানের ভাত গ্রহণ করেন না। অগ্রহায়ণের শুরুতেই 'নয়া খৈ" অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি জাঁকজমকপূর্ণ করে এই 'নয়া খৈ' বা নবান্ন অনুষ্ঠানটি করলেও সংখ্যানুপাতে গরিব প্রান্তীয় রাজবংশীদের অভাবী সংসারে ঠাকুর দেবতাকে উৎসর্গ করেই 'নয়া খৈ' অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বাইরে লোকজনকে ডেকে খাওয়ানোর সুযোগ থাকে না। অতীতে পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল সেইসঙ্গে শেয়াল ঠাকুরের নামেও ভাত তরকারি উৎসর্গ করা হত। এই নিয়মটি কোচবিহার জেলায় এখন পালিত হয় না । জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় অতীতে ২১টি কলার ঢোনা (কলার খোল দিয়ে তৈরি ছোট পাত্র বিশেষ) কিংবা পাতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে সঙ্গে পুঁটিমাছ পুড়িয়ে বাইরে রেখে দিয়ে আসা হত। আবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী পরিবারগুলি 'নয়া খৈ'র দিন মহাবারিক নামে এক দেবতাকেও নৈবেদ্য দেওয়ার সংস্কার ছিল। সাধারণত ঘরের চালে রেখে দেওয়া হত। অদ্ভুত ভাবে এক্ষেত্রেও পোড়া পুঁটিমাছ কাঠিতে গেঁথে দেওয়ার সংস্কার প্রচলিত ছিল। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় শিয়াল ঠাকুর, নিশা বা মহাবারিক কোন দেবতাকেই পূজা দেওয়ার সংস্কার নেই। ধান কাটাই, মাড়াই-এর পর গোলাজাত করার আগে 'বুড়াবুড়ি' অনুষ্ঠানটিও কৃষিকৃত্যাদির মধ্যে পড়ে। শিশুদেরকে দিয়ে এই বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠান মাথায় এবং বাংকুয়ায় ধানের আঁটি নিয়ে তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর পুকুরের জলে নিক্ষেপ করার এই বুড়াবুড়ির অনুষ্ঠানটি এখন প্রায় লুপ্ত। কারণ আগের মত খোলান বাড়িতে ধান জমিয়ে রেখে অনুষ্ঠানের সুযোগ নেই। প্রতিদিনই কাজ করে বস্তাবন্দি করা হয়। অথচ এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে লোকায়ত বিশ্বাস ছিল। ভাবনার কিছু বিষয় সুদূর অতীত সময় থেকে যুক্ত ছিল। সময়ের কালস্রোতে এবং সামাজিক কাঠামো বদলের ফলে এই বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায় । আরেকটি বিষয় অতীতে দলবেঁধে কোন গৃহস্থের জমিতে চাষ করার ব্যবস্থা করা হত। খাওয়া দাওয়ার বিনিময়ে যা ছিল যৌথ শ্রমের আদিম রীতি। যা 'হাউলী' নামে পরিচিত। আবার 'গাতা' পদ্ধতিতে একে একে সবার জমি দলবদ্ধভাবে চাষ করার রীতিও প্রচলিত ছিল। এই সমবায় সমন্বয় মানসিকতার বিরাট প্রভাব ছিল রাজবংশী সমাজে। বর্তমানে এই প্রথা উঠে গেছে। আগে এভাবে সবার জমি চাষের বিষয়টি সময়মত সম্পন্ন হত। নিজেদের মধ্যে এক সমৃদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হত। আরেকটি বিষয় আগে কারো পাঁঠা বা খাসি সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়ার রীতি ছিল। যা 'ভাগন' নামে পরিচিত ছিল। সেটাও রাজবংশী সমাজ ভাবনা থেকে অপসৃত হয়েছে। দল বেঁধে মাছ মারার 'বাহো' উৎসবও লুপ্তপ্রায়। আগে শিঙা ফুকিয়ে গ্রামবাসীকে আহ্বান করা হত। রাজবংশী সমাজে মাছ মারাও ছিল একটি উৎসব। হাল আমলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সংযোজন ঘটেছে বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে। মূলত ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজাটি রাজবংশী সমাজের আদি পূজা । আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন বৃহস্পতিবার না হলে কার্তিক মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজা হত। বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজাটি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণকে

দিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাতেই অভ্যস্ত হয়েছে কিছু পরিবার বিশেষ করে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ রাজবংশীরাই এটা করছেন। ক্ষেতি লক্ষ্মী পূজার অপর নাম ডাকলক্ষ্মী পূজা । আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ ডাক সংক্রান্তিতে পূজা দেওয়ার কারণে 'ডাকলক্ষ্মী' হিসাবে পরিচিতি পায়। এইদিনে ক্ষেতে, ঘরে, ঠাকুরের পটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের বিশেষ রীতি আছে। ক্ষেতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন 'ভোগা' দেওয়ার সময় চিৎকার করে ছড়া বলা হয় "আগ শোরহাট, পোকামাকড় দূর হউক।" মূলত কীটপতঙ্গ দূর করার প্রয়াসে এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। অনেকে কাঠিতে করে কাঁঠাল পাতায় সরষে তেলের প্রদীপ বানিয়ে প্রজ্জ্বলন করেন। আবার অনেক রাজবংশী পরিবার এই দিনে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো শুরু করেন। এখন আকাশ প্রদীপের প্রচলন কমেছে। তবে এখনও গ্রামে গঞ্জে দেখা যায়। ধান ক্ষেতে 'ভোগা' দেওয়া (ঘিয়ের প্রদীপ) রীতি আজও পালন করে রাজবংশী সমাজ। বিশেষ করে যারা এখনও চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। আলিপুরদুয়ার জেলার পূর্বাংশে 'চালতা'য় করে পাঁচকোল বাতি দেওয়ার রীতি এই দিনেই প্রচলিত। 'চালতা' রাজবংশী সমাজে 'পাঁচকোল' নামে পরিচিত। বাতি দেওয়ার সময় চিৎকার করে বলা হয় "সগারে ধান টোনা মোনা, আমার ধান সিদায় সোনা' অর্থাৎ অন্যদের ধান দুর্বল কিন্তু আমার ধান যেন সোনার দানা হয়ে ওঠে। পাঁচকোল বাতি দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্ষেতের দুষ্ট পোকামাকড় বিনষ্ট করা। কারণ এই সময় পোকার উপদ্রব শুরু হয়, ধানও তখন হয়ে ওঠার পথে, আলোতে প্রচুর পোকার মৃত্যু হয়। কৃষিকৃত্যাদির এইসব অনুষ্ঠানগুলি আজও রাজবংশীরা পালন করেন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আর এই ধরনের কৃষিকৃত্যাদির অনুষ্ঠানের মধ্যে জড়িয়ে আছে রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি।

পুষুনা অর্থাৎ পৌষ পার্বণের পর্বটি এখন সংক্ষিপ্ত। অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে পুষুনার সেই উন্মাদনা আর নেই। শহরের রাজবংশীরা তো কোন নিয়ম সংস্কারই পালন করেন না। অতীতে চার-পাঁচ দশক আগেও রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে এই পুষুনাকে ঘিরে বেশ কিছু লোকায়ত উৎসব প্রচলিত ছিল। সকালে গরুকে স্নান করিয়ে পিঠা খাওয়ানো, বাস্তু ঠাকুর ও অন্যান্য দেবদেবীকে উৎসর্গ করে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ পিঠা খেত।

অধিকারী ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজাও করা হত । বহু আগে শিকারের প্রথাও প্রচলিত ছিল। মহাবারিকের (বৌদ্ধিয় রীতি) উদ্দেশ্যেও পিঠা উৎসর্গ করার রীতি রাজবংশীরা একদা অনুসরণ করতেন। বর্তমানে বলা যায় কোন নিয়মই সঠিকভাবে পালন করা হয় না। গিরিজাশংকর রায়ের ভাষায় "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে কোন প্রকারে প্রথাটি টিকিয়া রহিয়াছে।" পৌষ পার্বণের দিন বালকেরা সারারাত জেগে থেকে 'ভ্যাড়া ঘর' পুড়িয়ে স্নান করত। সেদিন বাড়ির গবাদি পশুকে স্নান করিয়ে তাদের গায়ে চালের পিটুলী গুলিয়ে কলাপাতার ডাঁটি দিয়ে গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হত। বর্তমানে গ্রামগঞ্জে কিছু সংস্কার এখনও পালিত হয়। কিন্তু শহরের রাজবংশীরা বর্তমানে কোন সংস্কারের প্রতি বশবর্তী নয়। আর সুযোগও নেই এই অজুহাতে ভুলে থাকেন।

কয়েক দশক আগেও রাজবংশী সমাজে বন্ধুত্ব স্থাপন সূচক নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বিয়েতে 'মিস্তর ধরা' গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই মিস্তর ধরার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটত দুই বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে। 'সখা হালা'র মধ্য দিয়ে দুই বন্ধু ও পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হত। আজীবন সেই সম্পর্ক বজায় থাকত। আবার মেয়েদের মধ্যে সখি পাতানো অনুষ্ঠান 'ভাদাভাদি' নামেও পরিচিত। ধর্ম ঠাকুরকে সাক্ষী করে সই পাতানোর বিষয়টি রাজবংশী সমাজে আত্মীয়তা সম্প্রসারণের উদাহরণ। মূলত এই তিন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যেই রাজবংশী সমাজের উদারতার ছবিই ধরা পড়ে। যার জন্য রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামে একটি কথা প্রচলিত 'গ্রামের সবাই সবার আত্মীয়', কোন না কোন সম্পর্কে আত্মীয়তার বন্ধন বিস্তৃত হয়েছে। এই সখি পাতানোকে ঘিরে কোচবিহার জেলার দিনহাটার নগরভাংনী গ্রামে চৈত্র মাসের বারুনী তিথিতে 'সখীর মেলা' বসে। এখনও সেখানে সই পাতানোর ছবি দেখা যায়। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেও অনেকে এই সই পাতানোয় আবদ্ধ হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি রাজবংশী সমাজে এক বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব বহন করত। বর্তমান বিশ্বায়িত সময়ে এইসব সম্পর্কের গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়েছে। রাজবংশী সমাজের মধ্যে এই লোকায়ত সম্পর্কের কিছু বিষয় এখনও লেগে আছে বইকি। তবে সেটা কতদিন, সেটাই প্রশ্নের। কারণ ইতিমধ্যে এই সম্পর্কগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট কমেছে।

লোকায়ত সংস্কারে 'বট-পাখিরীর বিয়া' কিংবা 'জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো'র বিষয়টি এখন বিশেষ নজরে আসে না। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় অপুত্রক ব্যক্তি বট-পাকুড়ের বিয়ের আয়োজন করতেন। অনুষ্ঠান করেই অধিকারী পুরোহিত দিয়ে এই বিয়ে সম্পন্ন হত, এই প্রথা বহু প্রাচীনকালের বৃক্ষ ভাবনার পরিচায়ক। জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানোও বিষয়টি বৃক্ষ ভাবনারই আরেকটি দৃষ্টান্ত। মূলতঃ মৃতবৎস্যা নারী সন্তান কামনায় এই জিগা গাছকে সই পাতানোর সংস্কারে আবদ্ধ হন। গাছটির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে। জিগা গাছটি এখানে নারী হিসাবে প্রতিপন্ন হত। জিগা গাছ যেহেতু দীর্ঘজীবী সেখানে সন্তানের বেঁচে থাকাকে প্রাধান্য দিয়ে জিগা গাছ রাজবংশী সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের লোকায়ত সম্পর্কগুলির প্রভাব এখন কমেছে। সচরাচর 'বট-পাখিরীর বিয়া' কিংবা 'জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো'র বিষয়টি নজরে আসে না। তবে কয়েক দশক আগেও এই বিষয়গুলি প্রায়শই নজরে আসত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজের প্রাচীন ভাবনাগুলিরও অবলুপ্তি ঘটছে এটা যেমন বলা হয় তেমনি লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও ছোট হচ্ছে।

মালদহ জেলা গাঙ্গেয় সভ্যতার অধিকারী বলে এই অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে অরাজবংশী বর্ণহিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব পড়েছে এবং সেটা উত্তর ও দক্ষিণ

দিনাজপুরেও কিছুটা সম্প্রসারিত হয়েছে। আবার অপরদিকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতি মূলত কোচবিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং জেলাগুলিতে এখন রাজবংশী আচার অনুষ্ঠানের সমতা দেখা যায়।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে রাজবংশীদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বলা যেতে পারে এই কয়েকটি জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রায় সবাই এখন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের রাজবংশীরা। শহরের ভিন্ন ভিন্ন পেশায় যুক্ত থাকায় রাজবংশী মানুষজন বাইরে থাকলেও তারা সংস্কৃতিগত দিক থেকে বর্ণহিন্দুদেরই কাছাকাছি। ফলতঃ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও দ্রুত পরিবর্তমান। অনেক কিছুই লোকান্তরিত। আবার পালিত হলেও নিয়ম সংস্কারের পরিসরটি একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। সমীক্ষায় উঠে আসে কৃষিকৃত্যাদির অনেক অনুষ্ঠানই এখন পালিত হয় না। এখন অবশ্য শস্য বৈচিত্র্যর ফলে চাষবাসের প্রকৃতি পালটে গেছে, শুধুমাত্র হৈমন্তিক (হেউতি) চাষাবাদে সীমাবদ্ধ নয়। গচিবুনা-গোচরপনা, ক্ষেত বাড়ানো (নতুন ধানের ভাত ও অন্যান্য উপকরণ পাথার বাড়ি অর্থাৎ বাইরে উৎসর্গ) এখন নেই। নতুন ধানকে ঘিরে ধানের ফুল আনা, বুড়াবুড়ি অনুষ্ঠানও নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় এই বিষয়টি লক্ষণীয়। দু'একটি পরিবারের মধ্যে কিছু নিয়ম সংস্কার থাকলেও অতীতে খোজাগর (কোজাগরি) মাগন বহুল প্রচলিত ছিল। ছেলেরা ছুরি সেজে নাচগান করত বাড়ি বাড়ি, মাগন তোলা হত। এখন যা নজরে আসে না। 'হালুয়া হালুয়ানীর গান'ও বিলুপ্তির পথে। 'খন গান' এখন সরকারি প্রচারেই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রেম পিরিতি কিংবা সামাজিক ঘটনায় সীমাবদ্ধ নয়। উত্তর দিনাজপুর জেলায় আগে বাউল-এর প্রভাব ছিল না। ছিল কিছু গেরুয়া পোষাক পরিহিত সাধু-বোষ্টম মানুষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষার গান শুনিয়ে বেড়াতো। সাধুমেলা হত। সেটাই কয়েক দশকে বাউল সমাবেশে পরিণত হয়েছে। হারিয়ে গেছে দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা গানের ভাণ্ডার। মূলত দেশীয়া তথা রাজবংশী সমাজেই এইসব গান বহুল প্রচলিত। অবশ্য অন্যান্য জেলা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতেও এইসব গানের ব্যাপক প্রচার ছিল । ময়নাগুড়ি এলাকায় তন্ত্র সাধনার গান হিসাবে গানের প্রসারও কমেছে। অতীতে ধূপগুড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি জেলা) এলাকায় গানের বহুল প্রচার ছিল। অতীতে পূজা- পার্বণেও এই গানগুলি গাওয়া হত। পার্শ্ববর্তী দার্জিলিং জেলার লাহাংকারী গানের ধারা এখনও বজায় আছে। তবে প্রতিবন্ধকতা অনেক। কারণ অনুষ্ঠান বা গানের আসরের সংখ্যা কমেছে। বেসরকারি উদ্যোগে আগের মত অনুষ্ঠানের আয়োজন এখন হয়না। কারণ আগের মত পৃষ্ঠপোষকের অভাব রাজবংশী সমাজে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুশমণ্ডি, তপন এলাকায় মনসামঙ্গলের আসর বসে বিভিন্ন বাড়িতে। সত্যপীরের গানের আসরও বসে, লক্ষ্মীর গানও প্রচলিত। তবে সবেতেই পরিবর্তনের ধারা। ভাষা, ভঙ্গিমায় পোষাক-আশাকের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক শ্রোতারও সংখ্যাটা কমেছে। তাদের রুচিও পাল্টেছে। এটা বলা যায় ধারাগুলি হারায়নি। দিনাজপুরের জনবিন্যাস ও অন্যান্য প্রেক্ষিতে আজও এই ধারাটি রাজবংশী সমাজ ধরে রেখেছে।

বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় দেশীয়া, পলিয়া কিংবা কোচদের মধ্যে এখন তেমন বিভেদ নেই। অতীতে গোষ্ঠী মানসিকতা থাকলেও বর্তমানে সবাই মেনে নিয়েছে সমস্ত গোষ্ঠীই বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজেরই অংশ। আবার বর্ণহিন্দুদের অনেক কিছুই গ্রহণ করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় যে বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিগত বিশ্বাস এবং পালনীয় আচার-সংস্কারের মধ্যে যে ঐক্যগত সাদৃশ্য সেখানে বর্তমানে আলাদা করে ভাববার অবকাশ কমেছে। তবুও সামান্য কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজস্ব আচার সংস্কারগুলি পালন করার চেষ্টা করে। কিন্তু বৈষ্ণবায়ন অনেক কিছুকেই মুছে দিয়েছে। মালদহ জেলার গাজল, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার সবাই বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় মানুষ। একলাখি পাণ্ডুয়া অঞ্চলের রাজবংশীদের মধ্যে দেহবাদী, তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রসার ছিল। আজকে সেই ধারা বৈষ্ণবায়নে পর্যবসিত। বিয়ের পরের দিন থেকে তুলসীর মালা গলায় ধারণ করে। আবার বিয়েতে চণ্ডী পূজার প্রচলন আজও আছে। অদ্ভুত বৈচিত্র্য, সেখানে কোন বিরোধ তৈরি হয়নি। আবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে পুরোহিত দিয়েই সমস্ত পূজা-অর্চনার কাজ করে রাজবংশী সমাজের দেশীয়া, পলিয়ারা। কোচ গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন মনসামঙ্গলের প্রভাব তেমনি দেশিয়া, পলিয়াদের মধ্যেও দেখা যায়। গঙ্গারামপুর, হিলি, বালুরঘাট এলাকায় পলিয়ারাও মনসামঙ্গলের অনুসারী। আসলে বৃহত্তর রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে বহু শাখাপ্রশাখার সম্মীলন হয়েছে যুগ ও সময়ের স্রোতধারায়। বৈষ্ণবায়ন এই কয়েকটি জেলার রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মনস্কতা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অনেক উদারীকরণ ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বেড়েছে। রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকুচিত হয়েছে।

মালদহ ও দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ) দেশীয়া ও পলিয়াদের মধ্যে নিয়ম আচার ও সংস্কারের মধ্যে একটা শিথিলতা এসেছে। ফলতঃ সবাই এখন বৃহত্তর রাজবংশী সমাজেরই অংশ। অনেকে উপবীত ধারণ করলেও বৈষ্ণব ভাবাবেগে এখন সবাই তুলসীর মালা ধারণ করেন বিয়ের পরেই। অতীতের অনেক কিছুই এখন বিবর্তমান। আবার বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে অনেক কিছুই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে এই জেলাগুলির রাজবংশী সমাজ এখন বৃহত্তর হিন্দুধর্মের অংশ। বরং বলা যেতে পারে মালদহ জেলার রাজবংশী সমাজ অনেক বেশি গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহে পরিপুষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটিও স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সেখানে উত্তরবঙ্গের

অন্যান্য জেলাগুলির সাংস্কৃতিক বিবর্তন কিংবা লোকায়ত অঙ্গন কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এবং আবর্তিত হয়। দার্জিলিং জেলার তন্ত্রভাবনার সংকোচন ঘটেছে। জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তবর্তী ময়নাগুড়ি এলাকার শৈব ভাবনার পাশাপাশি তন্ত্রসাধনা সহ বৌদ্ধিয় সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর মধ্যে। যেখানে ভোট-তিব্বতি প্রভাবও লক্ষণীয়। সেটা আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কুমারগ্রাম দুয়ার এলাকার রাজাঠাকুর কিংবা গাও বুড়ার পূজায় এখন শূকর বলি দেওয়া হয় না। তবে নিশান, শালু কাপড় বেঁধে দিয়েই মানত পূরণ করার রীতি আজও বর্তমান।

আবার মনসা বিষহরিকে হাঁস বলি দেওয়ার প্রথাও এই এলাকায় আর বর্তমান নেই। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় হাঁস বলি দেওয়ার রীতি আজও প্রচলিত। অবশ্য এটা সবার মধ্যে নেই বিশেষ করে তথাকথিত কোচ-রাজবংশীরাই এটা করে। মুখোশকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজার রীতি উত্তর দিনাজপুরের তপন, কুশমণ্ডি এলাকায় প্রচলিত । মুখোশ নৃত্যও অতীতে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সন্নিহিত এলাকায় প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে নেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মুখোশ নৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক আজও বর্তমান । আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার পূর্বাংশে কামরূপী ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকার থাকলেও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে রাজবংশীরা বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণ দ্বারাই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেন। বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণরা গৃহীত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। প্রান্তীয় জেলা আলিপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলাতে এখন দেশীয় কামরূপী মৈথিলী ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকার রাজবংশী সমাজে। চণ্ডী পূজার প্রচলন উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে যথেষ্টই কিন্তু আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার কিংবা জলপাইগুড়ি জেলাতে কম। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে কোচ-রাজবংশীরা অধিকারীর বদলে পুরোহিত দিয়ে লৌকিক সেবা নৈবেদ্যর কাজ সম্পন্ন করে। তবে উল্লেখ্য প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে যেমন কামরূপী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কমেছে তেমনি বর্ণহিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও অধিকারী পুরোহিতরা বাড়ির সেবা নৈবেদ্যর কাজে যুক্ত । তাছাড়া রাজবংশী সমাজেও যখন লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজার প্রচলন শুরু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে বর্ণহিন্দুদের অনুগমন ঘটেছে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বৈষ্ণবীয় প্রভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশীয়দের মধ্যে মাটির মূর্তির প্রচলন বেশি ঘটেছে। কালী, মনসা, বাস্তুদেবতা, চামুণ্ডা, লক্ষ্মী ঠাকুর, হনুমান, কোরাকুরী, হুদোম দ্যাও ইত্যাদির পূজা কয়েক দশক আগে হলেও বর্তমানে বিশেষ প্রচলিত নয় । অনেক দেবদেবী লোকান্তরের পথে। দক্ষিণ দিনাজপুরে বুড়ি ঠাকুরের পূজা গ্রামঠাকুরের পূজার মতই রাজবংশী সমাজের কাছে এখনও গুরুত্বপূর্ণ। মুখোশই দেবীর প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। মালদহ জেলার বামনগোলা থানার নিমডাঙ্গা, নালাগোলা; হবিবপুর থানার আতলা, দোতনা, সিঙ্গাবাদ; গাজল থানার রাণীগঞ্জ; ওল্ড মালদার বানিয়া ও নবাবগঞ্জ; কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ, সুকুনাপুর, চকবাহাদুর এবং চাঁচল থানার দৈভাণ্ডা ইত্যাদি অঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অধিক সংখ্যায় বসবাস। অতীতে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক সংস্কৃতি ও লোকাচারের উৎসব অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হত। পূজা-পার্বণ, লৌকিক ছড়া, প্রথা-প্রবাদ-প্রবচন, রূপকথা এসবের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চালচিত্র ফুটে উঠত। এছাড়াও ছিল গম্ভীরা, আলকাপ, লবকুশ, খন বা মিশা ও গ্রামীণ যাত্রা গান। এর মাধ্যমে সামাজিক অন্যায় অবিচারের কথা, নীতিশিক্ষা ও লোকশিক্ষা প্রচারিত হত। স্বাধীনোত্তর সময়কাল থেকে এই চিরায়ত ছবি দ্রুত পালটে যেতে থাকে। গাঙ্গেয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বর্ণহিন্দুদের প্রভাব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে রাজবংশী সমাজ সংকটাপন্ন হয়। আচার - সংস্কার থেকে পূজা-পার্বণ সবেতেই পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও পিছিয়ে পড়তে থাকে ফলে সামগ্রিকভাবে লোকায়ত সংস্কৃতির পরিসরটি সংকুচিত হয় ।

দেশীয়া, পলিয়াদের মধ্যে দেশীয়াদের নিয়মরীতি বেশি ছিল। আবার পলিয়াদের মধ্যে নিজস্ব কিছু রীতি সংস্কারে সমাজ পরিচালিত ছিল। পলিয়াদের মধ্যে সম্মানীয় কিছু ব্যক্তি 'পোচাম' এবং 'মোহত' নামে পরিচিত ছিল। তারা 'দশ' হিসাবে সমাজের রীতি ব্যবস্থা নির্ধারণ করতেন। আবার ১২ অথবা ১৮টি 'পোচাম' মিলে তৈরি হত 'পটি'। এই 'পটি' পলিয়াদের সামগ্রিক ভালোমন্দের বিচার করত। প্রয়োজনে পোচামদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পলিয়া সমাজে দিত। বর্তমানে এই ব্যবস্থা নেই, এখন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। দেশীয়া, পলিয়া সবাই এক ।

দেশীয়াদের বিয়েতে আগে 'কলাতলা' নামে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। জলপূর্ণ কলসী ও কলাগাছ দিয়ে 'কন্যামন' ও বরামন' ইত্যাদি সাজানো হত। বরাতীরা (যে চারজন সধবা স্ত্রীলোক ও বরের পরিচর্যার দায়িত্ব থাকে) বিয়ের অন্যান্য আচার-সংস্কারগুলি পালন করত। এখন সেইসব অনুষ্ঠান অনেক সরলীকৃত হয়েছে বর্ণহিন্দুদের নানা অনুষ্ঠানের প্রভাবে। গানের বিষয়টিও এখন সংকুচিত হয়েছে। অতীতের বাল্য বিবাহের রীতিটিও এখন প্রচলিত নয়।

বৌদ্ধ, হিন্দু ও পাঠান শাসকরা গৌড়কে রাজধানী হিসাবে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির ধারাপ্রবাহ গড়ে ওঠে। সুলতান আমলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। ষোড়শ শতকের গোড়ায় (১৫১৪-১৫) খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবও এখানে আসেন। স্বাভাবিকভাবে ধর্মের বহুমুখী ধারায় লোকায়ত সংস্কৃতিও বৈচিত্র্যময়। মালদহ জেলায় শিবের লৌকিক রূপের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে গম্ভীরা অন্যতম। উর্বরতা কৃষির দেবতা হিসাবে লোকবৃত্তে শিবের অবস্থান। সেটা শুধু রাজবংশী সমাজে নয়, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কাছেও সমানভাবে মান্য। চৈত্র সংক্রান্তির নানাবিধ লোকাচার (গোরুর স্নান, পূজা, ছাতু সংক্রান্তি, বিষুয়া, দর্পণ সংক্রান্তি) সাথে গম্ভীরার মহা সমারোহ শুরু হয়। সোনা রায় তো শিবেরই প্রকারভেদ, সোনা রায়ের পূজা হারিয়ে

যায়নি গৌড় এলাকা থেকে। এতদঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যেও শিবপূজা প্রচলিত। এরা মনসা পূজা করেন কচুপাতায় দুধ ও ঘি দিয়ে। মনসা বিষহরির পূজায় রাজবংশীরা হাঁস বলি দেয়। বিয়ে ও কোন শুভানুষ্ঠানের আগে মনসা পূজার রীতি রাজবংশীরা অনুসরণ করে তবে চণ্ডী পূজারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। অতীতে এই চণ্ডী পূজা রাজবংশীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত না থাকলেও বিগত কয়েক দশকে চণ্ডী পূজার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শুধু মানিক দত্তের জন্মস্থান বলেই নয়, রাজবংশী সমাজে চণ্ডী পূজার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ আছে। তার মধ্যে জাতি অন্বেষণে কোচ মহারাজা বিশ্বসিংহের চণ্ডী পূজার বিষয়টি নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।

পঞ্চদশ শতকে দিনাজপুরের রাজা যদু, ইসলাম ধর্মগ্রহণ করায় রাজবংশী সমাজের একটা বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী মানুষের বসবাস প্রায় সব গ্রামেই কম বেশি। বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রায় ত্রিশ শতাংশ গ্রামে শুধু রাজবংশী জাতি পরিচয়ের মানুষ বসবাস করেন। ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া সুলতান আমলে শুরু হয় । বহু রাজবংশী মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। আবার রাজবংশী জাতির মধ্যেও বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটে। রাজবংশী বর্তমানে হিন্দু কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে মিশ্র। কেউ শৈব্য, কেউ বৈষ্ণব। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যেমন দৃশ্যমান তেমনি আদিম সংস্কৃতির নিদর্শনও খুঁজে পায়। মৈথিলী-মাগধি সংস্কৃতিও প্রভাবিত করেছে। স্বাভাবিকভাবে লৌকিক দেবদেবীর মধ্যেও বহু সংস্কৃতির যেমন সমন্বয় ঘটেছে তেমনি প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করেও দেবদেবীর সংযুক্তি ঘটেছে রাজবংশী সমাজ জীবনে। শিব প্রধান দেবতা হলেও কালীর বহু প্রকারভেদ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পূজিত হয়। যেমন-বিন্দ্যেশ্বরী দেবী (পতিরাম গ্রাম, বালুরঘাট) পূজায় লাল শাড়িই প্রধান উপচার, হিলির চামুণ্ডা দেবী নিমকাঠে মুখায়বে পূজিত হয়। ডাকরা চণ্ডী, দাপট কালী শিব বিগ্রহের উপর মায়ের মুখোশ পড়িয়ে মাতৃ পূজা সম্পন্ন হয়। বোল্লা কালী দক্ষিণ দিনাজপুরের বহু প্রাচীন পূজা। এছাড়াও বাশুলি কালী, বসন্ত কালী, মাশান কালী, সুরকালী আরও বহুরূপে কালীর পূজা প্রচলিত। দক্ষিণ দিনাজপুরে 'বুড়িমা' খুব বিখ্যাত দেবী। তাকে ঘিরে গাছের তলায় বিভিন্ন দেবতার আশ্রয়, অনেকটা গ্রামঠাকুরের মত। হরিরামপুর থানার বৈরাটের বুড়ি অনেকগুলি জিহ্বা বের করে কালী মুখাদেবী বহালে পূজিত হন। এছাড়াও ছাঁচিকা দেবী, বাঘেরাই চণ্ডী, চামার কালী, উত্তরে কালী, উগুলিয়া চণ্ডী বিভিন্ন নামের লৌকিক দেবদেবী নিয়েই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকায়ত সংস্কৃতি। বিশ্বায়নের ভুবনগ্রামে অনেক দেবদেবীর গুরুত্ব হ্রাস পেলেও এখনও কিছু গ্রামগঞ্জে অস্তিত্ব আছে। তবে পরিবর্তন ও নতুন ভাবনার প্রভাব তো পড়েছে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় দেশীয়া, পলিয়া রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজেও লৌকিক দেবদেবীর ছড়াছড়ি। লোকায়ত ভুবনে এই দেবদেবীর আচার-বিচার, সমাজ ও ধর্মীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ জীবনের সঙ্গে বলা যায় অতিরিক্ত কিছু লৌকিক দেবদেবীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে সময় পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে। যেমন - গো-চুমার সঙ্গে দাগা পূজা। মহিষকে স্নান করিয়ে মাথায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে পূজা করার রীতি প্রচলিত। দলছিটা, কাঁঠাল পাতায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান আশ্বিনের শেষ কিংবা কার্তিক মাসের প্রথমে করা হয়। এই পূজা শেষে একটি হাঁসের মাথা ছিড়ে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় ধানের গোলায়। ছেঁপুয়ান অর্থাৎ কাকতাড়ুয়াও পূজা পায় রাজবংশী সমাজের কাছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় এখানে জলমাঙ্গা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ভিন্ন এক অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। অতিবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় রাজবংশীদের 'হরি লাঙ্গল কোদাল খিল চুনি চোখাই' অনুষ্ঠান। অতিবৃষ্টির হাত থেকে ফসল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রাত্রে পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে লাঙ্গল, কোদাল খিলে তেল সিঁদুর লাগিয়ে গোবরের ঢিপির সামনে পূজা করে। কালীপূজার রাত্রে কৃষি পূজাও অনুষ্ঠিত হয় লাঙ্গল আর কাদা দিয়ে। শিশুর সুস্থতা ও মঙ্গলার্থে হয় ভেদাই ঠাকুরের পূজা। 'মেথিনী দ্যাও'র পূজায় রান্নাঘরে বাড়ির মালিক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রান্না করা খাবারকে উপচার হিসাবে উৎসর্গ করে। নবান্নে হয় মহামারী ঠাকুরের পূজা। দুয়ারী কুয়ারীও রান্নাঘরের দেবতা, দরজায় তার অবস্থান। অনেক বাড়িতে দরজায় দুয়ারী ঠাকুরের বেদীও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামঠাকুর, বিষহরি দেবী, সইত্যপীর, বাবাঠাকুরের পূজাগুলি এখনও কলেবরে হলেও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর অনেকগুলি আজকে অন্তরালে। তবে গ্রামীণ এলাকার রাজবংশীরা এখন পাল পরবে এইসব দেবদেবীকে স্মরণ করে সামান্য দুধ কলা দিয়ে কিংবা কিছু আচার সংস্কার পালন করে। লোকায়ত ভুবনের অনেক অনুষঙ্গই আজকে অনেক কিছুর গ্রাসে হারিয়ে গেলেও এখনও কিছু কিছু আছে।

মালদহ জেলাতেও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে রাজবংশী সমাজ জীবন আবর্তিত হয়। চণ্ডী, বিষহরি, মনসা তো আছেই গম্ভীরাকে ঘিরে নীলকণ্ঠ শিবের আরাধনা মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। এছাড়াও কালীর কিছু প্রকারভেদ আছে। তবে মালদহ জেলায় রাজবংশী সমাজের পূজা-পার্বণ ও লোকায়ত ভুবন অনেকটাই বিক্ষিপ্ত। শুধুমাত্র গাঙ্গেয় সভ্যতা, বর্ণহিন্দু সংস্কৃতি নয় পার্শ্ববর্তী রাজ্যের প্রভাবও অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। ফলতঃ রাজবংশী লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গনে লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনাও অন্তর্লীন হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতির বৃত্তটি বিবর্তিত, পরিবর্তিত কিংবা সংকুচিত হলেও এখনও লোকায়ত পরিসরটি ছোট নয়। অনেক কিছুর অভাব ঘটলেও অতীতের লোকায়ত বৃত্তেই রাজবংশীরা নিজেদেরকে স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ মনে করেন। যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আদি-অনাদিকালের কৌম ভাব ও মানসিকতা ।

[কৃতজ্ঞতা: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জ্যোতির্ময় রায় ও অভিজিৎ মণ্ডল]

গল্প

পঞ্চলাইট

মূল রচনা (হিন্দি): ফণীশ্বর নাথ রেণু
বাংলা রূপান্তর: দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

বিগত পনের মাস ধরে দন্ড-জরিমানার টাকা-পয়সা যা জমা হলো তা দিয়ে মাহাতোটোলা পঞ্চায়েতের মাতব্বরা এবছর রামনবমীর মেলা থেকে একটা পেট্রোম্যাক্স কিনে ফেলল। তাদের গোটা গ্রামে সব মিলিয়ে মোট আটট পঞ্চায়েত আছে। প্রত্যেক জাতের আলাদা আলাদা পঞ্চায়েত। সেই পঞ্চায়েতের আবার নিজেদের আলাদা আলাদা সতরঞ্চী, চাদর, গদ্দা আর অবশ্যই একটি পেট্রোম্যাক্স (হ্যাচাক/পাম্পলাইট) আছে। এই পেট্রোম্যাক্সকে দেহাতী লোকেরা 'পঞ্চলাইট' বলে জানে। বলতে গেলে এই লাইটটাই এখন পঞ্চায়েতের সবচেয়ে আভিজাত্যের প্রতীক।

পঞ্চলাইট কেনার পর হাতে দশ টাকা থেকে গেলে মাতব্বররা ঠিক করে যে ঐ টাকা দিয়ে পূজা সামগ্রী কেনা হবে। নাম-কীর্তন না করে কলকব্জাওলা জিনিসের ব্যবহার শুরু করা ঠিক নয়। অঙ্গরেজ বাহাদুরের জামানাতেও তাদের অঞ্জিনিয়ার বাবুরা পুল বানানোর কাজ শুরু করার আগে পুজো দিয়ে বলি চড়াতো।

মেলা থেকে পঞ্চোমাতব্বররা বেলা থাকতে থাকতেই গাঁয়ে ফিরলো। সবার আগে পঞ্চায়েতের ছড়িদার পঞ্চলাইটের বাক্স মাথায়, তার পিছনে সরদার, দিওয়ান ও বাকি মাতব্বররা। মাহাতোটোলায় ঢোকার আগে বামুনটোলা, ফুটুঙ্গী ফুট কাটলো, ''আরে মাহাতো এ লালটেন (লণ্ঠন) কত দিয়ে কিনলে গো?''

''চোখে দেখেন না নাকি? এটা লালটেন নয় পঞ্চলাইট। হুঁ! বামুনরা ইনজেদের ঘরের ডিবরি (লম্পো) কে বলবে বিজলিবাতি আর অন্যের পঞ্চলাইট হলো লালটেন। এদের বাতচিতের ধরনটাই একরকম।'' গজগজ করতে করতে চললো ছড়িদার।

ততক্ষণে মাহাতোটোলায় সব লোক জড়ো হয়ে গেছে। ছেলে, মেয়ে, ধাড়ি, বুড়ো-বাচ্চা কেউ আর বাকি নেই। হৈ হৈ করে সব এসে গেছে— চলরে চল আমাদের নিজেদের পঞ্চলাটি এসে গেছে...।

ছড়িদার অগনু মাহাতো থেকে থেকে সকলকে সাবধান করতে থাকলো ''...আরে আরে দূর থেকে, সব দূর থেকে। কেউ ছোঁওয়াছুঁয়ি করবে না। কোনো দাগ-টাগ না লেগে যায়।''

সর্দার তার বউকে ডেকে বললো ''সাঁঝবেলায় পুজো হবে। তাড়াতাড়ি নাওয়া-ধোওয়া করে দাওয়ায় চৌকি-পিঁড়ি পাতো। আলপনা নেপে পুজোর ব্যবস্থা করো।''

টোলার কীর্তনীয়া দলের মূল গায়েন তার ধুয়াধরাদের সাবধান করে দিয়ে বললো ''আজ পঞ্চলাইটের আলোয় কীর্তন হবে। বেতাল লোকেদের আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি আজ যদি কারো গানের কথা বা সুরের এদিক-ওদিক হয় তাহলে দল থেকে একেবারে নাম কেটে দেবো।''

মেয়ে মহলে গুলারি কাকি গুনগুন করে গোঁসাই গীত গাইতে শুরু করে দিল। টোলার কাচ্চা-বাচ্চারা তো ভাল করে কিছু না বুঝেই মহা হট্টগোল শুরু করে দিল।

সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক আগেই টোলার সকলে সরদারের দাওয়ায় জমা হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটাই শব্দ কেবল আলাদা করা যাচ্ছে। 'পঞ্চলাইট', 'পঞ্চলাইট'।

পঞ্চলাইট ছাড়া আর কোনো গল্প নয়, আর কোনো কথা নয়। সরদার খাটিয়ায় বসে হুঁকো গড়গড় করতে করতে বেশ আয়েস করে বসে বলতে লাগল ''দুকানদার তো শুরুতেই শুনিয়ে দিল পুরো পাঁচ কুড়ি পাঁচ দাম লাগবে। তা আমি বললাম দুকানদার সাহেব এটা ভাববেন না যে আমরা দেহাতি আদমি আছি। এমন ঢেড় ঢেড় পঞ্চলাইট আমরা দেখে— এরপর তো দুকানদার আমাকে দেখতেই লাগল। তারপর বললো, মনে হচ্ছে আপনি জাতের সরদার আছেন। ঠিক আছে তা আপনি যখন সরদার হয়ে নিজে পঞ্চলাইট কিনতে এসেছেন তখন আপনার জন্য দাম পুরো পাঁচকুড়িই থাকল।''

দিওয়ানজিই বা পেছিয়ে থাকে কেন! সেও শুরু করলো ''আসলে চেহারা দেখেই লোক চিনতে পারার চোখ আছে দুকানদারের। দুকানের কাজের লোকটা পঞ্চলাইটের বক্সা রেখে দিতে চাইছিল। আমি সিধা বলে দিলাম—বক্সা না দিলে আমরা পঞ্চলাইট নিবো না। শুনেই দুকানদার কাজের লোকটাকে খুব বকাবকি শুরু করে দিল। বললো তোর হিম্মত তো কম নয়! দিওয়ানজির চোখের সামনে তুই পঞ্চলাইটের বক্সা সরাচ্ছিস? চোট্টা কোথাকার! দিয়ে দে বক্সা।''

ছড়িদার বলে উঠল ''পুরো রাস্তায় যে দেখেছে সেই পঞ্চলাইট, পঞ্চলাইট বলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে।''

সব শুনে টোলার লোকেদের নিজেদের পঞ্চোদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আরো খানিকটা বেড়ে গেল। এতদিনে তাদের নিজেদের একটা পঞ্চলাইট হলো।

...কিন্তু!!! হ্যাঁ একেবারে মোক্ষম সময়েই এতক্ষণ ধরে চলা সারা 'কিরিয়াকরমের' (কর্মকাণ্ড) ওপর একটা মস্ত 'কিন্তু' লেগে গেল। আসলে রুদল সাউয়ের দোকান থেকে তিন বোতল কিরাসিন

(কেরোসিন তেল) আনার পরেই উঠল প্রশ্নটা।

কেরোসিন দেওয়ার সময় সাউ একটু ঠেস মেরেই বলেছিল, পঞ্চলাইটে পাম্পু বেশ হোসিয়ারিতে (সাবধানে) দিতে। নাহলে...। সেটা জানতেই সকলের মনে প্রশ্ন উঠলো—সবই তো হলো কিন্তু এ পঞ্চলাইট জ্বালাবে কে?

এই কথাটা এতক্ষণ কারো মাথাতেই আসেনি। পঞ্চলাইট কেনার আগে না কেউ ভেবেছে না কেনার পরে। এখন চৌকি-পিঁড়ি পেতে, আলপনা দিয়ে পুজোর যোগাড় সম্পূর্ণ। কীর্তনীয়ারা ঢোল-খোল-করতাল হাতে তৈরি হয়ে গেছে। আর পঞ্চলাইটটা যেখানে এনে রাখা হয়েছিল সেখানেই একধারে পড়ে আছে। এই টোলার লোক এমন জিনিস কখনো কেনেনি যা জ্বালাতে নেভাতে গেলে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়। কথায় বলে না 'ভাই, গরু তো কিনতেই পারি কিন্তু দুধ দুইবে কে? এখন বোঝা ঠ্যালা। এই কল-কব্জাওলা জিনিস চালাবে কে?'

এমন নয় যে গোটা গ্রামে পেট্রোম্যাক্স জ্বালাতে পারে এমন লোক নেই। বাকি পঞ্চায়েতে পঞ্চলাইট আছে আর সব পঞ্চায়েতেই সেটা জ্বালাবার কায়দা জানা লোকও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো প্রথমবার মাহাতোটোলার নাম-গান করে দাওয়ার দেওয়ালে 'শুভ-লাভ' লিখে, পুজো দিয়ে চৌকি-পিঁড়ি পেতে শেষপর্যন্ত অন্য পঞ্চায়েতের লোকের সহায়তায় পঞ্চলাইট জ্বলবে? সারাজীবন ধরে অন্য জাতের টিপ্পনি সহ্য করতে হবে। অন্য পঞ্চায়েতের লোকেরা কথায় কথায় ফুট কাটবে—তোমাদের পঞ্চলাইট প্রথমবার অন্য জাতের হাতে...। না ভাই এটা পঞ্চায়েতের ইজ্জতের সওয়াল তার থেকে ও পঞ্চলাইট পড়ে থাকুক, অন্য টোলার লোকদের ডাকার দরকার নেই।

চারিদিকে গভীর নীরবতার মধ্যে ক্রমশঃ আঁধার ঘনীভূত হতে থাকলো। টোলার কেউ নিজের ঘরের ডিবরিটাও জ্বালায়নি। আজ টোলায় পঞ্চলাইট জ্বলবে। তার আলোর সামনে কে আর লম্পো জ্বালায়।

সব যোগাড়-যন্ত্রের ওপর কে যেন বাল্টি করে জল ঢেলে দিল। সরদার, দিওয়ান, ছড়িদার কারো মুখে কথা নেই। গোটা পঞ্চায়েতটা যেন ধসে পড়েছে। কেউ একজন আফসোস করে বললো ''কলকব্জাওয়ালা জিনিসের ঝামেলা অনেক।''

এক ছোকরা এসে জানালো রাজপুতটোলায় হাসির ধুম পড়ে গেছে। হাসতে হাসতে একজন অন্যজনকে বলছে ওদের পঞ্চোজন ঐ পঞ্চলাইটের সামনে কান ধরে ওঠা বসা করুক তাতে যদি ওটা জ্বলে।

এসব শুনে পঞ্চোজনের মাথা লজ্জায় আরো হেঁট হয়ে গেল। মনে মনে বললো ''ভগবান ওদের হাসার দিন দিয়েছে ওরা হাসবে তো বটেই।''

গুলারি কাকির মেয়ের ঠোঁটে একটা কথা বারবার এসেও আটকে যাচ্ছে। এই ভরা সভার মাঝে সে কি করে বলে যে গোধন এই পঞ্চলাটি জ্বালাবার কায়দা জানে। এই পঞ্চায়েত সভা করে গোধনকে একঘরে করে তার 'হুক্কাপানি' (সমাজের সাথে মেলামেশা) বন্ধ করেছে। আসলে মুনরির মা পঞ্চায়েতের কাছে ফরিয়াদ (নালিশ) করেছিল যে গোধন তার মেয়েকে দেখে সিটি বাজায়, আর ফিলিমের (সিনেমার) গান গায়। কি সব আজেবাজে গান... ''লে-কে-পহলা পহলা প্যার...'' পঞ্চোজন এমনিতেই গোধনের ওপর রুষ্ট ছিল। জাতে মাহাতো হলেও কোথা থেকে উড়ে এসে এখানে জুড়ে বসেছে। আজ পর্যন্ত সে পঞ্চোজনকে 'পান-সুপারি' খেতে একটি পয়সাও দেয়নি। মওকা পেতেই মুনরির মায়ের নালিশে পঞ্চায়েত গোধনকে দশটাকা জরিমানা করে। না দেওয়াতে পঞ্চায়েত তার 'হুক্কা-পানি' বন্ধ করে দেয়। সেই থেকে গোধন পঞ্চায়েতের বাইরে। সেও পাত্তা দেয়না পঞ্চায়েতকে। এখন মুনরি গোধনের নাম কি করে বলে সবার সামনে! এদিকে গোটা জাতের বারোটা বাজতে চলেছে।

অবশেষে মুনরি বুদ্ধি করে তার প্রিয় সখি কনেলির কানে কানে বলে কথা। শুনেই কনেলির চোখ দুটো বেশ বড় হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সেও বেশ মুষড়ে পড়ল। ফিসফিসিয়ে বললো ''কিন্তু গোধন তো এখানে ঢুকতেই পারবেনা।'

মুনরি বলে ''আঃ, তুই সরদারকে কথাটা বলেই দেখনা।''

সামগ্রিক নীরবতার মাঝে হঠাৎই কনেলি বলে উঠলো ''গোধন জানে পঞ্চলাইট জ্বালানোর কায়দা।''

''...কে গোধন? সে জানে জ্বালানোর কায়দা? কিন্তু...' কথাটা কেউ বলে চুপ করে গেল।

সরদার দিওয়ানের দিকে তাকায়, দিওয়ান ছড়িদারের দিকে। এইভাবে পঞ্চোজন সকলেরই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। পঞ্চোর সকলে একমত হয়ে গোধনের 'হুক্কাপানি' বন্ধ করেছে। সারাক্ষণ ফিলিমের গান আর সিটি বাজানো কাউকে পরোয়া না করা মনোভাবে সারা গাঁয়ের লোক ওর প্রতি বিরক্ত।

কিছুক্ষণ গুঞ্জনের পর সরদার বলে উঠলো ''জাতের শাসনের কথা ভাবতে গেলে জাতের ইজ্জত তো ধুলোয় লোটায়। কি বলো দিওয়ানজি?

দিওয়ান বললো ''ঠিক বটে।''

বাকি পঞ্চোও একসাথে বলে উঠল ''একদম ঠিক। গোধনের ওপর থেকে শাসনের বাঁধন তুলে নেওয়া হোক।''

সরদার ছড়িদারকে পাঠালো গোধনকে পঞ্চায়েতে ডেকে আনার জন্য। কিন্তু সে ফিরে এসে জানালে যে গোধন পঞ্চায়েতে আসতে রাজি হলো না। সে বলেছে যে পঞ্চোকে কি বিশ্বাস আছে। কলকব্জার ব্যাপার, কিছু খারাপ হয়ে গেলে আবার তাকে দন্ড-জুরমানা ভরতে বলবে।

তারপরই ছড়িদার কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে ''সরদার যেমন করে হোক গোধনকে রাজি করাও নাহলে কাল থেকে গ্রামে মুখ দেখানো মুশকিল হয়ে পড়বে।''

এবার গুলারি কাকি বলে উঠল, আমিই ছিলাম ফরিয়াদি, আমি দেখছি ওকে রাজি করানো যায় কিনা!

গুলারি কাকি উঠে গোধনের ঝোপড়ির দিকে রওনা দিল। তারপর তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যখন সরদারের দাওয়ায় নিয়ে এলে,

তখন তাকে দেখে আবার সকলের মনে খুশির সঞ্চার হলো। গোধন এসে চুপচাপ পঞ্চলাইটে তেল ভরতে লাগল। সরদারের স্ত্রী পুজোর বেদীর সামনে একটা বিড়াল চক্কার কাটছে দেখে তাকে দূরদূর করে তাড়ালে। গায়ন-বাজনদারদের দল একটু একটু করে বাদ্যযন্ত্রে তাল মেরে দেখতে লাগল। আর ঠিক সেই সময় গোধন বলে উঠলো, ''ইস্পিরিট কোথায়? ইস্পিরিট ছাড়া এটা জ্বলবে কি করে?''

নাও ঠ্যালা, এ আর এক বখেরা (ঝামেলা) এসে পড়ল সামনে। এখন কোথায় পাওয়া যাবে ইসপিরিট? পঞ্চের মাতব্বরদের বুদ্ধির ওপর আর আস্থা রাখতে পারলে না গাঁয়ের মানুষ। এরা কোনো কাজ যদি ঠিকঠাক করতে পারে! ফের সকলের চোখে মুখে নিরাশার ছবি ফুটে উঠল। কিন্তু গোধন খুব করিৎকর্মা ছেলে সে বিনা স্পিরিটেই পেট্রোম্যাক্স জ্বালাতে বসল। বললে, ''কেউ একটু গরীব তেল (নারিকেল তেল) এনে দাও দেখি।''

শুনতেই মুনরি দৌড়ে ঘর থেকে এক মালা গরীব তেল এনে দিল, গোধন পঞ্চলাইটে পাম্প দিতে লাগল। পঞ্চলাইটের রেশমি থলিতে (মেন্টেল) ধীরে ধীরে আলো আসতে লাগল। (তারপর সে কখনো মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে লাগলো তো কখনো চাবি ঘুরিয়ে নানারকম কেরামতি করতে লাগলো। পাম্প দেওয়ার সাথে সাথে পঞ্চলাইট থেকে সোঁ সোঁ করে আওয়াজ হতে থাকলো। (আওয়াজ বটে! পঞ্চলাইটের সাদা আলোয় পুরো মাহাতোটোলা ঝলমল করে উঠলো। কীর্তনীয়ারা ''জয় মহাবীর স্বামীর জয়'' বলে নাম গান শুরু করলো। দোহার ধরতাই দিল। পঞ্চলাইটের আলোয় সবার মুখে খুশির ছাপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। গোধন সকলের মন জয় করে নিল। মুনরি গভীর দৃষ্টিতে নিজের দু'চোখ গোধনের দিকে মেলে ধরল। আর গোধনের চোখ? কি আর করা যাবে ভাই ''কহা সুনা মাফ করো'' দুয়ে দুয়ে চার হয়ে গেল।

সরদার আদর করে গোধনকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, ''বাবা তুমি জাতের ইজ্জত রেখেছো, তোমার সাতখুন মাফ। খুব গাও ফিলমি গানা।''

গুলারি কাকি বলে দিল ''আজ রাতে আমার ঘরে খাবি গোধন।''

সে কথা শুনে গোধন তাকায় মুনরির দিকে। কি এক লজ্জার আবেশে মুনরির মাথা নীচে ঝুঁকে গেল। ততক্ষণে একটা গান শেষ করে কীর্তনীয়ারা অন্য গান ধরেছে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝেই উঠছে ''জয় হো, জয় জয় হো'' ধ্বনি।

পঞ্চলাইটের আলোয় টোলার মানুষজন, গাছপালা, পথঘাট সব যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলো।

গোধন আর মুনরির দু'চোখের দৃষ্টি যেন একে অপরের থেকে আর সরতেই চাইল না। আপনা থেকেই গোধন গুনগুনিয়ে উঠল—

''মিলতে হি আঁখে দিল হুয়া দিওয়ানা কিসি কা...''

ফণীশ্বর নাথ মণ্ডল 'রেণু': জন্ম: ৪ মার্চ, ১৯২১, আরারিয়া (পূর্ণিয়া), বিহার; মৃত্যু: : ১১ এপ্রিল, ১৯৭৭

হিন্দি কথাসাহিত্যের অন্যতম এক রচনাকার ফণীশ্বর নাথ রেণু ছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। তাঁর রচনায় মাটির কাছাকাছি সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবন অন্যবদ্য ও অনায়াস ভঙ্গিতে প্রতিভাত। তিনি নিজেও ছিলেন অত্যন্ত সহজ কিন্তু ঋজু একজন মানুষ। তাঁর পড়াশুনা ফরবেশগঞ্জ, বিরাটনগর (নেপাল) ও বারাণসীতে। জাতব্যবস্থায় তিনি অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে উঠে এলেও তাঁদের পরিবারের জমিজমা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল এবং তাঁদের পরিবারে শিক্ষার প্রচলন ও উদারনৈতিক পরিবেশ ছিল। তার পিতা শ্রী শিলানাথ মণ্ডল ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, রেণু নিজেও ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর সমাজবাদী ভাবনার সম্পূর্ণ ঝলক তাঁর রচনায় পরিলক্ষিত হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন দেশ নেতাদের চিন্তাভাবনার প্রতি। বরং বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন সাহিত্য রচনায়। এ সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'ময়লা আঁচল' (১৯৫৪)। প্রেমচাঁদের 'গোদান' পরবর্তী হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসাবে পরিগণিত। তারপর একের পর এক উপন্যাস, গল্প, প্রতিবেদন, সতীনাথ ভাদুড়িকে নিয়ে অনবদ্য জীবনকথা 'ভাদুড়িজী' প্রকাশিত হয়। তাঁর 'মারে গায়ে গুলফাম' ও 'পঞ্চলাইট' বড় ও ছোট পর্দায় চলচ্চিত্র হয়।

শুধু ভারতে নয় নেপালের রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাই নিয়ে তাঁর মূল্যবান পর্যবেক্ষণ ছিল 'নেপালী ক্রান্তিক।' ১৯৭০-এ ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করেন। কিন্তু 'জরুরি' অবস্থায় সময় অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি সে সম্মান ফিরিয়ে দেন ও অসুস্থ শরীরেও জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রতিবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর 'পঞ্চলাইট' গল্পটি রাজকমল প্রকাশনের 'প্রতিনিধি কাহানিয়া' থেকে নেওয়া। পত্রিকার তরফ থেকে রেণুজির জন্য রইল গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁর পরিবার ও প্রকাশনের জন্য রইল অসীম কৃতজ্ঞতা।

- অস্ট্রেলিয় সাংবাদিক ও সম্পাদক এবং একদা বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া 'উইকিলিকস্' এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জ (জন্ম: ১৯৭১) ২০১২-'১৯ অবধি লন্ডনের ইকোয়েদর দূতাবাসে ঘরবন্দী এবং ২০১৯-'২৪ পর্যন্ত লন্ডনে জেলবন্দী থাকার পর অবশেষে মুক্তি পেলেন। তাঁকে অভিনন্দন।
- বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে পুলিশ ও মিলিটারির গুলি চালনায় নিহতদের প্রতি শোক জ্ঞাপন; সন্ত্রাস ও ধ্বংসের প্রতিবাদ।
- ১৯০০ ও ১৯২৪ এর পর ৩৩ তম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হল প্যারিসে।

যা নিয়ে কৌতুক

দেবারতি মিত্র (১৯৪৬-২০২৪)

আমার সর্বস্ব ছুঁড়ে ফেলে দিই খোলা মাঠে
ওদের টিনের চালে, পশুর হৃদয়ে।
সেখানে জন্মায় রোদ, জ্যোৎস্না, অশ্রুর
কল্পনা,
তারা সান্দ্র গান করে, ভয় দেখায়,
অপূর্বতা আনে।
মায়ের স্মৃতির রুক্ষ নিদারুণ শোক,
মৌচাকের ভরা মধু তাঁর স্নেহ কাঁপে।
আমাকে ডেকো না, বলে কাঠঠোকরা
পাখি,
প্রজাপতি উড়ে যায় ফুল ফেলে দূর থেকে
দূরে।
আমার থাকে না কিছু,
তিলে তিলে সব চলে যায়।
শুধু সন্ধ্যা-অরুণের অন্তরাঙা সজীব
বেদনা
বয়ে আসে লোকালয়ে, দেশকালে
ব্যর্থ কবিতায়,
যা নিয়ে কৌতুকভরে খেলা করো তুমি

রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

মলয় রায়চৌধুরী (১৯৩৯-২০২৩)

আজ দেখি এলুমিনিয়াম বাক্সে গোছ করা আমারই মড়া
অর্ধেক পাঁজর পুড়ে গেছে রাবার জ্বালানো আঁচে
আমারে ক্ষমা করো
মানুষের মগজ নষ্ট হোক আমার
আমার নখ-দাঁত নষ্ট হয়ে যাক
হাতির আঁদুয়া দিয়ে বেঁধে রাখো আমায়
দেখতে চাই রক্তের ভেতর হাঙর আফানি দেয় কি না
লাথি লেগে ভাতের থালার ওপর জলের গ্লাস উলটে পড়ুক
আমাকে ক্ষমা করো
সন্তানের আত্ম-মৈথুন করা হাতে মুখাগ্নি
উলুঘাস-বুনোটের শেকড়ের পাশে পোকাদের নিঃশব্দ সঙ্গম
এতদিন এদের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিতে পারি নি
ধানকাটা নিয়ে এবছর অনেক লাশ পড়ে গেল
বাইসন শিকারের জন্য বেত্‌লার জঙ্গলে আমাদের চিত্‌কার
হরিণের মাংস কাটা হয়েছিল কোদাল দিয়ে
আমার ছেলে-মেয়েরা খরগোশের চোখ উপড়ে
খেলা করছিল বেত্‌লার দুর্গে
এলুমিলিয়াম বাক্সে আমার লাশ বাঁচিয়ে তুলতে চাইছি
আমাকে ক্ষমা করুন।

The Storm

Jayanta Mahapatra (1928-2023)

All along you are aware
of its dark cloud as it ghosts the air:
the wet flit of fireflies,
the early wind's unease,
a world of small manifestations laid bare.

And when it bursts open at last,
your ears ringing with the bells
of heat and unquiet
whipping up the waters and fields of some sleep,
your faded hopes and horizons,

as the blade of a plough
gleams in the dark expanse of earth,
even then you wouldn't know what it means:
love or hate,
the question you'd be asking yourself.

The dark maw of its approach
vacillating inside you, striking some atavistic chord.
A time when the earth-blood
quivers in the struggle to live,
a certain hunger, the purpose of giving pleasure.

Later, the moon would rise, blood-red,
lighting the soul's edge like a flame.
Later, as the night grows warmer,
and the dead insects stir
on the floor of your flesh

No manner of restraint then
would prevent unopening the knotted bit of mind
and let it give accord
to the spent fury of the wind,
the collapse of each caress.

And marked by a freshly-felled tree of hope
you shout into the sudden calmness of the air,
to hear your own presence open like a door
and the whining sickly song
of your blood drift past.

কবিতা

দস্তানা

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

শুভা বলছিল ছাইরঙ মেঘ পেরিয়ে
আবার এসে যাচ্ছে শীতকাল
এগিয়ে দাও হাত
নরম কুয়াশা পরিয়ে দিই
শাদা মোমে পুড়িয়ে ফেলি
কাঙাল হাহাকার এসো…
অথচ নিবছে না জল
আমি তাকে পাঠিয়ে দিই ধবধবে লিলিয়ান
আসিফার গান ও বাদামি ঘোড়ার খেলা
থেঁতলে যাবার আগে জাফরান ফুলের খেতে
তারাদের ফুল দেখেছিল সে?
দেখেছিল চোখ বাঁধা আর্য সভ্যতার চাঁদ?
মভ রঙা ফ্রকের চিনার জোছোনা
ঢেকে দিল পাথরের থান
সাপের খোলস ছেড়ে হেসে উঠল কারা
হেঁকে উঠল সৎ হ্যায় লোমশ জঙ্গল
যারা জানে রক্তের রঙ পিঙ্গল
পবিত্র হোম যাগে গেরুয়া আগুন
কোনো ধ্যানের আলোক নয়
আমাদের দীর্ঘ জীবন ঢাকা থাকে
হিংস্র কমলা রঙ অঙ্গারের নিচে
ঈর্ষার ক্ষতময় গ্রীবা জেগে ওঠে তবু
ভালবাসব বলে শব্দের স্নিগ্ধ কঙ্কাল এসো
গ্রীবাশাসনের ছলে হাত ধরি
এসো তীক্ষ্ণ শ্বদাঁতে ফুটো করা গলা
আঙুলে আসিফার শুকনো রক্ত ঢেকে দিতে
পরিয়ে দিই নরম দস্তানা
আমরা পবিত্র মন্দিরে যাই!

ভাষা-ভাসান

আর্যতীর্থ

রোজকার ভাষা থেকে রোজগার নাস্তি
ভিন্ন লব্জ তাই রোজকার শাস্তি,
রোজ যদি নাই দেয় ফি রোজ ভাষা মা'র
ভাষণে হবে না কাজ, খাবে সেই ভাষা মার।

বাংলার থেকে কাজে সীমানার বাইরে
মানায় না বাংলাকে মা মানার বাই রে,
বাঙালি শ্রমিক ছোটে দক্ষিণ উত্তর,
'ছোটে' লোগ ভাষা শেখে সেই ভূমিপুত্রর।

বাংলা জানলে শুনি খোলে মন জানলা
রুজি-রোজগারে সে যে সাজে বুড়ো আংলা,
কাজ নেই শ্রমিকের, মা'র ভোগে শিক্ষা,
মার খাওয়া ভাষা করে 'শ্রী-ধন' ভিক্ষা।

রুজি দাও, রুটি দাও, ভাষা দিক রোজগার,
নয়তো গোলামি হবে কিস্‌সা সে রোজকার।
যা জানলে লাভ নেই, কেন লোকে জানবে,
রবি-নজরুল দিয়ে কত আর টানবে!

ভাষাকে ভাসিয়ে দাও যত লাভ-সাইনে,
ভাষা শুধু বাঁচে যদি তাতে বাঁধা মাইনে।

বাংলা তো বেঁচে আজ আবগারি আইনে,
বাঙালি কাঙালি মদে, সদা খাড়া লাইনে।

বারোটার দিকে কাঁটা… আপাতত নাইন-এ।

সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক

সুপ্তশ্রী সোম

সিঁড়ি ভেঙে চলেছি কতকাল
উপর থেকে নিচে আবার উপরে
এমনি করে চলতে চলতে ভেঙে ফেলেছি
অসংখ্য ছায়াভাঙ্গা রোদ্দুরের টুকরো।

তোমাকে নিয়ে ভাবনাগুলো রোদ্দুরের মতই ছিল
যেখানেই ছায়া নামতো আমি তোমাকে
নিয়ে আসতাম সেখানে
আমার ভালবাসার ইমারতে শুরু হত উৎসব।

আমি হাসতে হাসতে বৃষ্টি হতে চাইতাম
আর আকাশ ভরে উঠতো মেঘে
তারপর সে কি বৃষ্টি
তুমি ভিজে যেতে যেতে
মেঘলা ভাঙা রোদ হয়ে ফিরে আসতে

কখন যেন রোদ্দুরে পুড়ে গেল সব
মেঘ বৃষ্টির খেলায় মেঘ হেরে গেলো
আমার আর বৃষ্টি হওয়া হলো না

এখন ভালোবাসার ইমারত নেই শুধু সিঁড়ি আছে
আর আমি শুধু উঠছি আর নামছি।

ভ্রমণ

হাউস অফ 'জগৎশেঠ': ষড়যন্ত্রের আতুর ঘর

অন্তরা ঘোষ

মুর্শিদাবাদ সফরে এসে যে বাড়িটি দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিল সীমাহীন তা হল তৎকালীন বণিক রাজা জগৎশেঠদের বাড়ি। শুনেছি অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই এই জগৎশেঠরা বাংলার বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। নবাবদের এঁরা প্রয়োজনে, প্রচুর টাকা ধার দিতেন এমনকি এঁরা ছিলেন King Maker অর্থাৎ বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে বা পরবর্তী নবাব নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এদের বিশেষ প্রভাব থাকতো। কথিত আছে যে, এদের এত সম্পত্তি ছিল যে সোনা-রূপার দেওয়াল তুলে এরা গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে দিতে পারতেন। ঐতিহাসিকদের মতে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ ধনী ও ব্যাংকার ছিলেন জগৎশেঠরা।

নসীপুরের রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে জগৎশেঠের বাড়ি। সামনের গেটে বড় করে লেখা The House of Jagatseth। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার গাড়ি। মুর্শিদাবাদের রাস্তায় প্রচুর ঘোড়ার গাড়ি আর বহু প্রাচীন ভাঙাচোরা অট্টালিকা চোখে পড়বে, নবাবী আমলের রীতিনীতি ও স্মৃতিসৌধ শহরের চারিদিকেই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

জগৎশেঠদের বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সামনে টিকিট কাউন্টার। ভারতীয়দের জন্য জনপ্রতি কুড়ি টাকা করে টিকিট। টিকিট কেটে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির বিশাল অট্টালিকাসম বাড়ি হবে। কিন্তু দেখলাম, অট্টালিকা না হলেও সামনে সাদা পাথরের তৈরি বাড়ি এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বাড়ির দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ। বাড়ির সামনের প্রশস্ত উঠোনের দু'পাশে দুটি কারুকার্য খচিত বেদির ওপর সাদা সিংহের মূর্তি, যা হয়তো শৌর্যবীর্যের প্রতীক। আমরা ভেতরে ঢুকেই ৫০ টাকা দিয়ে একজন গাইড নিয়ে নিলাম। ভেতরে ঢুকতেই সামনেই চোখে পড়বে কোম্পানির আমলের কিছু লোহার ভারী চেয়ার টেবিল। গাইড-এর কাছে শুনলাম যে প্রতিটা চেয়ারের ওজন ৩৫ থেকে ৪০ কেজি। আমাদের গাইড জানালেন যে পুরো বাড়িটাকে এখন মিউজিয়াম করে দেওয়া হয়েছে।

গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম যে এত বড় ধনী ব্যক্তি ও ব্যাংকারের বাড়ি তো অট্টালিকা সম হওয়া উচিত ছিল। গাইড জানালেন যে, জগৎশেঠদের মূল গদি ও অট্টালিকা ছিল মুর্শিদাবাদের মহিমাপুরে। ভাগীরথীর গর্ভে সেই অট্টালিকা বিলীন হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীতে জগৎশেঠরা এখানে বাড়ি করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা পোড়ামাটির তৈরি ওয়াটার ফিল্টার। গাইড জানালন যে এটা নবাবী আমলে হাওড়ার বার্ন কোম্পানির তৈরি। রয়েছে যামিনী রায়ের অনুকরণে তৈরি পটচিত্র ও অরিজিনাল হরিণের শিং। সংগ্রহশালার প্রথম গ্যালারিতে চলেছি আমরা গাইডের পিছন পিছন। ভেতরে আবার ফটো তোলার অনুমতি নেই। যতক্ষণে আমরা গ্যালারি ঘুরে দেখছি ততক্ষণ চলুন একটু ইতিহাসের পাতা উল্টে জগৎশেঠদের উত্থান, সমৃদ্ধি ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে ছোট্ট করে একটু জেনে নিই।

****

জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ হীরানন্দ শাহু রাজস্থানের মারওয়ার (যোধপুর) অঞ্চলের নাগর থেকে ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে পাটনা আসেন ভাগ্য অন্বেষণে। ব্যবসায় উন্নতি লাভের পর হীরানন্দ শাহু তার সাত পুত্রকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাতটি গদিতে বসান। জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিকচাঁদ ঢাকা শহরে এসে মহাজনি ব্যবসা শুরু করলে সেখানে বাংলার নবাগত দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৭০৪ সালে মুর্শিদকুলি তাঁর দেওয়ানী সদর দপ্তর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করলে মানিকচাঁদও মুর্শিদকুলির সাথে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন এবং মহিমাপুরে বসবাস শুরু করেন। তিনি সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুর্শিদকুলিকে পরামর্শ দিতেন। মুর্শিদকুলির দাক্ষিণ্যে মানিকচাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা শুরু হয়। ১৭১৪ সালে মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর গদিতে বসে তার ভাগ্নে ফতেচাঁদ। ফতেচাঁদের সময় থেকে শেঠদের প্রভাব প্রতিপত্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়। জগৎশেঠ কিন্তু কোন একজন ব্যক্তির নাম নয়, এটা একটা উপাধি যার অর্থ হলো Banker of the world । ১৭২২ সালে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ ফতেচাঁদকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ফতেচাঁদ হলেন প্রথম জগৎশেঠ। প্রায় ৩০ বছর ধরে বাংলার রাজনীতি অর্থনীতি বাণিজ্যে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

টাঁকশালে মুদ্রা তৈরির একচ্ছত্র অধিকার ছিল জগৎশেঠদের আয়ের একটা বড় উৎস। তাদের আরেকটি উৎস ছিল বিভিন্ন রকম মুদ্রার বিনিময় হার বা বাট্টা ধার্য করার অধিকার। এছাড়াও তাদের বার্ষিক আয়-এর আরেকটি উৎস ছিল চড়া সুদের মহাজনী ব্যবসা।

জগৎশেঠরা ছিলেন সেই সময় ভারতবর্ষের সবথেকে বড় ব্যাংকার।

ক্যাপ্টেন ফেনউইক নামে একজন সেই সময়কার ইংরেজ বণিক বলেছেন যে "জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ ছিলেন নবাবের খুবই প্রিয় পাত্র এবং লন্ডনে ব্যাংকারদের কেন্দ্র লম্বার্ড স্ট্রিটের সমস্ত ব্যাংকারকে যোগ করলেও তাঁর মত ব্যাংকার হবে না।"

বাংলার নবাব ও নবাবী শাসনের উপর জগৎশেঠদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অভূতপূর্ব। ইউরোপিয়ান বণিকরা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং নবাবরা এমনকি দিল্লির বাদশাহও জগৎশেঠদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন। নবাবের টাঁকশাল নিয়ন্ত্রণ করতেন জগৎশেঠরা।

নবাব মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর নবাব সুজাউদ্দিনের জন্য মুঘল দরবারে দরবার করে নবাবি স্বীকৃতি ও অনুমোদন আদায় করে দেন ফতেচাঁদ। তাই সুজাউদ্দিন ফতেচাঁদের প্রতি মুর্শিদকুলির থেকেও বেশি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানান রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিনপুত্র সরফরাজ নবাব হয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন নি। তিনি জগৎশেঠদের সন্দেহের চোখে দেখতেন ও পদে পদে অপমান করতেন। ফলস্বরূপ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, আলমচাঁদ ও হাজী মোহম্মদ এরা এক হয়ে যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার মসনদে আলীবর্দী খাঁ-কে বসান।

ফতেচাঁদ মারা গেলে তাঁর দুই পৌত্র জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদ গদিতে বসেন। ফতেচাঁদের কাল থেকে মহতাবচাঁদের সময়কাল পর্যন্ত শেঠরা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। শুধু বাংলা তথা ভারতের বণিকরা নয়, ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ ও পর্তুগিজ বণিকরা বছরের পর বছর জগৎশেঠদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালাতো, নবাব আলীবর্দির সময় নবাবের সাথে শেঠদের ওঠাবসা ও সখ্যতা ছিল। কিন্তু পরবর্তী নবাব সিরাজউদ্দৌলা জগৎশেঠদের এত খাতির করে চলতেন না। সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালকে দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেন, যা শেঠদের একেবারে অপছন্দ ছিল। বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ এবং ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করার জন্য সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের কলকাতার কুঠি আক্রমণ করেন। জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার পরামর্শ দিলে শোনা যায়, নবাব ভরা দরবারে মহতাবচাঁদকে অপমান করেছিলেন। কথিত আছে, সেদিন মহতাবচাঁদের গালে কষে থাপ্পড় মেরেছিলেন সিরাজ। ফলস্বরূপ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া তৈরি হয়। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য আলীবর্দীর জেষ্ঠ্য কন্যা ঘসেটি বেগম (মেহের উন্নিসা), সেনাপতি মীরজাফর, জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ ও রবার্ট ক্লাইভ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ফলস্বরূপ ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধ হয় এবং সিরাজ পরাজিত ও নিহত হন। পলাশীর যুদ্ধের পর শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির drainage of wealth বা সম্পদের নির্গমন যা দিয়ে পরবর্তীকালে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর কিন্তু ধনকুবের জগৎশেঠের বৈভবের পতনের সূত্রপাত শুরু হয়। ব্রিটিশ রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেই দ্রুত কলকাতায় টাঁকশাল বসায়। এতদিন ধরে জগৎশেঠদের যে টাঁকশালের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল তা অপসৃত হয় । বাংলায় খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পায় নন্দকুমার এবং রাজস্ব জমা পড়তে থাকে ব্রিটিশদের কোষাগারে। ফলে অর্থসম্পদ এবং রাজনৈতিক দিক থেকে জগৎশেঠদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা কমে আসতে থাকে।

পরবর্তী নবাব হন মীরজাফর। এরপর নবাব হন মীরজাফরের জামাতা মীর কাসিম। মীর কাসিম ইংরেজদের অধীনতামুক্ত স্বাধীন নবাব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ফলে ইংরেজদের সাথে নবাবের বিরোধ বাধে এবং শুরু হয় বক্সারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে নবাব জগৎশেঠের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলে শেঠরা নবাব কে আশানুরূপভাবে অর্থ সাহায্য করতে রাজি হয় না। এতে নবাব মীর কাসিম ক্রুদ্ধ হন ও ১৭৬৩ সালে নবাব মীর কাসিমের হুকুমে জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদকে মুঙ্গের দুর্গ থেকে আশ্বিন মাসের ভরা গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হয়। এরপর থেকে জগৎশেঠ পরিবারের সমৃদ্ধিতে ভাটা পড়ে ও পতনের সূত্রপাত হয়।

''ম্যাডাম এই যে মোহরগুলি দেখছেন এগুলো হচ্ছে জগৎশেঠ দের সময়কার টাঁকশালে তৈরি সোনা রূপার মোহর"। গাইড এর কথায় চমক ভাঙলো, ইতিহাসের পাতা থেকে ফিরে এলাম বাস্তবে জগৎশেঠের বাড়ির গ্যালারিতে। দেখলাম কাঁচ ঢাকা শোকেসের মধ্যে সোনা রূপার ছোট বড় মোহর, তখনকার পয়সা এবং আড়াই টাকার এবং ৫ টাকার নোট। আড়াই টাকার নোটের গায়ে ইংরেজিতে লেখা আছে Rupees Two Annas Eight। গাইড বলে চলেছেন যে আর্থিক মানের বিচারে সব থেকে ছোট পয়সা ছিল পাই পয়সা। আর সবথেকে আকর্ষণীয় ছিল আড়াই টাকার নোট।

৩০০ বছর আগেকার বাংলা তথা ভারতের সবথেকে ধনী ব্যাংকারের টাঁকশালে তৈরি সোনা রূপার মোহর চাক্ষুষ করলাম মুগ্ধ হয়ে। আরো একটা জিনিস দেখে দারুণ লাগলো, সেটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড়। একটা আংটির মধ্যে দিয়ে কাপড়টি ঢুকিয়ে দেওয়ালে টাঙানো আছে। সেই জগৎ বিখ্যাত মসলিন কাপড় যার ওজন মাত্র ৬০ গ্রাম এবং লম্বায় ৫৪ ফুট। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি। এখন তো এই পাতলা ফিনফিনে অরিজিনাল মসলিন কাপড় দুর্লভ। এছাড়াও এই গ্যালারিতে রয়েছে জগৎশেঠদের পরিবারের ব্যবহার করা নানান দ্রব্য ও উল্কাপিণ্ড। এরপর আমরা দোতলার গ্যালারিতে

গেলাম। এখানে রয়েছে মীরজাফর ও রবার্ট ক্লাইভের ব্যবহৃত পোশাক এবং আসবাবপত্র। বাড়িতে ঢুকেই একটি গ্যালারি এবং বাড়ির পিছনে দোতলায় তিনটে গ্যালারি রয়েছে। গ্যালারিগুলিতে যা যা রয়েছে তা হল হাতির দাঁতের তৈরি পাশা ও তাস, কাশ্মীরের সৌন্দর্যের উপর উর্দু ভাষায় লেখা বই সায়র-উল-কাশ্মিরী, হট প্লেট (প্লেটের নিচে আর একটা লেয়ার আছে। প্লেটে খাবার রেখে একপাশের ছিদ্র দিয়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হত। গরমের তাপ খাবারটাকে গরম রাখত।), চন্দন কাঠের পাখা, সুরা পাত্র, গন্ডারের চামড়ার ঢাল, মসলিন কাপড়, শেঠ পরিবারের ব্যবহৃত বাসনপত্র, সোনা রুপোর চামচ, অস্ত্রাগার, পালঙ্ক, পালকি ইত্যাদি। এছাড়া দেখলাম সেই বিস্ময়কর আয়না যেখানে আমি নিজেকে ছাড়া সকলকে দেখতে পাচ্ছি। এ বেশ মজার আয়না যেন রূপকথার গল্পের ঝুড়ি থেকে তুলে আনা হয়েছে।

এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুরো বাড়িটিতে দুটো ইন্টারেস্টিং জায়গা রয়েছে। একটি হচ্ছে মাটির তলার গুপ্ত ঘর বা সিক্রেট চেম্বার অন্যটা হচ্ছে মাটির তলার সুড়ঙ্গ পথ, যে পথ নাকি মাটির তলা দিয়ে গিয়ে একদম কাঠগোলা বাগান বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

ভূমিকম্পের ফলে হীরাঝিল এবং জগৎশেঠদের মহিমাপুরের প্রাসাদ ভাগীরথীর গর্ভে চলে যায়। সুড়ঙ্গগুলিতেও জল ঢুকে যায় । পরবর্তীতে সুড়ঙ্গের বেশ কিছু অংশ সংস্কার করে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। গাইড জানালেন, এখন কাঠগোলা বাগানবাড়ি যাওয়ার ওই সুড়ঙ্গ পথটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। মাটির তলার এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়েই কিন্তু জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা কাঠগোলা বাগানবাড়িতে গোপনে গিয়ে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি করেছিল। এই সুড়ঙ্গ পথ এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। এখানে রয়েছে অস্ত্রাগার। শেঠদের নিজস্ব সৈন্য সামন্তও ছিল। বর্গীদের আক্রমণের সময় তাদের সাথে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এই সংগ্রহালয়তে রাখা হয়েছে।

মাটির তলার গুপ্ত ঘরে ঢোকার মুখে গেটে দেখলাম একটা বিশাল লোহার তালা। তালাতে আবার সিংহের মুখ খোদাই করা আছে। গাইড জানালেন, এটা জগৎশেঠের সময়কার তালা এবং তালাতে ব্রিটিশ রাজের প্রতীক সিংহের মুখ রয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ব্রিটিশদের সাথে জগৎশেঠ পরিবারের কতটা সখ্যতা ছিল।

মাটির তলায় কিছুটা করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে সামনে রয়েছে আর্চ করা ও সোনালী কারুকার্য করা প্রবেশদ্বার। আর্চের ওপরে রয়েছে হরিণের সিংওয়ালা মাথা টাঙানো। কিছুটা করে সিঁড়ি নেমে বেশ খানিকটা ভেতরে গিয়ে আমরা দেখলাম তখনকার সময়ের জগৎশেঠদের পরিবারের ব্যবহার করা কিছু রুপোর প্লেট, বাসনপত্র, পুজোর জিনিস, ছোট ছোট কিছু মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র, এবং টেস্টিং প্লেট। গাইড-এর মুখে শুনলাম , এই টেস্টিং প্লেটে কোন বিষাক্ত খাবার যদি রাখা হয় তাহলে সেই প্লেট ফেটে যেত বা প্লেটের কালার চেঞ্জ হয়ে যেত। । বুঝলাম যে, নবাবদের বা নবাবী পরিবারের কাউকে যাতে কেউ ষড়যন্ত্র করে খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলতে না পারে তার জন্য এই টেস্টিং প্লেটের ব্যবস্থা ছিল।

কথিত আছে, এই গুপ্তঘরে নাকি জগৎশেঠরা তাদের ধন সম্পত্তি সঞ্চিত রাখতো।

যদিও এতক্ষণ ধরে জগৎশেঠের বাড়ি ঘুরে একটা প্রশ্ন আমার মনে মাঝে মাঝেই উঁকি দিচ্ছিল যে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী সেই সময়কার বিখ্যাত ব্যাংকার ধনকুবের জগৎশেঠদের অপরিসীম ধনসম্পত্তির কিছু মাত্রওতো দেখলাম না কোথাও। হয়তো মাটির তলায় এখনো কোথাও গচ্ছিত আছে বা হয়তো জগৎশেঠদের প্রভাব প্রতিপত্তি অস্তমিত হওয়ার পর সব ধনসম্পত্তি লুট হয়ে গেছে।

মাটির তলার গুপ্তঘর থেকে বেরিয়ে রয়েছে সামনে বিশাল প্রাঙ্গণ। একটা কৃত্রিম লেক ও ফোয়ারা তৈরি করা হয়েছে যার মাঝখানে রয়েছে এক সাদা ধবধবে অপূর্ব শিল্পসুষমা মন্ডিত নগ্ন নারী মূর্তি। এ যেন স্বর্গের অপ্সরা, মুগ্ধ হয়ে দেখছি। এটা একটাই পাথর কেটে কেটে মূর্তিটা তৈরি শুধুমাত্র ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে। গাইড জানালো যে ইনি বাইজি হীরাবাঈ যাকে লক্ষ্ণৌ থেকে আনা হয়েছিল। ইনি নাকি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, ওনার উচ্চতা ছিল ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। এক ঘন্টা নাচ করলে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিতেন।

এবারে আমরা দোতলার গ্যালারিতে ঢুকলাম। এখানে রয়েছে একটা লাইব্রেরি কক্ষ। রয়েছে বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের বই, ডিকশনারি ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে জগৎশেঠদের পরিবারের ব্যবহৃত খাট, সবথেকে দামি ইটালিয়ান মার্বেলের ডাইনিং টেবিল, রুপোর চামচ, সোনার জল করা প্লেট, পরিবারের মহিলাদের ব্যবহৃত পালকি, এবং বিখ্যাত গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। এছাড়া রয়েছে প্রচুর মান্যগণ্য ওই সময়কার রাজা-রাজরার ফটো যারা জগৎশেঠদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতেন। একটা ছোটখাটো ওয়াইন স্টোরেজও রয়েছে যেখানে নানান রকম পানীয় সাজানো আছে। ওই সময়কার জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠান বা পার্টি হলে এই পানীয়গুলো ব্যবহার হত। কতটা আড়ম্বর আভিজাত্যের মধ্যে দিনযাপন করতেন এই পরিবার তার ছাপ সর্বত্র রয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই পরিবার জগৎশেঠ উপাধি ব্যবহার করেছে। উনবিংশ শতকে যখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড বেন্টিংক, তখন সেই সময়ের জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদ বছরে ১২০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন পেতেন বলে জানা যায়।

বাড়ির সামনে রয়েছে জৈন ধর্মের মন্দির। ভেতরে রয়েছেন

২৩তম তীর্থঙ্কর পরেশনাথ।

কৃত্রিম লেক ও ফোয়ারার একপাশে রয়েছে কফির ছোট্ট স্টল। ওখানে বসে গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে অসামান্য রূপ লাবণ্যময়ী হীরাবাঈ-এর শ্বেতপাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম ৩০০ বছর আগে নবাব আমির ওমরাহ অভিজাতদের রূপ যৌবনের আকর্ষণ দ্বারা রাতের ঘুম উড়িয়ে দিতেন আর আজ নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তিও তার শরীরী বিভঙ্গ ও অপরূপ শিল্প সুষমায় পর্যটকদের দৃষ্টিতে ও মনে মুগ্ধতার উদ্রেক করছে।

জগৎশেঠদের ঐতিহাসিক বাড়ি ঘুরে দেখার পর এবার বাড়ি ফেরার পালা। কালের নিয়মে সবই পরিবর্তনশীল, একসময়ের শ্রেষ্ঠ ধনী ও ব্যাংকার আজ শুধুই ইতিহাস। যদিও জগৎশেঠদের অষ্টাদশ শতকের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল তবুও জগৎশেঠ মহতাবচাঁদের বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পরিবারের অর্জিত সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

তবে জগৎশেঠদের বাড়ির সংগ্রহশালায় বেশ কিছু অমূল্য দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সংগ্রহ চিরকাল স্মৃতির মণিকোঠায় রয়ে যাবে। মন ক্যামেরায় এই সব বিরল দ্রব্যের ছবি ফ্রেমবন্দি করে বাড়ির পথ ধরলাম।

চিঠিপত্র, রিপোর্ট

নির্বাচনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

(২০ জুলাই '২৩-এ মহাবোধি সোসাইটিতে APDR আয়োজিত নাগরিক কনভেনশনের প্রস্তাব)

নির্বাচনী সন্ত্রাসের ভয়ংকর রূপ ফের দেখলাম আমরা। বাংলার মানুষ। চলে গেল অন্তত ৫০/৫৫ টা তাজা প্রাণ। মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু হয়েছে। এখন গণনা পর্ব মিটে যাওয়ার পরও চলছে মৃত্যু মিছিল। ঘরবাড়ি ভাঙা, এলাকা ছাড়া করা, জরিমানা আদায়, উচ্ছেদ কী নয়! সন্ত্রাসের নতুন নতুন রূপ। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ, ভিন রাজ্যের পুলিশ কেউই ঠেকাতে পারলো না বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, রিগিং। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় এই সন্ত্রাসের মূল কান্ডারি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। কিছু এলাকায় কম যাননি বিরোধীরাও। নির্বাচন কমিশন শাসকদলের আজ্ঞাবহ রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে কাজ করেছে। কদর্য ভূমিকা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে বহুক্ষেত্রে। শেষ পর্বে ভাঙড়ে হত্যালীলা হয়েছিল হত্যা ঠেকানোর জন্য। পঞ্চায়েত প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আজকের আবেদন জানাচ্ছে। নির্বাচন করা ও নির্বাচিত অধিকার। এই অধিকার রাজ্যবাসীর অর্জিত অধিকার রক্ষা করার জন্য রাজ্যবাসী কনভেনশনের প্রত্যাশা।

গণনা পর্বে ভয়ে বা ভক্তিতে বিডিওদের গেছে। আদালতের আদেশও কার্যকরী হয়নি চালালো খোদ রাষ্ট্রীয় বাহিনীই যাদের আনা নির্বাচনে এই বল্গাহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তীব্র এই নাগরিক কনভেনশন রাজ্যবাসীর কাছে হওয়া যে কোন নাগরিকের স্বাভাবিক অধিকার, দয়ার দান নয়। যেকোন মূল্যে এই সমবেতভাবে প্রতিবাদে সামিল হবেন এটাই

প্রসঙ্গত নির্বাচনী সন্ত্রাস এই রাজ্যে নতুন কিছু নয়। গত প্রায় তিন দশকের প্রতিটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে একই রকম সন্ত্রাস ও মৃত্যু মিছিল দেখেছে রাজ্যের মানুষ। এরাজ্যের মানুষের কাছে এটা আজ পরিষ্কার, কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে ভোট করালেই মৃত্যুশূন্য নির্বাচন হবে এ ধারণা মূলতই ভ্রান্ত। গোটা নির্বাচন পর্বে রাজ্য পুলিশ না কেন্দ্রীয় বাহিনী এই তরজায় জনতাকে ভাসিয়ে অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত ইস্যু চাপা দেওয়া হয়েছে। বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সমাজের সামরিকীকরণ ঘটায়। পুলিশ রাষ্ট্রের ধারণার সাথে জনতাকে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়। অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে মৃত্যু, সন্ত্রাস, ভোট লুট কিছুই কম হলো না। বস্তুত সাধারণ মানুষের সক্রিয় পদক্ষেপ ছাড়া কোন সন্ত্রাসই বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই কনভেনশন তাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার জন্য জন সাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ না হলে শাসকদলের এই সন্ত্রাস জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে বলেই আশংকা। ইতিমধ্যেই তা শুরুও হয়েছে। শাসকদল ও পুলিশের সন্ত্রাসে সাধারণ প্রতিবাদী মিটিং- মিছিল করাও কঠিন হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদী নাটকের উপর হামলা হচ্ছে। ফেসবুক পোস্টের জন্য বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই কনভেনশন ভোট গণনার রাতে ভাঙড়ে গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছে। একই সঙ্গে প্রতিটি হত্যার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছে। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সমস্ত ঘর ছাড়া পরিবারকে অবিলম্বে ঘরে ফেরানোর জন্য প্রশাসনকে এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগামী নির্বাচনগুলি যাতে সন্ত্রাসহীন হয়, নির্বাচনগুলিতে ইচ্ছুক মানুষরা যাতে স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারে তার জন্য এখন থেকেই প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সন্ত্রাসহীন মর্যাদাপূর্ণ জীবন মানুষের অধিকার। আসুন সবাই মিলে সংঘবদ্ধভাবে এই অধিকার কায়েম করি।

‘প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আর এক নাম যখন সন্দেশখালি’

শ্রমজীবী নারীমঞ্চ

দীর্ঘ এক দশক ধরে চলা অত্যাচারের প্রতিবাদে পথে নেমেছে সন্দেশখালির মেয়েরা। বিগত কিছু দিন ধরে সংবাদমাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়াতে চোখে পড়ছে এই মরা সময়ে এক আশা জাগানো ছবি… গ্রামবাংলার মেয়েরা লাঠি, ঝাঁটা, খুন্তি হাতে মোকাবিলা করছে রাষ্ট্রের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ লেঠেল বাহিনীর সাথে। দাবি একটাই এলাকার তৃণমূল নেতা শেখ শাহজান এবং তার দুই শাগরেদ শিবু হাজরা আর উত্তম সর্দারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে এবং এতদিন ধরে চলা শোষণের উল্টোদিকে পদক্ষেপ নিতে হবে। মারমুখী জনতার ক্ষোভের সামনে প্রশাসন বাধ্য হয়েছে অনেক টালবাহানার পর উত্তম সর্দারকে গ্রেফাতার করতে, যদিও বাকি দোষীরা এখনো বেপাত্তা।

ঠিক কি কারণে সন্দেশখালির আপমর গ্রামবাসী এবং মেয়েদের আজ সহ্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে? উর্বর জমি দখল করে নিয়ে মাছের ভেড়ি তৈরি করা থেকে পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ করে সেই জলে মাছ চাষ কিংবা মাছ ব্যাবসায়ীদেরও টাকা মেরে দেওয়া, কখনো বা বনদপ্তরের জমি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয় প্রশাসনের ক্ষমতা কাঠামোকে ব্যবহার করে দিনের পর দিন গ্রামের মহিলাদের রাতের বেলা ডেকে যৌন নিগ্রহ করা, এমনকি মহিলাদের না পেলে তাদের বাড়ির লোকজনকে বেধড়ক মারধোর করা- এসব ছিল সন্দেশখালির মানুষদের রোজনামচা। এইসব চলেছে বর্তমান শাসক দলের পোষা গুণ্ডাদের নেতৃত্বে, এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে। রাস্তায় যখন গ্রামবাসীরা নেমেছেন ক্ষোভ উগড়ে দিতে, তখন স্বভাবসিদ্ধ ভাবে হামলা চালায় তৃণমূলের দুষ্কৃতী বাহিনী। এবং উলটে আক্রান্ত গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সন্দেশখালির মানুষকে দমিয়ে রাখা যায়নি এত কিছু করে। দমিয়ে রাখা যায় নি গ্রামের মেয়েদের যারা আজকে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। এলাকা দখলের যে নিকৃষ্টতম রাজনীতি তাতে প্রথম বলি হয় মেয়েরাই। ‘মেহনতি মানুষের সরকার’ থেকে ‘মা-মাটি-মানুষের’ সরকারে এই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রীর মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে রাজ্য সরকারের কি রূপ—আজকে দিনের আলোর মত পরিষ্কার সন্দেশখালির শ্রমজীবী মেয়েদের কাছে। নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরে তাপসী মালিক, রাধারানি আড়ি আমাদের মনে করিয়ে দেয় রঙ বদলালেও শাসক ও রাষ্ট্রের মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে না। সেই সময়ের সরকার স্বীকার করেনি এই সমস্ত ঘটনা, ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল… এবং সেই দম্ভকে রাস্তায় নেমে শ্রমজীবী জনতা পরাস্ত করেছিল। লড়াইয়ের সেই ইতিহাসই আজকে সন্দেশখালির চলার পথের পাথেয়। শাসকের একতরফা শোষণের উল্টোদিকে যখন মানুষের ঢল রাস্তায় নামে তখন তা সাধারণ মানুষের শক্তিতে প্রতিভাত করে। আমাদের দেশে বিগত বহুদিন ধরেই আশা, মিডডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ির মেয়েরা শ্রমিকের স্বীকৃতি এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে লড়াই করছেন। বলা বাহুল্য, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ই এই বিষয়ে কর্ণপাত করতে নারাজ। আজকে সন্দেশখালির যেই মেয়েরা শাসকের উল্টোদিকে রাস্তায় নেমেছেন, লাঠি ধরেছে তারা জানান দিয়ে দিচ্ছেন তারা কি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি। যেই মেয়েরা ঘরের হেঁসেল সামলান, হাঁস মুরগী প্রতিপালন করে তারা যখন রাস্তায় নামেন, যখন পচে গলে যাওয়া সমাজের মেরামতিতে হাত লাগান তখন রাষ্ট্রকে থমকে দাঁড়াতে হয়। রাজ্য সরকারের মুখ বাঁচানোর জন্য তৈরি করা টিম যা সন্দেশখালির যৌন হেনস্থার অভিযোগগুলোকে খতিয়ে দেখবে অনুসন্ধানের এই প্রহসন আজকে মেয়েরা আর মানছেন না। মানছেন না শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার, নিরাপত্তা দিতে এই ব্যর্থ সরকারকে।

এবং এই স্বৈরাচারী শাসনের সুযোগ নিয়ে নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক বিকল্প হিসেবে হাজির করার চেষ্টা করছে ফ্যাসিস্ট আরএসএস ও বিজেপি। মেয়েদের এই বিক্ষোভকে মুসলমান বিরোধী জিঘাংসায় পরিণত করতে চাইছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি নিজে একজন নারী। তাই হিন্দু নারীদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের এই বয়ানকে আমাদের সজোরে খারিজ করতে হবে, গোদি মিডিয়ার অপপ্রচারকে রুখে দিতে হবে। মনে করতে হবে দেশের মসনদে বসে থাকা মোদী সরকার ও যেই যেই রাজ্যে তারা ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে মেয়েদের কিরকম দুরবস্থা। আজকে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের স্বৈরাচারের উল্টোদিকে সন্দেশখালির প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া যেমন আমাদের আশু কর্তব্য, সেরকমই ফ্যাসিস্ট শক্তির লাগামছাড়া আক্রমণের দিনে তার উল্টোদিকে আপামর শ্রমজীবীদের তথা মেয়েদের লড়াই গড়ে তোলাও আজকের আহ্বান। সন্দেশখালি আমাদের ভরসা দিচ্ছে, গণআন্দোলনই পারে রানী এবং তার সিংহাসনকে রাস্তায় নামাতে।

সামনেই ১১৪ তম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস। এতগুলো বছর আগে ভোটাধিকার, কাজের অধিকার, যথাযথ বেতন, শিশুশ্রমের অবসানের দাবিতে গোটা পৃথিবী জুড়ে মেহনতি মেয়েরা যে রাস্তায় নেমেছিলেন, সন্দেশখালির মেয়েরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন তারা সেই মেয়েদের উত্তরসূরি। এই লড়াইয়ের আগুন গোটা রাজ্য ও দেশে ছড়িয়ে পড়ুক দাবানলের মত এবং সন্দেশখালির এই জান কবুল লড়াইয়ের সংহতিতে দাঁড়াচ্ছে শ্রমজীবী নারী মঞ্চ।

১৪.০২.২০২৪

[জন সাধারণের প্রতিরোধের চাপে শাহজাহান-সহ সাকরেদরা এখন কারান্তরালে—সম্পাদকমণ্ডলী]

শ্রমজীবী হাসপাতাল সহযোগী মঞ্চ

পাঠক পাড়া, বেলুড়, হাওড়া

তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

প্রতি
সম্পাদক
স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

ভূমি দফতর আইন মানো

কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বিশেষ আবেদন

বন্ধু

ইন্দোজাপান স্টিলস্ লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও পিপলস হেলথ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন এবং কিছু সমাজ মনস্ক মানুষের উদ্যোগে গড়ে ওঠা বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল দীর্ঘদিন যাবত সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দিয়ে আসছে। জায়গার অভাবে শ্রমজীবী বহু বিভাগ খুলতে পারছে না অথচ ইন্দোজাপান কারখানা এবং গ্র্যান্ড স্মিথি কারখানা বহুদিন আগে উঠে গেছে এবং আইনত ওই জমি সরকারের। শ্রমজীবী ২০১০ সালে বাম সরকারের কাছে, পরে ২০১১ সালে বর্তমান সরকারের কাছে আবেদন করে ওই সরকারি খাস জমি শ্রমজীবী হাসপাতালকে দেওয়ার জন্য। যেখানে শ্রমজীবী একটি ৩০০ বেডের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুলবে।

এতদিনেও শ্রমজীবী হাসপাতাল ওই জমিটি পায়নি। প্রোমোটার ওই জমি গ্রাস করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সরকারি ভূমি দফতরের আমলারা শত চেষ্টা করেও প্রোমোটারকে ওই জমি দিতে পারছে না। হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ এবং প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত পরোক্ষে শ্রমজীবী হাসপাতালের পক্ষে রয়েছে।

আমাদের মনে হয়েছে ভূমি দফতরকে শ্রমজীবীর পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ানোর জন্য আমাদের পথে নামতে হবে। পথে নেমে লড়াইয়ের পরিকল্পনায় আমরা আপনাদেরকেও সঙ্গে চাইছি।

আগামী ৯ মার্চ ২০২৪ শনিবার সকাল ১০টা থেকে ইন্দোজাপান কারখানা ও বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের সামনে লাগাতার ধর্নার প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। ঐ কর্মসূচীকে সফল করা ও বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আগামীর লড়াইয়ে আপনার/আপনাদের সহযোগিতা পেলে লড়াই তীব্রতর এবং সাফল্যমন্ডিত হবে, এটা আমাদের বিশ্বাস।

আপনাকে/আপনাদের সংগঠনকে সর্বতোভাবে এই লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সহ-
মেঘনাদ দাস, অভিজিৎ চ্যাটার্জী, দীপাঞ্জন ব্যানার্জী
আহ্বায়কমণ্ডলী
শ্রমজীবী হাসপাতাল সহযোগী মঞ্চ

নির্বাচন ও নাগরিকত্ব

কি আশ্চর্য! প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিকরা আগামী ১৯ এপ্রিল ২০২৪ থেকে লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়ে নতুন সরকার গঠন করবেন এবং তার কিছু সময়ের মধ্যেই উপযুক্ত দলিল, সংবিধান অনুযায়ী ১৯ জুলাই, ১৯৪৮ এর আগের সেই দলিল নিয়ে লাইনে দাঁড়াবেন নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য। যাঁদের ভোটে নির্বাচিত হবে সরকার তাদেরকেই নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে? অদ্ভুত দ্বিচারিতা। তাহলে জনসাধারণের কষ্টার্জিত এত এত টাকা খরচ করে কাদের স্বার্থে লোকসভা নির্বাচন করছে ভারত রাষ্ট্র? কিছুক্ষেত্রে ঘুরপথেই এসব চালু হয়ে গেছে, যেমন আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে।

২০০৩-এ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী সকল দলের প্রতিনিধিরা মিলে সর্বসম্মতিক্রমে নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনী আনে, যাতে সকল ভারতীয়র নাগরিকত্ব কার্যত বাতিল হয়ে আবেদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নেয়ার বিধান চালু হয় যা শুধু আজ

প্রয়োগের অপেক্ষায় আছে। এ বিষয়ে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল অদ্ভুত নীরব। ভারতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ১৯৮৬ সালের সংশোধনীতে কেড়ে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যাঁরা ১ জুলাই ১৯৮৭ ও তার পরে জন্মগ্রহণ করেছেন ভারতে তাঁরা জন্মসূত্রে নাগরিক নন। তাঁদের নাগরিকত্ব যদি প্রমাণ করতে হয় তবে তাঁদের বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দাদু, দিদা-দের নাগরিকত্ব আগে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেই ১৯৪৮ এর আগের সময়ের দলিল দিয়ে। সংবিধান গ্রহণের সময় থেকে অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ থেকে যারা ভারতে জন্মেছেন তাঁদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিধান থাকলেও তার প্রমাণপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট প্রায় কারোর নেই। একমাত্র বার্থ সার্টিফিকেটেই থাকে জন্মের স্থান, তারিখ ও পিতামাতার নাম।

তাছাড়া রয়েছে দেশভাগ ও তার সাথে বাংলা, পাঞ্জাব ভাগের বলি কয়েক কোটি মানুষ ও তাঁদের উত্তরসূরী যারা আজও ভুগছে নিজেদের প্রতিষ্ঠা পেতে। এই চোদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি থেকে উৎখাত হওয়ার বিভীষিকা ভারতের মূল ভুখন্ডের অধিকাংশ লোকদের স্মৃতিতে নেই কারণ তাঁরা এর ভুক্তভোগী নন। তবে কাগজ দেখিয়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার সর্বনাশা আইন ভারতের প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের ভবিষ্যত হয়ে আছে আইনি পর্যায়ে, যা হল NRC বা NRIC (National Register of Indian Citizens) এখানে লিগাসি তথ্য দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণের কথা আছে। লিগাসি তথ্য হল বাপ ঠাকুরদার কাগজের সাথে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা।

অসম NRC তে আমরা দেখেছি কীভাবে রাষ্ট্র অসমীয়া উগ্রজাতীয়তাবাদ ও বিদ্বেষকে মান্যতা দিয়ে নাগরিকত্ব আইনে ১৯৮৫ সালে সংশোধনী এনে ১৯ লক্ষাধিক ভারতীয়কে বেনাগরিক করলো। আরো ২ লক্ষ ২০ হাজার জনকে ডি-ভোটার বা ডাউটফুল ভোটার করা হল এবং প্রায় ২৭ লক্ষ আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক তথ্য আটকে রাখা হয়েছে অসমীয়া প্রভাবিত কোর্ট (রঞ্জন গোগোই) ও আমলাতান্ত্রিক (প্রতিক হাজেলা সহ বিদেশি ট্রাইবুনাল গুলো) যোগসাজশে। অসম NRC তে ভুক্তভোগী ৬৯% মহিলা। পরিচয়পত্রে বানান ভুলের জন্যেও নাগরিকত্ব খোয়াতে হয়েছে অসমে।

সময় এসেছে সাধারণ ভারতবাসী হিসেবে জোট বেঁধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার। কর্পোরেট স্বার্থে কোটি কোটি মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে ভাসমান কৃতদাস তৈরি করার এই রাষ্ট্রীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করার। মানুষকে হিন্দু-মুসলিম, ঘটি-বাঙাল, রাজবংশী-ভাটিয়া, আদিবাসী-অনাদিবাসী ইত্যাদিতে ভাগ করে সকলের উপর বেনাগরিক করার আইন চাপানোর এক ভয়ংকর চেষ্টা চলছে, যার ভুক্তভোগী হবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মূলত দরিদ্র, দলিত, বাস্তুচ্যুত, মহিলা, শিশু, লেখাপড়া না জানা নাগরিকরা। এর সাথে চলছে "উদ্বাস্তু"-দের নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে সরকারি প্রতারণা CAA-2019। এই আইন যখন বিল ছিল তখন সংসদের যৌথ কমিটি তাদের রিপোর্টে জানায় এই আইনে নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হচ্ছে নথিভুক্ত ৩১,৩১৩ জন যারা ভারত সরকারের পাসপোর্ট রুলস ১৯৫০ ও ফরেনার্স অর্ডার ১৯৪৮-এ ছাড় পেয়েছে। তাই CAA-2019 এ উক্ত সংখ্যক মানুষ ব্যতিরেকে আবেদন করা মানেই স্বঘোষিত বিদেশি হওয়া। তবু এই সাম্প্রদায়িক শাসকদলের কাছে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ কারণ নাগরিকত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধর্মকে জুড়ে আইন আনা মানেই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোয় আঘাত হানা।

সংবিধানের ৩২৬ ধারা অনুযায়ী একমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভারতে ভোট দিতে পারে। অর্থাৎ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানে যোগ্য প্রায় ৯৭ কোটি মানুষ অতি সহজ সরল হিসাবে ভারতীয় নাগরিক এবং একই হিসাবে বাকি অপ্রাপ্তবয়সীরা উক্ত ভোটারদেরই সন্তান (অধিকতর) তবে কেন ভারতের নাগরিকত্ব আইনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বারংবার সংশোধনী এনে এই মৌলিক বিষয়টিকে এমন জটিল থেকে জটিলতর করা হল? যে মৌলিক অধিকার আমাদের ওপর সংবিধান দ্বারা ন্যস্ত তাকে নাকচ করে এক জটিল-ব্যয়বহুল-অমানবিক-প্রমাণসাপেক্ষ NRC আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাগরিকত্ব কেন পেতে হবে ভারতীয় নাগরিকদের? কারা দায়ী এর জন্য?

সাথী, আসলে আপনার অস্তিত্ব যখন সংকটে থাকবে আপনি ভুলে যাবেন এক নজরদারি রাষ্ট্র গড়তে আপনাকে আধারকার্ডের সাথে জীবনের সবকিছু লিঙ্ক করাতে হচ্ছে, পুলিশরাষ্ট্র গড়তে ফৌজদারী আইন আমূল-পরিবর্তন হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব, বিকাশের নামে পরিবেশ ধ্বংস ও উৎখাত, ইলেক্টোরাল বন্ডের মত তোলাবাজি, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের অধিকার হরণকারী আইন প্রনয়ণ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশই আপনার থাকবে না। আপনি ভাবতেও পারবেননা কেন সরকার, জাল ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির থেকে ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে ১০০০ কোটি টাকা নিয়ে তাদের ছাড় দিলো!

তাই আসুন আওয়াজ তুলি:

১. কোন মানুষ বেআইনি নয়-কাউকে রাষ্ট্রহীন করে রাখা যাবে না।
২. ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা, ভোটার ও তাদের সন্তানরা প্রত্যেকে ভারতের নাগরিক- আলাদা করে NRIC মারফৎ নাগরিকত্ব কার্ড চাই না।
৩. নাগরিকদের বেনাগরিক করার সকল আইন বাতিল করতে হবে।
৪. জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পুনরায় চালু করতে হবে।
৫. অসমে বেনাগরিক হওয়া প্রায় ২২ লক্ষাধিক মানুষের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাই।
৬. অবিলম্বে উদ্বাস্তুদের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন প্রনয়ণ করে জাতিসংঘের ১৯৫১-এর উদ্বাস্তু সম্মেলন ও ১৯৬৭-এর প্রোটোকলে স্বাক্ষর করতে হবে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) আলিপুরদুয়ার শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

Excerpt of the Sandeshkhali Fact-finding Report, 2024

Published by

Paschimbanga Khet Majoor Samity, Shramajivee Mahila Samity, Association for Protection of Democratic Rights (APDR), Aamra Ek Sachetan Prayas

…If one used to go to the police, police would suggest them to talk to Sajahan. They gave a list of names involved in the violence and malpractices.

1. Seikh Sajahan
2. Kaderbax Mollah
3. Jiauddin Mollah
4. Sukumar Mahato
5. Tapan Sikdar
6. Akher Gayen
7. Ajijur Molla
8. Saukat Mollah
9. Jadav Mondal
10. Quitub Seikh

They argue that local administration including the BLRO and BDO are under their exclusive control. Instead of giving services to the people they are helping Sajahan and his team to encroach on other people's lands. They worked under their exclusive instruction and changed the land records as per their will.

The villagers had to close their shops and had locked themselves inside their houses because of the violence unleashed by Sajahan and his gang. Houses and shops of villagers, who supported the opposition political parties were attacked and vandalised. There are instances where they have completely destroyed people's houses and they had to leave their homes for 4-5 months. During the Diwali festival, a few clubs had a surplus of Rs. 9000/-. They have looted the money. Villagers mention that they are involved in this type of work for quite some time now. In 2021, after the election result was out they captured a local club named "Naba Uday Sangha."

A few months back Jiauddin Mollah, a goon working under Sajahan, commited sexual violence. Villagers protested against this incident. In response to that spontaneous protest, Sajahan and his gang held a rally with arms and bombs at the local market and launched attack on villagers. Minakha, Sandeskhali and Basanti police station never took any action against them. When villagers went to the police stations, they refused to lodge complain. Villagers mention that the violence started after TMC came into power.

Our understanding:

1. The extent of land grabbing and converting farmlands into bheri/fishery, poultry farm has increased manifold in the last three years. While villagers were paid their lease money for the first year, they have not got any money in the last two years. Whenever villagers have demanded money, they have been beaten up. The land mafia and their gangs are associated with the TMC and protected because of this association. There is a direct connection between the TMC's third term in West Bengal and the rise of violence in Sandeshkhali.
2. It is illegal to convert farm land into fisheries. Similarly, it is illegal to convert land records without enquiring who the present user of the land is. However, land records has been altered at random. The Land Revenue department is directly involved, in this according to the people's common statement. Those who could not register their names in the land records for monetary or other reasons had to lose their land. There are even instances where there has been tampering of existing land records. People reported that the police and the BLRO office refused to take complaints because powerful people were involved and their names were mentioned in the complaint. The police have called people up in the middle of the night to harass and threaten those who managed to lodge complaints.
3. The fishery and poultry business have been given bank loans. They have received loans, though their businesses are on forcibly captured land, which is completely illegal. Even the role of World Bank is questionable here as they encouraged brackish water fisheries from 1990s, despite the illegality, socio-economic and environmental consequences of the conversion of land.
4. The people feel the administration - police station, gram panchayat and even MLA -did nothing for them. Police always instructed them to contact with Shibu Hazra in his office, which is also TMC party office.
5. Almost everywhere people mentioned that women were called up the middle of the night. Good looking women were targeted. An important dimension is the fact that the mass media focus exclusively on the sexual harassment of women and diluted other issues. Local women felt disrespected because of the exclusive focus of the media on sexual harassment. The media was keen to know about exact figures of molestation or rapes, but the people felt that calling them up in the middle of the night is in itself an atrocity. We also question this one-sidedness of the media's focus on sexual violence and feel this itself is a part of politics that explotes women's bodies.

PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBETIES (PUCL): Critique of the 3 New Criminal Laws (Excerpt)

The BNS, BNSS and the BSA-Turning a De Facto Police Regime to a De Jure Police State

****

A careful scrutiny of the 3 new laws passed in December, 2023 – the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) – reveals a concerted attempt to:

(a) Weaponise the law by criminalising ordinary acts of democratic and peaceful means of expressing dissent and opposition to state policies as exemplified by

(b) Systematically dismantling the key element of criminal jurisprudence – the `presumption of innocence' and the `right to free and fair trial' through a series of provisions in the BNSS and BNS, very consciously and deliberately introduced to change the character of criminal jurisprudence.

(c) Centralising powers of the police, providing immunity and ensuring `impunity' of police and state officials for gross and rampant misuse and abuse of law by police officers by denying provisions to fix accountability and command responsibility.

Weaponising the law by Criminalising Ordinary Democratic Acts

The old sedition law in a new avatar! Sec. 152 BNS: `Act endangering sovereignty, unity and integrity of India'

Systematically dismantling the key element of criminal jurisprudence

Violating Right to Dignity: Mandatory handcuffing – sec. 43(3) BNSS –

A new provision

Negating Fundamental Right to Free and Fair Trial

Waiver of right to trial: sec. 356, BNSS

Ex-parte Attachment or seizure and distribution of property pending trial

Violation of right to privacy – requirement to give specimen signatures or handwriting – sec. 349 BNSS

Centralising powers of the police, providing immunity and ensuring `impunity'

Extending powers of remand: sec. 187 BNSS (sec. 167 CrPC)

Arming the police with untrammelled powers – sec. 172 BNSS

Accountability of abuse of power by public servants: new obstacles in sec. 175 BNSS

Power to remit/commute sentences: sec. 477 BNSS

Shift from `Consultation' to `Concurrence' - Violation of federal principles

Criminalising protests: criminalising hunger strikes: sec. 226 BNS

Undermining victim's access to justice: Preliminary Enquiry in Cognisable cases Sec. 173(3) BNSS

New Punishment Community service: Sec. 4(f) BNS and sec. 23 BNSS

Gender related offences

(i) No provision for forcible rape of men by men and transgenders

Total omission of sec. 377 IPC

(iii) Non-recognition of marital rape: sec. 63, Exception2, BNS

(iv) Retaining offence of adultery – sec. 84 BNS: Refusal to adopt gender neutral provision

(v) Sec. 84 BNS is a verbatim reproduction of sec. 498 IPC, with the tile, "Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman".

Hate crime: introduction of a new crime

For detail please mail & visit: kavisriv@gmail.com, pucl.natgensec@gmail.com

খবরাখবর

- ২০০৮এর চন্দ্রযান-১ এবং ২০০৯এর চন্দ্রযান-২ অভিযানের পর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো' চন্দ্রযান-৩ অভিযানে ২৩ আগস্ট ২০২৩-এ সফলভাবে প্রোপালসন মডিউল 'বিক্রম'কে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর অন্ধকারাচ্ছন্ন রুক্ষ এবড়ো খেবড়ো ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করাতে এবং সৌরশক্তি নিয়ে রোভার 'প্রজ্ঞান'কে সচল করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দুটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।
- আজারবাইজানেরর বাকুতে অনুষ্ঠিত ফিড দাবা ওয়ার্ল্ড কাপ '২৩-এ রানার্স হলেন ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ।
- নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত মহিলাদের বিশ্বকাপ ফুটবল '২৩-এ ফাইনালে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে বিজয়ী হল স্পেন।
- ব্রিটিশ আমলে তৈরি রুপসী এয়ার স্ট্রিপ নিম্ন অসমের ধুবড়ি শহর থেকে ১৭ কি.মি. দূরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান বাহিনীর ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত হয়। পরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বায়ুদূত ১৯৮১-তে উড়ান চালু করে ১৯৮৪তে বন্ধ করে দেয়। পরে কেন্দ্র সরকারের উড়ান (উড়ে দেশ কে আম নাগরিক) প্রকল্পে ২০২১ নাগাদ বিমানবন্দরের গৃহ তৈরি হয় এবং ফ্লাইবিগ নামক একটি বেসরকারি সংস্থা রূপসী থেকে কলকাতা ও গুয়াহাটি এটিআর-৭২ বিমান পরিষেবা শুরু করে। এর ফলে নিম্ন অসম এবং কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের একাংশের মানুষ উপকৃত হন। কিন্তু ২০২৩ থেকে এই পরিষেবাও অনিয়মিত হয়ে পড়ে।
- শ্রেষ্ঠ পুরুষ ফুটবলার হিসাবে কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং হালাণ্ড প্রমুখদের ছাপিয়ে ফিফার ২০২৩-র 'বালঁ দ্য' ট্রফি পেলেন লিওনেল মেসি। এই নিয়ে আটবার। মহিলা ফুটবলারদের মধ্যে বর্ষ সেরা হলেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি।
- কৃত্রিম মেধা প্রয়োগ করে গ্রেগ ব্রোকম্যানের সাথে চ্যাট-জিপিটি তৈরি করে স্যাম অল্টম্যান প্রযুক্তির জগতে বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন। চ্যাট রোবট (চ্যাট-বট) সব কিছুতে মানুষকেও ছাপিয়ে চলছিল। সেই চ্যাট-জিপিটির মূল সংস্থা ওপেন এ আই থেকে সরে যেতে হল তাকে।
- দোহায় অনুষ্ঠিত আই.বি.এস.এফ. বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে বিলিয়ার্ডসে তার ২৫তম খেতাব জিতলে পঙ্কজ আদবানি। এর মধ্যে লং ফর্মাট ন'বার, পয়েন্ট ফরম্যাট আট বার এবং বিশ্ব ডিপ বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানশিপ একবার জিতেছেন।
- 'জলের উপর পানি' উপন্যাসের জন্য বাংলা ভাষায় স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং 'জবা বাহা' গল্প সংকলনের জন্য সাঁওতালি ভাষায় টুরিয়াচাঁদ (তারাসিন) বাস্কে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন।
- গত ১১ মার্চ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে আন্তঃমহাদেশীয় অগ্নি-৫ ক্ষেপনাস্ত্রে প্রথম 'মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টার্গেটেবল রি-এন্ট্রি ভেহিকলস' (এম আই আর ভি) প্রযুক্তিতে অনেকগুলি অস্ত্র বা ওয়ারহেড বহনের পরীক্ষায় সফল হলেন ভারতের সামরিক বিজ্ঞানীরা। এটির নাম রাখা হয়েছে 'দিব্যাস্ত্র'।
- ১০ মার্চ মধ্যপ্রদেশের কুনো অভয়ারণ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা চিতা গামিনী পাঁচটি শাবকের জন্ম দিল। ভারতীয় চিতাদের শিকার করে অনেক আগেই বিলুপ্ত করার পর দেশের অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে চিতা যুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হয়। ২০২২-এ নামিবিয়া থেকে আটটি এবং ২০২৩-এ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১১টি মোট ১৯টি চিতা আনা হয়। এদের মধ্যে ১০টি চিতা মারা যায়। এরপর আশা১, জ্বালা ও আশা২ মোট ১১টি শাবকের জন্ম দেয়। এর মধ্যে ৩টি শাবক মারা যায়। এখন মোট ২২টি চিতা রয়েছে।
- অরুণাচল প্রদেশে ১৩,৭০০ ফুট উচ্চতায় অস্ট্রিয়ান প্রযুক্তিতে সারা বছর যান চলাচলের উপযুক্ত সামরিক দিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সে-লা পাশের উদ্বোধন হল ৯ মার্চ। এটি তাওয়াং ও ওয়েষ্ট কামেং জেলার মধ্যে তাওয়াং শহরের সাথে দিরাং-গুয়াহাটির যোগাযোগ সহজ করে দেবে।
- অসমের কামরূপ জেলায় বিপন্ন হাড়গিলা পাখি সংরক্ষণে স্থানীয় মহিলাদের সংগঠিত করে পূর্ণিমাদেবী বর্মণ লড়াই চালাচ্ছেন। গাছ কাটা আটকাচ্ছেন। পেয়েছেন গ্রিন অস্কার, নারী শক্তি সহ বিভিন্ন সম্মাননা।
- লোকসভা ভোটের আগে আঞ্চলিক ও জাতপাতের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগাতে ভারত সরকার একসাথে কর্পূরী ঠাকুর, লালকৃষ্ণ আদবানি, চৌধুরি চরণ সিং, পি ভি নরসীমা রাও এবং এম.এস. স্বামীনাথ পাঁচজনকে সর্বোচ্চ ভারতরত্ন পুরস্কার দিলেন ২০২৪-এ। এরমধ্যে আদবানি বাদে বাকি চারটি ক্ষেত্রে মরণোত্তর।
- গর্ভদান (Surrogacy) আইন সংশোধন করে সরকার জানালেন বিবাহিত দম্পতির কোন একজনের শারীরিক সমস্যা থাকলে অপর লিঙ্গের দাতার জনন কোষের সাহায্য নিয়ে গর্ভদাত্রী মায়ের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেওয়া যাবে। একা, বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না, মহিলারা নিজেদের ডিম্বাণু ও দাতার শুক্রাণুর মাধ্যমে গর্ভদান পদ্ধতিতে সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন।
- লোকসভা ভোটের আগে ইতিহাসের পাতা থেকে মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, বিশিষ্ট সন্ত কবি ও সুরকার এবং দলিতদের আত্মঅধিকার আন্দোলনের পুরোধা সন্ত রবিদাসের পুনর্বাসন হল। বারাণসীতে রবিদাসের মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী। মধ্যপ্রদেশের সাগরে ১০০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে রবিদাস মন্দির।
- মণিপুরে হিংসার অন্তরালে রয়েছে মাদকের কারবারের দ্বন্দ্বও।

'মণিপুর ট্রাইবাল ফোরাম, দিল্লি' এই মর্মে শীর্ষ আদালতে নথি জমা দিয়েছেন। মণিপুরের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৪৫ হাজার কোটি টাকা, অন্যদিকে পাহাড়ে পপি বা আফিম চাষকে ঘিরে যে সমান্তরাল অর্থনীতি তার পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি টাকা।

- প্রতিষ্ঠিত পসার ছেড়ে উত্তরপূবের শিলচরে গিয়ে থেকে রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২০২৩-র ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেলেন বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ রবি কান্নান।
- পদার্থ (ম্যাটার) ও অপদার্থর (অ্যান্টি-ম্যাটার) ভর এক, ইলেকট্রিক্যাল চার্জ ও কোয়ান্টাম নাম্বার ভিন্ন। অ্যান্টি-ম্যাটারও মাধ্যাকর্ষণ মেনে চলে সম্প্রতি আবিষ্কার করলেন সার্ন এর বিজ্ঞানীরা।
- খুব অল্প জলে, উষর জমিতে, কীটনাশক ছাড়া বেড়ে ওঠা গ্লুটেন মুক্ত ক্যালসিয়াম যুক্ত পুষ্টিকর দানা শস্যদের শস্যবিজ্ঞানীরা 'শ্রী অন্নম' আখ্যা দিয়েছিলেন। ইনেনেস্কো ২০২৩কে ঘোষণা করেছিলেন মিলেট বর্ষ হিসাবে। তৈরি হচ্ছে মিলেট নিয়ে নানা খাদ্যসম্ভার। চিনার বা প্রোসো, জোয়ার, বাজরা, রাগি, সামা, কাওন, কোদো প্রভৃতি আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। তবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় 'পুষা'য় রাসায়নিক মেশানো উচ্চফলনশীল মিলেট তৈরি এবং তার ব্যবসায় কর্পোরেটের অবতীর্ণ হওয়ার আশঙ্কারও জন্ম দিচ্ছে।
- বিহারে জাতগণনায় দেখা গেছে মোট ১৩.১ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৩৬ শতাংশ অত্যন্ত পেছিয়ে পড়া, ২৭.১ শতাংশ মানুষ পেছিয়ে পড়া, ১৯.৭ শতাংশ তফসিলি, ১.৭ শতাংশ তফসিলি জনজাতির। মোট ৮৪.৫ শতাংশ। উচ্চবর্ণ বা জেনারেল কাস্ট ১৫.৫ শতাংশ।
- ২০২৩এ পদার্থবিদ্যায় ইলেকট্রনের চলাফেরা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন বিজ্ঞানী পিয়ের আগোস্তিনি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ফ্লোরেন্স ক্রাউজ (জার্মানি) ও অ্যান হুইলার (সুইডেন)। ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে কোয়ান্টাম ডট তৈরি করে রসায়নে নোবেল পেলেন লুই ব্রুস, মুঙ্গি বেগুওতি ও অ্যালেক্সেই একিমভ (তিনজনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক)। এম আর এন এ টিকা তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন কাতালিন কারিকো ও ড্রু ওয়েজম্যান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। শ্রম বাজারে নারীর উপর বঞ্চনার উপর কাজ করে অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন ক্লডিয়া গোল্ডিন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন নাট্যকার ইয়ন ফসে (নরওয়ে)। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন 'জান-জিন্দগি-আজাদি'র দাবিতে কাজ করা ইরানের জেলবন্দি মানবাধিকার কর্মী নার্গিস মহম্মদি।
- ২০২৩এ বাংলাদেশের ডেঙ্গি অতিমারিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভয়াবহতম আখ্যা দিয়েছে। এক লক্ষ ৩৫ হাজার মানুষের সংক্রমণ হয়, ৬৫০ জন মারা যান।
- এই বছর যাঁরা পদ্মভূষণ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও গায়িকা উষা উত্থুপ। পদ্মশ্রী প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, হস্তীবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া, টিকলি চিত্রশিল্পী অশোক বিশ্বাস, লোকগান শিল্পী গীতা রায় বর্মণ, কাঁথা শিল্পী তকদিরা বেগম, প্রতিমা শিল্পী সনাতন রুদ্রপাল, শিল্পী নেপাল সূত্রধর, ভাদু শিল্পী রতন কাহার, পরিবেশ কর্মী দুখু মাঝি প্রমুখ।
- চীনের হ্যাংঝাউ এশিয়ান গেমসে ভারত এযাবৎকালের সবচাইতে বেশি ১০৭টি পদক পেল (সোনা ২৮, রুপো ৩৮ ও ব্রোঞ্জ ৪১)। পদকের তালিকায় চতুর্থ।
- আইসিএআর এর ২০০৫-'২১এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতীয়দের মধ্যে সবচাইতে বেশি মাছ খান ত্রিপুরার মানুষ (৯৯.৩৫ শতাংশ) এবং সবচাইতে কম হরিয়ানার মানুষ (২০.৫৫ শতাংশ)। কেরলে (৫৩.৫ শতাংশ), গোয়ায় (৩৫.২ শতাংশ)। জনসংখ্যার ৫.৯৫ শতাংশ রোজ মাছ খান। ৩৪.৮ শতাংশ সপ্তাহে। মাঝেমধ্যে খান ৩১.৩৫ শতাংশ।
- গণিতে 'নরওয়েজিয়ান আকাদেমি অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড লেটার্স'-এর প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ নিলস হেনরিক অ্যাবলের নামাঙ্কিত অ্যাবেল পুরস্কার পেলেন ফরাসি গণিতজ্ঞ মিশেল তালাগ্রঁ। 'ফাংশনাল অ্যানালিসিস', 'প্রোবাবিলিটি থিওরি', 'র‍্যানডম ফেনোমেনা' প্রভৃতি নিয়ে তাঁর কাজ।
- মহাকাশ অভিযান থেকে ফিরে আসতে 'পুষ্পক' (এল ই এক্স-০২) যান দ্বিতীয়বার সফলভাবে অবতরণ করল কর্নাটকের চিত্রদুর্গ জেলার একটি রানওয়েতে। মাটি থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার উচ্চতায় এটিকে ভারতীয় বায়ুসেনার চিনুক হেলিকপ্টার থেকে ছেড়ে দিলে এটি পরিস্থিতি বুঝে নিজে নিজেই অবতরণ করে।
- কচ্ছথিবু বা কচ্চি দ্বীপটিকে নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতের রামেশ্বরম ও শ্রীলঙ্কার জাফনার মাঝে এই ছোট দ্বীপটি সপ্তদশ শতক থেকে রামনাদ রাজ্যের অধীনে ছিল। তারপর ব্রিটিশ শাসনে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। তারপর ভারতের অধীনে। অনেক বছর ধরে শ্রীলঙ্কা এটি দাবি করে আসছে। ১৯৭৪ ও '৭৬-র দুটি চুক্তির মাধ্যমে ভারত এই দ্বীপটির অধিকার শ্রীলঙ্কাকে হস্তান্তর করে।
- সুইস শিশুখাদ্য প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থা নেসলের বিরুদ্ধে 'পাবলিক আই' এবং 'বেবি ফুড অ্যাকশন নেটওয়ার্কের দাবি যে নেসলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্বল্প ও মাঝারি আয়ের দেশগুলিতে শিশু খাদ্যে চিনি মেশাচ্ছে। ভারতে সেরেল্যাক ব্র্যাণ্ডের ১০টি শিশুখাদ্যে ২.৭ গ্রাম করে চিনি পাওয়া গেছে।
- ভারতীয় ও বিশ্বের কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসাবে ক্যাণ্ডিডেট্স দাবা চ্যাম্পিয়ান হলেন চেন্নাইয়ের ১৭ বছর বয়সী গ্র্যাণ্ডমাস্টার ডি. গুকেশ।
- অ্যাস্ট্রাজেনেকা এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুত কোভিড প্রতিষেধকের যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়েছে তা এতদিনে স্বীকার করে নেওয়ার পর ব্রিটিশ-সুইডিশ বহুজাতিক

ফার্মাসিউটিকাল সংস্থাটি বিশ্বের বাজার থেকে তাদের তৈরি করোনা ভাইরাসের টিকাটি তুলে নিল। অনেকের 'থ্রম্বোসিস উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া সিনড্রোম (টি টি এস) হয়ে কিছু মৃত্যু হয়। অ্যাস্ট্রাজেনেকার এই প্রতিষেধকটিই ভারতে সিরাম ইনস্টিটিউট 'কোভিশিল্ড' নামে প্রস্তুত করে এবং কোভিড অতিমারির সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

- ২৯ বার ২৯ হাজার ফুট উঠে বিশ্বরেকর্ড করলেন কামিরিটা শেরপা। নেপালের এই দক্ষ পর্ব্বতারোহী বিভিন্ন অভিযাত্রী দলের সাথে ২৯ বার মাউন্ট এভারেস্টে উঠলেন।
- ফু দোরজে শেরপার পর (১৯৮৪) দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে অক্সিজেন ও শেরপা ছাড়া এভারেস্টে উঠলেন লাদাখের স্কালজাং রিগজিন। এভাবেই আগে চতুর্থ ও দশম উচ্চতম পর্ব্বশৃঙ্গ লোৎসে ও অন্নপূর্ণায় উঠেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা দূষণের দৈনিক পরিমাণ

সূত্র : দূষণ পর্ষদ; কোটি লিটারে

জেলা	তরল বর্জ্য	অপরিশোধিত তরল বর্জ্য
• মালদা	১.৪০	১.৪০
• মুর্শিদাবাদ	৬.৫৫	৬.২১
• পূর্ব বর্ধমান	২৭ লক্ষ লিটার	০৯ লক্ষ লিটার
• নদীয়া	৮.৫৩	৩.৬৪
• হুগলী	১৬.২৮	১০.৪২
• উত্তর ২৪ পরগনা	২৯.২৭	১১.৩২
• দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৭.৯৫	৭.৫৮
• পূর্ব মেদিনীপুর	২.৮২	২.৮২
(কলকাতা ও হাওড়ার তথ্য নেই)		

বিধানসভা উপনির্বাচন, জুলাই ২০২৪							
রাজ্য	**আসন সংখ্যা**	**তৃণমূল**	**বিজেপি**	**কংগ্রেস**	**আপ**	**ডি.এম.কে**	**নির্দল**
পশ্চিমবঙ্গ	৪	৪	০	০	০	০	০
উত্তরাখণ্ড	২	০	০	২	০	০	০
পাঞ্জাব	১	০	০	০	১	০	০
তামিলনাড়ু	১	০	০	০	০	১	০
হিমাচল	৩	০	১	২	০	০	০
মধ্যপ্রদেশ	১	০	১	০	০	০	০
বিহার	১	০	০	০	০	০	১
	১৩	৪	২	৪	১	১	১

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন • চতুর্দশ বর্ষ • শারদ সংখ্যা ১৪৩১ • ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে অরণি সেন কর্তৃক ৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২, ফোন ৯৮৩০০৫৮৫৪৭ থেকে মুদ্রিত।

email : ssunnayan@gmail.com || Website : www.ssu2011.com

₹১০০